সিরিজ
নারীর ফাঁদ-৩
ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

নারীর ফাঁদ-৩

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৩

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-৩
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর-২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ-২০০৩

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-3 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : OCTOBER 2002

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক মহলে বেশ সমাদর লাভ করেছে। এবার তৃতীয় খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান
আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

*ফিলিস্তীনে আসব আমি......................৭
*কার্ক দুর্গের পতন.........................৫৭
*ফেরাউনের গুপ্তধন......................১০৯
*তিন গোয়েন্দা............................১৬৫
*দুর্যোগের ঘনঘটা.........................২১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফিলিস্তীনে আসব আমি

খৃস্টানদের চোখে ধূলি দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। খৃস্টানরা যখন টের পেল, ততক্ষণে সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেই অবরোধ ছিল অসম্পূর্ণ- ত্রিমুখী। গুপ্তচররা সুলতান আইউবীকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তিনি আগেভাগেই কার্ক শহরে যে কমান্ডোদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দারা ভেতর থেকে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে। কিন্তু অবরোধের চতুর্থ দিন ভেতর থেকে এসে দূত সুলতানকে সংবাদ দিল যে, আপনার প্রেরিত কমান্ডো বাহিনী এবং কয়েকজন স্থানীয় মুসলিম নাগরিক কার্কের প্রাচীর ভাঙ্গতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম মেয়েও রয়েছে। আছে একটি খৃস্টান মেয়েও। সুলতান আইউবী এ তথ্যও পেলেন যে, কে একজন ঈমান-বিক্রেতা নামধারী মুসলমান আপনবেশে কমান্ডোদের দলে ভিড়ে তথ্য নিয়ে খৃস্টানদের কাছে ফাঁস করে দেয়। ফলে খৃস্টানরা অভিযানের প্রাক্কালে ওঁৎ পেতে দলের সব ক'জন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। সুলতান আইউবীকে এ সংবাদও প্রদান করা হয় যে, এখন ভেতর থেকে প্রাচীর ভাঙ্গার আর কোন আশা নেই।

খৃস্টানরা দেখতে পেল, প্রাচীর ভাঙ্গার অভিযানে নিহতরা কার্কের-ই মুসলিম যুবক-যুবতী। সেই সূত্র ধরে তারা গণহারে মুসলমানদের ধর-পাকড় শুরু করে দেয়। মুসলিম মহিলারাও তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। যুবকদেরকে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে। বৃদ্ধদেরকে নিজ নিজ ঘরে এবং যুবতী মেয়েদেরকে দুর্গের সামরিক ব্যারাকে বন্দী করে রাখে। খৃস্টানদের হাতে বন্দী হয়ে কতিপয় মেয়ে আত্মহত্যাও করে ফেলে। কারণ, কাফেররা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, তা তাদের জানা ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীও ধারণা করলেন যে, এর জন্য কার্কের মুসলমানদের চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে। জানবাজদের সংবাদ শুনে তিনি তার নায়েবদের উদ্দেশে বললেন-

'এটা একজন ঈমান-বিক্রেতার গাদ্দারীর ফল। একজন মাত্র গাদ্দার ইসলামের এত বিশাল একটি বাহিনীকে ব্যর্থ করে দিল। কেউ আল্লাহর নামে

নিজের জান কোরবান করছে, আবার কেউ নিজের অমূল্য ঈমানটা কাফেরদের পায়ে উৎসর্গ করছে। গাদ্দাররা ইসলামের ইতিহাসের ধারাই পাল্টে দিচ্ছে...!'

বলতে বলতে সুলতান ক্ষুব্ধ হয়ে বসা থেকে ওঠে দাঁড়ান এবং প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'অতি শীঘ্রই আমি কার্ক জয় করব এবং ঐ গাদ্দারদের উপযুক্ত শাস্তি দেব।'

সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করেন। সুলতান তখন বলছিলেন–

'আজ রাতেই অবরোধ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কার্কের পেছন দিকে কোন্ বাহিনীকে পাঠাবে, একটু পরেই আমি তা জানাব।'

'ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য ক্ষমা চাই মহামান্য আমীরে মেসের'– জাহেদান বললেন– 'বোধ হয় এখন আর আপনি অবরোধ পরিপূর্ণ করতে পারবেন না। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি।'

'তুমি কি নতুন কোন সংবাদ নিয়ে এসেছ?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'দুশমনকে অসচেতন রেখে যেরূপ সফলতার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পূর্ণ সাফল্য আপনি উঠাতে পারলেন না'– জাহেদান জবাব দেন।

তিনি এমন অবলীলায় কথা বলছিলেন, যেন নিম্নপদস্থ অধীন কাউকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। এমনটা হবেই-বা না কেন। সুলতান তাঁর সব সিনিয়র-জুনিয়র কমান্ডার ও প্রশাসনের সব বিভাগের কর্মকর্তাদের স্পষ্ট বলে রেখেছেন যে, তারা যেন তাকে রাজা ভেবে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম না করে। সাহসিকতা ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে পরামর্শ দেয় এবং খোলাখুলি সমালোচনা করে। জাহেদান সুলতানের সেই নির্দেশনার উপরই আমল করছিলেন। তাছাড়া তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানও বটে। তিনি এমন একটি চোখ, যে চোখ অন্ধকারেও দেখে। তিনি এমন একটি কান, যে কান শত শত মাইল দূরের ফিসফিস কানাঘুষাও শুনতে পায়। তিনি কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তা সম্পূর্ণ অবগত। সুলতান জানেন, সফল গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। বিশেষত খৃস্টানরা যেখানে সালতানাতে ইসলামিয়ায় গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছে, সেখানে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অতিশয় উন্নত, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একটি গোয়েন্দা বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সফল। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের তিনজন অফিসার আলী বিন সুফিয়ান, তাঁর দু'নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও জাহেদান হলেন জানবাজ গুপ্তচর। বিচক্ষণতার সাথে তাঁরা খৃস্টানদের বহু পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

'আপনার তো জানা ছিল যে, খৃস্টানরা কার্কের প্রতিরক্ষা শক্ত করার

পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক সৈন্য কার্ক থেকে খানিক দূরে প্রস্তুত করে রেখেছে'– জাহেদান বললেন– 'আপনাকে এ তথ্যও দেয়া হয়েছিল, এই বাহিনীটিকে বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করা হবে। আমার গুপ্তচরদের তথ্যাদি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে লড়াই করবে। তারপরও আপনি সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ পরিপূর্ণ করেননি। তা থেকে দুশমন উপকৃত হয়েছে।'

'তা তারা কি আক্রমণ করে ফেলেছে?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আজ সন্ধ্যা নাগাদ তাদের বাহিনী সেই স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছবে, যেখানে আমাদের কোন সৈন্য নেই'– জাহেদান জবাব দেন– 'আমার গুপ্তচররা যেসব তথ্য নিয়ে এসেছে, তার সারমর্ম হল, খৃস্টান বাহিনী থাকবে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী। এ অভিযানে তাদের পদাতিক বাহিনী থাকবে কম। তারা আমাদের অবরোধের স্থানগুলোতে এসে পৌঁছবে এবং ডানে-বাঁয়ে হামলা করবে। তার ফল এছাড়া আর কী হবে যে, আমাদের অবরোধ ভেঙ্গে যাবে? খৃস্টানরা সংখ্যায় বিপুল বলেও সংবাদ পেয়েছি।'

'আমি তোমাকে আর তোমার সেইসব গোয়েন্দাদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এটা কত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, আমি তা বুঝি। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যেসব খৃস্টান সৈন্য আমাদের অবরোধ ভাঙ্গতে এবং শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে, আমি তাদেরকে সেই শূন্যস্থানেই খুইয়ে ফেলব। আল্লাহর সাহায্যের উপর আমার ভরসা আছে। তোমাদের কেউ যদি গাদ্দার না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়দান করবেন।'

'এখনো সময় আছে'– এক নায়েব বললেন– 'আপনার আদেশ পেলে আমরা এক্ষুণি তিন-চারটি ইউনিট পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং অবরোধের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে ফেলছি। এতে খৃস্টানদের হামলা ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।'

সুলতান আইউবীর চেহারায় অস্থিরতার সামান্য ছাপও নেই। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার রিপোর্ট যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কি তুমি বলতে পারবে যে, খৃস্টানরা ঠিক কোন্ সময়টিতে আক্রমণের স্থানে পৌঁছবে?'

'তাদের অগ্রযাত্রা বেশ দ্রুত'– জাহেদান জবাব দেন– 'তবুও রসদ তাদের সঙ্গে আসছে না; আসছে তাদের পেছনে। এতে বুঝা যাচ্ছে, পথে তারা কোথাও বিরতি দেবে না। যদি তারা এ গতিতেই অবিরাম এগুতে থাকে, তাহলে দুপুররাত নাগাদ তারা হামলার স্থলে পৌঁছে যাবে।'

'আল্লাহ রহম করুন, যেন তারা পথে কোথাও না থামে'– সুলতান

আইউবী বললেন– 'কিন্তু তারা এসেই তো আর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত উট-ঘোড়া নিয়ে হামলা করবে না। হামলার স্থানে এসে তারা পশুদেরকে দানা-পানি গ্রহণ ও বিশ্রামের সুযোগ দেবে। এই অবসরে তারা দেখে নেবে যে, আমাদের অবরোধে কোন ফাঁক-ফোকড় আছে কিনা। খৃস্টানরা এত নির্বোধ নয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি না বুঝেই হামলা করে বসবে।'

সুলতান আইউবী তার দু'তিনজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে বললেন-

'খৃস্টানরা আমাদের ফাঁদে এগিয়ে আসছে। দুর্গের পেছন দিকে আমরা যে স্থানটুকু অবরোধের বাইরে রেখেছি, তা আরো সম্প্রসারিত করে দাও। ডান ও বামের বাহিনীকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের পেছন থেকে হামলা আসছে। পার্শ্ব বাহিনীকে আমাদের মধ্যস্থলে এসে পড়ার সুযোগ করে দাও। খবরদার, কোন তীরান্দাজ আদেশ ছাড়া যেন তীর না ছুঁড়ে।'

এসব দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী নিজের স্পেশাল পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনীকে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সেই স্থানে পৌঁছে যাওয়ার আদেশ দেন, যা খৃস্টানদের সম্ভাব্য আক্রমণের নিকটবর্তী জায়গা। এলাকাটা না সমতল, না বালুকাময়। এলাকার কোথাও টিলা, কোথাও বড় বড় পাথর খণ্ড, কোথাও গুহা। সুলতান আইউবী কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডারকেও ডেকে আনান। তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, খৃস্টান ফৌজের পেছনে অমুক পথে তাদের রসদ আসছে। সেই রসদের বহর রাতেই পথে ধ্বংস করতে হবে। এ জাতীয় আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে বসেন। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে সঙ্গে করে সুলতান রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আবেগপ্রবণ মানুষ নন। তিনি দূর থেকে অবরোধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বললেন, 'খৃস্টানদের হাত থেকে এই দুর্গ ছিনিয়ে আনা সহজ নয়। অবরোধ দীর্ঘসময় পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে।' সুলতান দেখলেন যে, দুর্গের সামনের প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মত তীরবর্ষণ হচ্ছে। দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তাঁর বাহিনীর অবস্থান তীরের আওতার বাইরে। কাজেই জবাবী তীরান্দাজী অনর্থক। সুলতান আইউবী দুর্গের সম্মুখ থেকে এক পার্শ্বের দিকে চলে যান। সেখানে তিনি বিস্ময়কর এক দৃশ্য দেখতে পান। তাঁর বাহিনীর একটি ইউনিট বৃষ্টির ন্যায় দুর্গের প্রাচীরের উপর তীর নিক্ষেপ করছে। অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছে ছয়টি মিনজানিক। প্রাচীরের উপর যেখানে তীর ও অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে,

সেখানে কোন খৃস্টান সেনা চোখে পড়ছে না। তারা পেছনে সরে গেছে। সুলতান আইউবী দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করছেন। এ সময়ে তার বাহিনীর চল্লিশজন সৈনিক হাতে বর্শা ও কোদাল তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে প্রাচীরের দিকে ছুটে যায়। তারা প্রাচীরের সন্নিকটে পৌঁছে যায়। দুর্গের প্রাচীর পাথর ও মাটি দ্বারা নির্মিত। তারা প্রাচীর ভাঙ্গতে শুরু করে। প্রাচীরের উপরে তীর ও আগুনের গোলাবর্ষণ এ জন্যই চলছিল যে, যাতে প্রাচীর ভাঙ্গার সময় দুশমন উপর থেকে তীর ছুঁড়তে না পারে।

সুলতান আইউবীর মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসে 'শাবাশ'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেন তিনি। দুর্গের প্রাচীরের উপর হট্টগোলের শব্দ শুনতে পান। সুলতানের জানবাজরা যে স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গছিল, ঠিক তার সোজা প্রাচীরের উপর হঠাৎ বেশকিছু খৃস্টান সৈন্যের মাথা ও কাঁধ আত্মপ্রকাশ করে। পরপরই বড় বড় বালতি ও ড্রাম চোখে পড়ে। প্রাচীরের অপর দিক থেকে মাথা জাগিয়েই খৃস্টান সৈন্যরা বালতি ও ড্রামগুলো প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরের দিকে উল্টিয়ে ফেলে দেয়। সেগুলো থেকে জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার বেরিয়ে আসে। এগুলো নীচে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত মুজাহিদদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। দূরের মুজাহিদরা সামনে এগিয়ে গিয়ে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তাদের তীরের আঘাতে বেশকিছু খৃস্টান সেনা ঘায়েল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের অন্য একদিক থেকে অনেকগুলো তীর মুজাহিদদের দিকে ধেয়ে আসে। তাতে তীরান্দাজ মুজাহিদদের অনেকে আহত হয়, অনেকে শহীদ হয়ে যায়। তারপর উভয় দিক থেকে বৃষ্টির মত এত অধিক তীর আসতে শুরু করে যে, যেন শূন্যে তীরের জাল বোনা হচ্ছে। জানবাজদের প্রাচীর ভাঙ্গার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কাজটি বেশ দুরূহ। প্রাচীরের উপর দিক অপেক্ষা নীচের দিকটা বেশী প্রশস্ত। তাদের গায়ে উপর থেকে তীর ছোঁড়া সম্ভব নয় বটে, কিন্তু তাদের উপর জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জ্বলন্ত কয়লাভরা বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপকারী খৃস্টান সেনারা কেউ-ই বাহ্যত মুসলিম তীরান্দাজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা তীরের আঘাত খেয়ে নীচে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই বাইরের দিকে আগুন ফেলে দিচ্ছে।

একদিকে উপর থেকে আগুন পড়ছে, অপরদিকে সুলতান আইউবীর জানবাজরা নিক্ষিপ্ত আগুন উপেক্ষা করে প্রাচীর ভেঙ্গে চলেছে। আরেকদিকে দু'পক্ষের মধ্যে চলছে তীর বিনিময়। অবশেষে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত মুজাহিদরা আগুনের কাছে ঘায়েল হয়ে যায়। আগুনে অনেকের গা ঝলসে যায়। তাদের কয়েকজন এমন অবস্থায় পেছনে ছুটে যায় যে, তাদের গায়ের কাপড়-চোপড়ে আগুন জ্বলছে। তারা প্রাচীরের সন্নিকট থেকে সরে যাওয়া মাত্র

উপর থেকে তীর আসতে শুরু করে। তীর তাদের পিঠে বিদ্ধ হয়। তীরের আঘাত খেয়ে তাদের সব ক'জনই শাহাদাতবরণ করে।

এবার অপর দশজন জানবাজ মুজাহিদ প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে আসে। উপর থেকে দুশমনের নিক্ষিপ্ত তীর উপেক্ষা করে তারা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে যায়। তারা প্রাচীর ভাঙ্গার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। উপর থেকে তাদের গায়েও আগুনের বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপ করা হয়। নিক্ষেপকারীদের কয়েকজন এতো উপরে উঠে আসে যে, তারা বুকে মুজাহিদদের তীর নিয়ে পেছন দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে প্রাচীরের বাইরে পড়ে যায় এবং নিজেদেরই নিক্ষিপ্ত আগুনে পুড়ে ছটফট করে মরে যায়। তবে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত এই মুজাহিদদেরও সবাই শহীদ হয়ে যায়।

সুলতান আইউবী ঘোড়া ছুটান। অপারেশনরত বাহিনীর কমান্ডারের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার উপর এবং তোমাদের জানবাজদের উপর আল্লাহ্ রহম করুন। ইসলামের ইতিহাস তোমার সেই জানবাজদের আজীবন স্মরণ রাখবে, যারা আল্লাহর নামে আগুনে পুড়ে জীবন দিয়েছে। তবে এই পন্থা আপাতত বন্ধ করে দাও। পেছনে সরে যাও। এখনই এত মানুষ ও তীর নষ্ট কর না। খৃস্টানরা এই দুর্গের জন্য এত আয়োজন করে রেখেছে, যা আগে আমি কল্পনাও করিনি।'

'আর আমরাও এত অধিক কোরবানী দেব, যা খৃস্টানদের কল্পনার অতীত'– কমান্ডার বলল- 'কার্ক দুর্গের প্রাচীর এখান থেকেই ভাঙ্গব এবং আপনাকে আমরা এখান দিয়েই ভেতরে নিয়ে যাব।'

'আল্লাহ তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করুন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে আপাতত তুমি তোমার মুজাহিদদের বাঁচিয়ে রাখ। খৃস্টানরা বাইরে থেকে হামলা করতে যাচ্ছে। তোমাদেরকে সম্ভবত দুর্গের বাইরেই যুদ্ধ করতে হবে। অবরোধ শক্ত রাখ। আমরা খৃস্টানদেরকে দুর্গের ভেতরে না খাইয়ে মারব।'

বাহিনীটিকে পেছনে সরিয়ে নেয়া হল। কিন্তু কমান্ডার সুলতান আইউবীকে বলল, 'সালারে আজমের অনুমতি হলে আমি শহীদদের লাশগুলো তুলে আনতে চাই।'

'হ্যাঁ, তুলে নিয়ে আস'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি কোন শহীদের লাশ যেখানে-সেখানে ফেলে রাখতে চাই না।'

সুলতান আইউবী সেখান থেকে চলে যান। তার জানবাজ বাহিনীটি সঙ্গীদের লাশগুলো তুলে আনে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। যে ক'টি লাশ তুলে আনা হল, সে পরিমাণ মুজাহিদ নতুন করে শাহাদতবরণ করল। সুলতান আইউবী ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর পতাকা সঙ্গে রাখেন না, যাতে দুশমনরা বুঝতে না পারে যে, তিনি এখন কোথায়

আছেন। ফৌজ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে সুলতান এক পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েন। তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং একটি টিলার উপর উঠে শুয়ে পড়েন, যাতে দুশমন তাকে দেখতে না পায়। এখন তিনি কার্ক দুর্গ ও নগরীর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন। অন্তত দীর্ঘ এক মাইল এলাকা এখন তার চোখের সামনে। খানিক পর তিনি শয়ন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সাবধানে চারদিক ঘুরে-ফিরে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

সূর্য ডুবে গেছে। সুলতান আইউবী সেখানেই আছেন। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এল, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনী এগিয়ে আসছে। তিনি দূতকে বললেন, কমান্ডারদের ডেকে আন। মুহূর্তে মধ্যে কমান্ডাররা এসে সুলতানের সামনে উপস্থিত হল। কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডারও আছে তাদের সঙ্গে। পথ-নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী তাকে অপারেশনে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর অন্যান্য কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন।

✿ ✿ ✿

মধ্যরাত। দূর থেকে ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে, যেন বাঁধভাঙ্গা মহাপ্লাবন ধেয়ে আসছে। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে চারদিক। খৃস্টানদের বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী পার্বত্য এলাকার খানিক দূরে এসে পড়েছে। তাদের পেছনে উষ্ট্রারোহী বাহিনী। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, তিন হাজারের কম। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে পাঁচ থেকে আট হাজার। তবে তাদের সঠিক সংখ্যা ছিল দশ থেকে বার হাজারের মধ্যে। তাদের কমান্ডার ছিল প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেমান্ড। দু'জন ঐতিহাসিকের মতে কমান্ডারের নাম রেনাল্ট। তবে সঠিক তথ্য হল, রেনাল্ট নয়- রেমান্ডই ছিল সেই বাহিনীর কমান্ডার। এই অভিযানের লক্ষ্যে এই বাহিনীটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরবর্তী এক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল। আজ রাত-ই কিংবা কাল প্রত্যুষে তারা সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধকারী বাহিনীটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

খৃস্টান আরোহীরা ঘোড়া ও উটের পিঠ থেকে অবতরণ করে। প্রতিটি ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা খাবারের থলে। আরোহী সৈন্যদের নির্দেশ দেয়া হল, তারা যেন নিজ নিজ পশুর কাছে থাকে এবং বেশী সময়ের জন্য ঘুমিয়ে না পড়ে। তাদের পশুপালের দানা-পানি পেছনে আসছে। খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিল, মুসলমানদের উপর পেছন থেকে আচানক হামলা করে ঘোড়াগুলোকে দুর্গের ভেতর থেকে পানি পান করিয়ে আনবে। সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা খৃস্টান

বাহিনীর গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখছে। খৃস্টান সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তারা ঘাবড়ে যায়।

খৃস্টান সৈন্যরা নিজ নিজ বাহনে আরোহন ও তরবারী-বর্শা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ পায়। এটি মূলত হামলা করারই নির্দেশ। বিশাল এলাকা জুড়ে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু যেইমাত্র সামনের সারিটি ঘোড়ার পিঠে কষাঘাত করে ছুটতে উদ্যত হয়, অমনি পেছন থেকে বৃষ্টির মত তীর আসতে শুরু করে। যেসব আরোহী সৈন্যের গায়ে তীর বিদ্ধ হয়, তারা কেউ ঘোড়ার উপরই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর যেসব ঘোড়া তীরবিদ্ধ হয়, তারা নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। উটগুলোও যেইমাত্র চলতে শুরু করল, অমনি তাদের মধ্যেও হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। শা শা করে তীর এসে বিদ্ধ হতে থাকে তাদের গায়ে। খৃস্টান কমান্ডার বুঝেই উঠতে পারলেন না যে, হলটা কী? তার সৈন্যবিন্যাস এভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছেই বা কেন? তিনি রাগের মাথায় চীৎকার শুরু করে দেন। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো পুরো বাহিনীর মধ্যে চরম এক আতংক ছড়িয়ে দেয়। ভোরের আলো ফোটার পর রেমান্ড টের পেলেন যে, তিনি সুলতান আইউবীর গ্যাড়াকলে আটকা পড়েছেন। মুসলমানদের সংখ্যা কত, তা তাঁর জানা ছিল না। তার ধারণা, সংখ্যায় মুসলমানরা অনেক। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি আক্রমণ অভিযান স্থগিত ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ততক্ষণে তার সামনের সারির সৈন্যরা সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে তার পুরো বাহিনীর পৌঁছানোর কথা।

সুলতান আইউবী দুর্গ অবরোধকারী বাহিনীকে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে রেখেছেন। তারা এই হামলাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। শূন্যে ধূলোবালি উড়তে দেখেই তারা পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়। একসময় আত্মপ্রকাশ করে একদল অশ্বারোহী খৃস্টান সৈন্য। মুজাহিদরা হামলা প্রতিহত করার পজিশনে চলে যায়। তারা ডানে ও বাঁয়ে প্রস্তুত অবস্থায় ছিল। যেইমাত্র খৃস্টানদের ঘোড়ার বহর তাদের মধ্যখানে এসে পৌঁছায়, অমনি তারা দু'দিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতক্ষণে খৃস্টানদের এই দলটি টের পেল যে, তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের বাহিনী পূর্বের স্থান ছেড়ে রওনা-ই হয়নি। সুলতান আইউবী নিজেই এই অভিযানের তত্ত্বাবধান করছিলেন। মোকাবেলা করার জন্য খৃস্টানরা পেছনে মোড় ঘুরায়। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের কৌশল আগেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন, পেছনে সরে গিয়ে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তারা কোন শত্রুই খুঁজে পাচ্ছে না। আইউবীর সৈন্যরা তাদের উপর বেধড়ক তীর ছুঁড়ছে ডান-বাম ও পেছন দিক

থেকে। খৃস্টান কমান্ডাররা তাদের বাহিনীটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে ফেলে। সুলতান আইউবীর কমান্ডাররা নির্দেশনা মোতাবেক তাদের মুখোমুখি মোকাবেলা করার সুযোগই দিচ্ছে না। খৃস্টানদের ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তারা রসদের অপেক্ষা করছে। তাদের রসদ ভোর পর্যন্ত এসে পৌঁছানোর কথা।

বেলা দ্বিপ্রহর। কিন্তু এখনো খৃস্টানদের রসদ এসে পৌঁছায়নি। সংবাদ নেয়ার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে যায়। কিন্তু তারা পথে মুসলিম তীরান্দাজদের আক্রমণের শিকার হয়ে নিহত হয়। গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হলেও তারা রসদের সন্ধান পেত না। তাদের রসদের বহর রাতেই সুলতান আইউবীর গেরিলাদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী তার রিজার্ভ বাহিনী থেকে আরো ফোর্স তলব করেন এবং রেমান্ডের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা যদি খৃস্টানদের সমানও হত, তাহলে তারা হামলা করে খৃস্টানদের সমূলে নিঃশেষ করে দিতে পারত। কিন্তু সংখ্যায় মুসলমানরা নগন্য। তাই সুলতান আইউবী তার এই সামান্য জনশক্তিকে নষ্ট করতে চাইছেন না। তিনি খৃস্টান বাহিনীটিকে ঠেলে ঠেলে পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে নিজের ঘেরাওয়ে নিয়ে ফেলেন। তিনি জানতেন, সময় যত গড়িয়ে যাবে, খৃস্টানরা তত হতাশ ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু খৃস্টানদেরকে ঘেরাওয়ে নিয়ে ফেলে তিনি নিজেও বেশ বেকায়দায় পড়ে যান। কারণ, ঘেরাও বহাল রাখার জন্য তার বহু সৈন্য এখানে এমনভাবে আটকা পড়ে গেছে যে, তাদের দিয়ে অন্য কোন কাজ করান যাচ্ছে না।

এলাকায় পানি আছে, যা বেশ কিছুদিন পশুদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। আর সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আছে আহত ঘোড়া ও উটের গোশত। সুলতান আইউবী নগরীর অবরোধ পরিপূর্ণ করে ফেলার নির্দেশ দেন। খৃস্টান বাহিনী কোথাও স্থির দাঁড়াতে পারছে না। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আক্রমণের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাদের। এভাবে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। সুলতান দুর্গ ও নগরীর চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখছেন, কোন দিক দিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা।

✿ ✿ ✿

অবরোধের ষোল কিংবা সতেরতম দিন। সন্ধ্যাবেলা। সুলতান আইউবী নিজ তাঁবুতে বসে নায়েব ও অন্যান্যদের সঙ্গে দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গার কৌশল নিয়ে কথা বলছেন। এমন সময় এক রক্ষী ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ দেয়, সুদানের রণাঙ্গন থেকে দূত এসেছেন। সুলতান আইউবী চমকে উঠে বললেন, 'তাকে এক্ষুণি

ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আল্লাহ করুন, লোকটা ভাল সংবাদ এনে থাকুক।'

দূত তাঁবুতে প্রবেশ করে। সুলতান আইউবী দেখেই চিনে ফেললেন, লোকটি দূত নয়- কোন এক সেনাদলের কমান্ডার। সুলতান তাকে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল সংবাদ নিয়ে এসেছ তো?... বস।

কমান্ডার 'না সূচক' মাথা নেড়ে বলল, 'মহান সেনাপতি যেমন মনে করেন। আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে হলে আপনি তাকে ভালও বলতে পারেন, আবার মন্দও বলতে পারেন। ভাল এ জন্য নয় যে, আমরা সুদানে বিজয় অর্জন করতে পারিনি। আর ভাল এ কারণে বলা যায় যে, আমরা পরাজিত কিংবা পিছপা হয়নি।'

'তার মানে পরাজয় ও পিছুহটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাই না?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'সেই লক্ষণ স্পষ্ট'– কমান্ডার জবাব দেয়– 'আমি আপনার আদেশ নেয়ার জন্য এসেছি যে, এখন আমরা কী করব? আমাদের স্পেশাল সৈন্যের একান্ত প্রয়োজন। যদি তার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে পেছনে সরে না এসে উপায় নেই।'

সুলতান আইউবীর অবর্তমানে তাঁর ভাই তকিউদ্দীন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সুদান ও মিসরের সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেরাউনী আমলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খৃস্টানদের সৃষ্ট ভয়ংকর এক ড্রামা আবিষ্কার করেছিলেন। তারপরই তিনি এই ভেবে সুদান আক্রমণ করেন যে, সেখানে মিসরের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। তার উপদেষ্টাবৃন্দ ও সালারগণ বলেছিলেন, কাজটা সুলতান আইউবীর অনুমতি নিয়ে করা হোক। কিন্তু তকিউদ্দীন তা না করে এই বলে সুদান আক্রমণ করে বসেন যে, তিনি সুলতানকে এর জন্য বিরক্ত করতে চান না। এখন এই কমান্ডার সংবাদ নিয়ে এল, সুদানে তারা পরাজিত হতে চলেছে। সাধারণ দূতের পরিবর্তে তকিউদ্দীন একজন কমান্ডার এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, সে সুলতানকে ময়দানের সঠিক চিত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করতে পারবে। তার আগে সুলতান শুধু এতটুকু সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তকিউদ্দীন সুদান আক্রমণ করেছে।

কমান্ডার সুলতান আইউবীকে যে কাহিনী শোনায়, সংক্ষেপে তা এই–

মিসরের বর্তমান অস্থায়ী গভর্নর বাস্তবতার উপর দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন ও নির্দেশ দেন। বস্তুত তকিউদ্দীনের আবেগ-ইচ্ছা সুলতান আইউবীর আবেগ-ইচ্ছারই অনুরূপ। কিন্তু দু'ভাইয়ের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মধ্যে বেশ তফাৎ। তকিউদ্দীন যে ফয়সালা নিয়েছিলেন, সৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামী চেতনা থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সত্যটাকে

উপেক্ষা করেছেন যে, বিচার-বিবেচনা ছাড়া দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম যুদ্ধ-জিহাদ নয়। তিনি সুদানে নিয়োজিত তার গোয়েন্দাদের রিপোর্টও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেননি। তিনি একটি বিষয়ই মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, খৃস্টান কমান্ডাররা সুদানীদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সুদানীরা মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তকিউদ্দীন দুশমনকে রণসাজে প্রস্তুত অবস্থায়ই কাবু করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় খুটিয়ে দেখেননি যে, সুদানীদের সামরিক শক্তি কতটুকু, আক্রান্ত হলে তারা কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করবে, তাদের অস্ত্রের পরিমাণ কি, আরোহী সৈন্য কতজন, পদাতিক ক'জন ইত্যাদি। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তিনি ভেবে দেখেননি, তা হল সুদান আক্রমণ করলে পথের দূরত্ব কতটুকু হবে এবং রসদের ব্যবস্থা কিভাবে হবে?

তকিউদ্দীনের এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের দু'টি বিরূপ ফল শুরুতেই সামনে এসে যায়। প্রথমত সুদানীরা– অন্য শব্দে খৃস্টান সৈন্যরা তাকে সীমান্তে প্রতিরোধ করেনি। তারা তকিউদ্দীনকে সুদানের সেই অঞ্চল পর্যন্ত যাওয়ার পথ ছেড়ে দেয়, যেটি পানিহীন বিশাল মরু প্রান্তর। তকিউদ্দীন অবলীলায় সেই এলাকায় পৌঁছে যান। দ্বিতীয়ত তকিউদ্দীনের বাহিনী মূলত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কৌশল অনুপাতে যুদ্ধ করায় অভ্যস্ত, যারা সংখ্যায় সামান্য হয়েও দুশমনের বিশাল বিশাল বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারঙ্গম। এই বাহিনীকে সুলতান শুধু নিজেই ব্যবহার করতে পারতেন। সুলতান আইউবী সব সময় মুখোমুখি সংঘাত পরিহার করে চলতেন। কিন্তু তকিউদ্দীন ওসবের ধার ধারলেন না। তার এই বাহিনীতে অভিজ্ঞ ও জানবাজ গেরিলা যোদ্ধাও আছে। কিন্তু এদের সঠিক ব্যবহার জানতেন সুলতান আইউবী। এদের নিয়ে সুদান পৌঁছানোর পর অবস্থা এমন হল যে, তকিউদ্দীনের সমস্ত সৈন্য একটি মাত্র বাহিনীতে-ই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। দুশমন তকিউদ্দীনকে তাদের পছন্দনীয় জায়গায় নিয়ে যায় এবং তাঁর বাহিনীর উপর সুলতান আইউবীর-ই ধারায় গেরিলা হামলা শুরু করে দেয়। তকিউদ্দীন তার জানোয়ার ও জওয়ানদের জন্য এক ফোঁটা পানিও পেলেন না। তার গেরিলা বাহিনীর কমান্ডাররা তাকে বলল, আপনি আমাদেরকে ময়দানে স্বাধীন ছেড়ে দিন। আমরা নিজের মত করে অপারেশন চালিয়ে যাই। কিন্তু তকিউদ্দীন তা মানলেন না। তিনি ভাবলেন, এতে বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে, কেন্দ্রীয় কমান্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

যখন রসদের সমস্যা সামনে এল, ততক্ষণে তকিউদ্দীন বুঝতে পারলেন, তিনি অনেক দূর চলে এসেছেন, যেখানে রসদ পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লেগে

যাবে এবং রসদ বহনের পথও নিরাপদ নয়। আবহাওয়া এতই প্রতিকূল যে, তকিউদ্দীন সংবাদ পেয়ে যান, দুশমন তার রসদ ধ্বংস করার আগেই বাতাসের তোড়ে তার সমস্ত রসদ ও রসদবাহী পশুগুলো উড়ে গেছে।

এই দুর্ঘটনার পর গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার ও তকিউদ্দীনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়ে যায়। কমান্ডার বলল, আমি লড়াই করতে এসেছি লড়াই করব; কিন্তু এভাবে নয় যে, দুশমন কমান্ডো হামলা চালাবে, রসদপাতি শেষ হয়ে গেছে আর আমরা কেন্দ্রীয় কমান্ডের পাবন্দ হয়ে বসে বসে মার খাব। তকিউদ্দীন আদেশের সুরে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। প্রত্যুত্তরে কমান্ডার বলল, আপনার মনে রাখা উচিত যে, আপনি তকিউদ্দীন– সালাহুদ্দীন নন। আমরা সেই প্রত্যয় ও সেই পদ্ধতিতে লড়াই করব, যেভাবে লড়াই করতে আমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শিখিয়েছেন। আমরা গেরিলা সৈনিক। আমরা দুশমনদের রসদ ছিনিয়ে এনে নিজ বাহিনীকে খাওয়াতে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কমান্ডারের এ বক্তব্যের পর তকিউদ্দীন চৈতন্য ফিরে পান। তিনি নিজের ভুল উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কমান্ডারের বক্তব্য কত বাস্তবসম্মত এবং মর্মস্পর্শী। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'আমি মহান আল্লাহর আযাবকে ভয় করি। আমি এই জানবাজদেরকে– যারা ফিলিস্তিনে লড়াই করে এসেছে– অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাই না।'

'তা-ই যদি হয়, তাহলে আপনার আক্রমণ করাই উচিত হয়নি'– কমান্ডার বললেন– 'আমাদের মধ্যে একজন সৈনিকও এমন নেই, যে আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছি। আর মুসলমানদের এটাই শান যে, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে নিজেকে আল্লাহর নিকটবর্তী মনে করে। আপনি আবেগের তাড়নায় তাড়িত হয়ে বের হয়েছেন। আমরা দুশমনের ফাঁদে এসে পৌঁছেছি।'

তকিউদ্দিন আনাড়ি নন। সুলতান আইউবীর সেই উক্তিটি তার স্মরণ আছে যে, তিনি বলেছিলেন, নিজেকে রাজা ভেবে অন্যকে আদেশ কর না এবং জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজের ভুল এড়িয়ে যেও না। তাই কমান্ডারের এই কঠোর মন্তব্যকে তিনি গোস্তাখী মনে করেননি এবং তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন সব কমান্ডারকে ডেকে এনে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও আগামী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হল, কমান্ডো বাহিনীকে জবাবী আক্রমণ করার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হবে। রসদ পরিবহনের রাস্তাও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে আসবে। বাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দুশমনের উপর তিনদিক থেকে হামলা করা হবে।

এবারকার বন্টন ও বিন্যাসে উপকার এই হল যে, তকিউদ্দীনের বাহিনী সেই এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল, যেখানে পানি নেই। আছে শুধু বালি আর টিলা। কিন্তু একটি অসুবিধাও হল এই যে, এতে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে তারা নিজ নিজ পজিশনে গিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানার আগেই শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে আরো বিক্ষিপ্ত করে দিল। মুজাহিদদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডাররা নিজ নিজ বাহিনীকে আলাদা করে সুলতান আইউবীর শেখানো পন্থায় যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু তারপরও স্পষ্ট বুঝ হয়ে গেল যে, এই লড়াইয়ে তারা পেরে উঠবে না। তবু তারা ময়দানে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যায়। রসদ ও রিজার্ভ বাহিনীর সহযোগিতা পাওয়ার আশা তো সম্পূর্ণই তিরোহিত। কমান্ডো বাহিনী শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা করে শত্রুর ক্ষতিসাধন করছে আর খাদ্য-খাবার যা পাচ্ছে ছিনিয়ে আনছে। এই ছিনিয়ে আনা খাবার খেয়েই মুজাহিদরা টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

মুজাহিদদের এখন আর কেন্দ্রীয় কমান্ড নেই। তকিউদ্দীন তাঁর কর্মকর্তাদের নিয়ে দৌড়-ঝাঁপে ব্যস্ত। তিনি আগে যতটা আবেগতাড়িত ছিলেন, এখন ততটা শান্ত ও গম্ভীর। অনেকটা আশান্বিতও বটে। এ যাবত তাকে এমন কোন সংবাদ শুনতে হয়নি যে, অমুক দল বা বাহিনী শত্রুর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। সংঘাত-সংঘর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন সুদানের অর্ধেকটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মুজাহিদ কমান্ডাররাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, তারা এভাবে যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। তারা সুদান ত্যাগ করবে না। এখন দুশমনেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এক পর্যায়ে দুশমন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুজাহিদদেরকে কিভাবে সুদান ত্যাগে বাধ্য করা যায়, সেই চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়ে। মুসলিম সৈন্যরা মরু ও আবাদী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের কি পরিমাণ সৈন্য নিহত হয়েছে, তার কোন পরিসংখ্যান কেন্দ্রের কাছে নেই। তবে এতটুকু অনুমান করা যাচ্ছে যে, শত্রুও অনেকটা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মিসর আক্রমণের শক্তি-সাহস নেই। কিন্তু এ পদ্ধতির যুদ্ধ স্পষ্ট কোন সুফল বয়ে আনবে না। কোন এলাকা জয় করা যাবে না। মরা আর মারা ছাড়া এ যুদ্ধের কোন ফলাফল নেই।

এমনি পরিস্থিতিতে তকিউদ্দীন তার একজন কমান্ডার মারফত সুলতান আইউবীর নিকট মৌখিক পয়গাম প্রেরণ করেন। তিনি সুলতান আইউবীকে বলার জন্য বলে দেন যে, এখন সুদান অভিযানে সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়, আপনি সাহায্য প্রেরণ করুন। আমার সমস্ত সৈন্য বিভক্ত হয়ে গেরিলা অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযান দ্বারা সাফল্য অর্জন করতে হলে আরো সৈন্য

প্রয়োজন। তকিউদ্দীন কমান্ডারকে সুলতান আইউবীর নিকট থেকে এ প্রশ্নেরও জবাব নিয়ে আসতে বলে দেন যে, সাহায্য না পেলে কি আমি সুদানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া সৈন্যদেরকে একত্রিত করে মিসর ফিরে যাব? বর্তমানে মিসরে যে ফৌজ আছে, তা মিসরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসন এবং সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যই যথেষ্ট নয়। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করার প্রশ্নই আসে না। তবে সুলতান আইউবী পিছুটানে বিশ্বাসী নন। তকিউদ্দীনের সমস্যার সমাধান দেয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

❁ ❁ ❁

তকিউদ্দীনের এই দূত সুলতান আইউবীকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিল বটে, কিন্তু খৃস্টান ও সুদানীরা সেখানে আরো যে একটি যুদ্ধক্ষেত্র চালু করে রেখেছিল, সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। সম্ভবত সে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তার জানা ছিল না। সে তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল অনেক পরে।

তকিউদ্দীনের সৈন্যরা দশ-দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদানের কোন কোন এলাকায় যাযাবরদের ঝুপড়ি এবং তাঁবুও ছিল। কোথাওবা সবুজ-শ্যামল বাগান। অধিকাংশ এলাকা পতিত, অনাবাদী ও বালুকাময়।

একদিন সন্ধ্যায় তিনজন গেরিলা মুজাহিদ ফিরে এসে সিনিয়র এক কমান্ডারের সামনে উপস্থিত হয়। তাদের দু'জন আহত। তারা কমান্ডারকে জানায়, আমাদের দলে একুশজন মুজাহিদ ছিল। কমান্ডারসহ বাইশজন। আমরা দিনের বেলা একস্থানে লুকিয়ে ছিলাম। কমান্ডার এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছিলেন, যেন তিনি পাহারা দিচ্ছেন কিংবা কারো আগমনের অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক সুদানী উষ্ট্রারোহী এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করতে শুরু করে। আমাদের কমান্ডারকে দেখে সে থেমে যায়। কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে যান এবং তার সঙ্গে কি যেন কথা বলেন। আরোহী চলে গেলে কমান্ডার আমাদেরকে সুসংবাদ শোনান যে, এখান থেকে দু'মাইল দূরে একটি গ্রাম আছে, সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান। আরোহী আমাদের আপন লোক। সে আমাদেরকে সেই এলাকায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে গেছে। বলেছে, আমরা গেলে রাতে সেখানে আমাদের মেহমানদারী করবে এবং দুশমনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে হামলার কাজে সহযোগিতাও করবে।

শুনে আমরা খুশী হলাম। কিছু সময় নিরাপদে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি দুশমনের উপর হামলা করারও সুযোগ পাব, এ কম কথা নয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই আমরা সেই গ্রাম অভিমুখে রওনা হলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনটি কুঁড়ে ঘর। আশপাশে গাছ-গাছড়া এবং পানি আছে। আমাদেরকে ঝুঁপড়ির বাইরে ছাউনী ফেলতে বলা হল। কমান্ডার একটি ঝুঁপড়িতে ঢুকে পড়লেন। বাইরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হল এবং আমাদের সবাইকে খাবার খাওয়ান হল। কমান্ডার বললেন, এবার তোমরা শুয়ে পড়; আক্রমণের সময় হলে জাগিয়ে দেব। আমরা ক্লান্ত সৈনিকরা শুয়ে পড়লাম। আমি শুয়ে পড়লেও ঘুমালাম না। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন খটকা লাগছিল। হঠাৎ একটি ঝুঁপড়িতে একাধিক নারীর অট্টহাসির শব্দ কানে আসতে লাগল। আমি মাথা তুলে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম। মনে সন্দেহ জাগল। আমি সেদিকে আরো মনোযোগ দিলাম। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, আমাদের কমান্ডার ঝুঁপড়িতে দু'টি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করছে ও মদপান করছে। মেয়েগুলো গ্রাম্য পোশাক পরিহিত হলেও তাদেরকে গ্রাম্য বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ পর একদিকে আমি চাপা পদশব্দ শুনতে পেলাম। একাধিক মানুষের চলার শব্দ। চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম, বেশকিছু মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে বর্শা ও তরবারী। আমি ঝুঁপড়ির আড়ালে চলে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, এরা কারা। কিছুক্ষণ পর একজন লোক ঝুঁপড়িতে প্রবেশ করল এবং চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কাজ সেরে ফেলব কি? আমাদের কমান্ডার বললেন, ও তোমরা এসে গেছ? সবাই ঘুমিয়ে আছে, যাও সব ক'টাকে শেষ করে দাও।

আগত লোকগুলো আমাদের ঘুমন্ত মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই শহীদ হয়ে যায়। অনেকে জাগ্রত হয়ে মোকাবেলা করে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, আমার দু'জন সঙ্গী পালাচ্ছে। মওকা পেয়ে আমিও পালাতে শুরু করলাম এবং সঙ্গীদ্বয়ের সাথে মিলিত হলাম। তারা দু'জন আহত। আমরা সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করল না।

তকিউদ্দীনের এই কমান্ডার উষ্ট্রারোহী দুশমনের প্রদত্ত লোভে পড়ে গিয়েছিল, নাকি পূর্ব থেকেই দুশমনের এজেন্ট ছিল, তা জানা না গেলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ যুদ্ধেও দুশমন বিক্ষিপ্ত মুসলিম সেনাদলগুলোকে নিঃশেষ করার জন্য সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করা শুরু করেছে। দুশমন মানবিক দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাচ্ছিল।

এরূপ আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার আতা আল-হাশেমী একস্থানে উপবিষ্ট। তার বাহিনী তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে আছে। জায়গাটা মিসর থেকে রসদ আসার পথ। আতা আল-হাশেমী–

যার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা একশ'রও কম– মিসর থেকে রসদ আসার সমস্ত রাস্তা নিরাপদ করে ফেলেছিল। রসদের উপর গেরিলা আক্রমণকারী দুশমনের তিনি ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছেন। সুদানীরা তাকে ঘায়েল করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু জনাপাঁচেক জানবাজকে হত্যা করা ব্যতীত তারা আর কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

আতা আল-হাশেমী টিলার আড়ালে একস্থানে বসে আছে। তার সঙ্গে ছয়-সাতজন গেরিলা। এটি তার হেডকোয়ার্টার। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মধ্যবয়সী এক পুরুষের সঙ্গে যাযাবরের পোশাকে দু'টি রূপসী মেয়ে কোথাও যাচ্ছে। আতা আল-হাশেমীকে দেখে তারা তার কাছে চলে আসে। মেয়েগুলোকে সুদানী বলে মনে হল। কিন্তু পোশাকে তারা ছদ্মবেশী। মুখমণ্ডল ধূলিমলিন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। মেয়ে দু'টো পুরুষ লোকটির পেছনে পেছনে হেঁটে আসে, যেন তারা লজ্জায় অবনত।

পুরুষ লোকটি মিসরী ও সুদানী মিশ্রিত ভাষায় বলল, আমি মুসলমান। এরা দু'জন আমার কন্যা। এরা ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে। এদের খাওয়ার জন্য কিছু দিন।

আতা আল-হাশেমীর সুদানী ভাষা জানা ছিল। তিনি গেরিলা সৈনিক। সুদানী অঞ্চলে কমান্ডো অভিযানে পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি সুদানী ভাষা শিখেছিলেন। তার কাছে খাদ্য-খাবারেরও অভাব নেই। মুজাহিদদের রসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তার হাতে। এ-পথে এ যাবত দু'-তিনবার রসদ অতিক্রম করে। তার থেকে প্রতিবারই তিনি নিজের বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য-খাবার রেখে দিয়েছিলেন। পানিরও অভাব নেই।

কমান্ডার তিনজনকে খাবার খেতে দেন। তারা আহার করছে। এই ফাঁকে তিনি তাদের ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিচ্ছেন। কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ? পুরুষ লোকটি একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, আমরা অমুক এলাকার বাসিন্দা। আমাদের পুরো এলাকা যুদ্ধের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সুদানী-মুসলমান যখন, যারাই এসেছে আমাদের ক্ষতি করেছে, সহায়-সম্পদ খাদ্য-খাবার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি আমার এই মেয়ে দু'টোকে সৈন্যদের কবল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠলাম না। নিরুপায় হয়ে এদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মেয়ে দু'টোর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমি এখন ঘরছাড়া। যে কোন প্রকারে হোক আমি মিসর চলে যেতে চাই। কিন্তু কোন পথ দেখছি না। আপনি আমাদেরকে মিসর পৌঁছিয়ে দিন– বলেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে ক'দিন থাকবে?'

'যে ক'দিন থাকব, তোমাদের তিনজনকে সঙ্গে রাখব।' আতা আল-

হাশেমী জবাব দেন।

'তুমি এই মেয়ে দু'টোকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও'– মধ্যবয়সী লোকটি বলল– 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'আপনার জীবন কত কঠিন, দেখে আমার বিস্ময় লাগছে'– কোমল কণ্ঠে এক মেয়ে বলল– 'আপনার কি স্ত্রী-সন্তানদের কথা মনে পড়ে না?'

'সবই মনে পড়ে'– আতা আল-হাশেমী জবাব দেন– 'কিন্তু তাই বলে আমি আমার কর্তব্যের কথা তো ভুলতে পারি না।'

মনে হচ্ছে, যেন খাবার খেয়ে ও পানি পান করে আগন্তুকদের দেহে নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে। দু'মেয়ের একজন নিশ্চুপ থাকলেও অপরজনের মুখ খুলে গেছে। মেয়েটি যা বলল, তাতে আতা আল-হাশেমী ও তার জানবাজদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ পায়। মেয়েটি এ-ও বলল যে, আপনারা এতদূর এসে নিজেদের জীবন নষ্ট করছেন কেন?

এ কথা শোনা মাত্র আতা আল-হাশেমী উঠে দাঁড়ান। আগন্তুক তিনজনকেও উঠিয়ে দাঁড় করান এবং সঙ্গীদের ডেকে বললেন, এই সুদানীর পায়ে রশি বেঁধে আমার ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ফেল। হাশেমীর জানবাজরা কমান্ডারের নির্দেশ তামিল করে। তারা রশির এক মাথা লোকটির পায়ে বেঁধে অপর মাথা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে দেয়। আতা আল-হাশেমী এক সিপাহীকে বললেন, তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস। সিপাহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

আতা আল-হাশেমী মেয়ে দু'টোকে একত্রিত পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দু'জন তীরান্দাজকে ডেকে এনে বললেন, আমি ইশারা করা মাত্র মেয়ে দু'টোর চোখের ঠিক মধ্যখানে একটি করে তীর ছুঁড়বে এবং অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে দেবে। ঘোড়ার পেছনে বেঁধে রাখা সুদানী মাটিতে পড়ে আছে। ঘোড়া ছুটে চললে তার কী পরিণতি হবে, তা তার জানা ছিল। তীরান্দাজরা নিজ নিজ ধনুকে একটি করে তীর স্থাপন করে রাখে এবং অশ্বারোহী ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকে। আতা আল-হাশেমী সুদানী মেয়ে দু'টো এবং মধ্যবয়সী পুরুষটিকে বললেন, আমি তোমাদের তিনজনকে একবারই বলব যে, তোমরা তোমাদের আসল পরিচয় বলে দাও। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, স্বীকার কর। অন্যথায় পরিণতি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

সবাই নীরব। কারো মুখে রা নেই। মেয়েরা ঘোড়ার পেছনে বাঁধা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাকায়। সেও নিশ্চুপ। তারা পরস্পর চোখাচোখি করে মতবিনিময় করে নেয়। সুদানী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমাদেরকে মুক্ত করে দিন, আসল পরিচয় বলে দেব। আতা আল-হাশেমী তার সম্মুখে বসে যান এবং বলেন, আগে বল তারপর মুক্ত করব। লোকটি বলল, আরে পাষান! তোমার কাছে

আমি এত রূপসী দু'টি মেয়ে নিয়ে আসলাম, আর তুমি কিনা তাদেরকে তীরের নিশানা বানাচ্ছ! কোন অঘটন না ঘটিয়ে মেয়ে দু'টোকে বরণ করে নাও এবং সঙ্গীদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। এই মূল্য যদি সামান্য হয়, তাহলে বল সোনা-রূপা যা ইচ্ছা চাও, আমি সিরিয়া থেকে তোমাকে এনে দেব।

আতা আল-হাশেমী উঠে দাঁড়ান এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসা সিপাহীকে বললেন, দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকাও, পনের-বিশ কদম চালাও।

ঘোড়া চলতে শুরু করে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়া মাত্র সুদানী চীৎকার শুরু করে। আতা আল-হাশেমী চালককে ঘোড়া থামাতে বলেন। ঘোড়া থেমে যায়। হাশেমী লোকটির নিকটে গিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, সোজা করে কথা বল। লোকটি সম্মতি জানায় এবং বলে দেয় যে, আমি সুদানী গুপ্তচর। খৃস্টানরা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে নামিয়েছে। মেয়ে দু'টো সম্পর্কে বলল, ওরা মিসরী বংশোদ্ভূত। খৃস্টানরা তাদেরকে নাশকতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে ছেড়েছে।

আতা আল-হাশেমী লোকটির পায়ের বন্ধন খুলে দেন এবং তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করেন। সে জানায়–

আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমি সুদানে ছড়িয়েপড়া মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যদেরকে সুন্দরী নারী কিংবা সোনা-রূপার চমক দেখিয়ে হত্যা বা গ্রেফতার করিয়ে দেব কিংবা তাদেরকে পক্ষে নিয়ে আসব। লোকটি আরো জানায়, আতা আল-হাশেমী নামক এক মুসলিম কমান্ডার তাদের রসদ পরিবহনের পথকে এত নিরাপদ করে রেখেছে যে, তার তৎপরতায় খৃস্টান ও সুদানী গেরিলাদের অসংখ্য জীবনও নষ্ট হয় এবং মুসলমানদের রসদও গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তাই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, আমি আতা আল-হাশেমীকে এই মেয়েদের মাধ্যমে অন্ধ করে তাকে হত্যা করব কিংবা ফাঁদে নিয়ে গিয়ে হত্যা কিংবা বন্দী করব। আর যদি সে পাক্কা ঈমানদার বলে প্রমাণিত হয়, মেয়েদের দ্বারা ঘায়েল করা না যায়, তাহলে যে কোন কৌশলে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেব।

আতা আল-হাশেমী এই অনিন্দ্য-সুন্দর মেয়ে দু'টোকে কেন বরণ করল না ভেবে লোকটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এত রূপসী দু'টো মেয়ে এবং সোনা-দানার প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যান করলেন? জবাবে তিনি বললেন, কারণ, আমার ঈমান কাঁচা নয়।

আতা আল-হাশেমী মেয়েদেরকেও নিজের কাছে ডেকে আনেন। পূর্বে যে মেয়েটি কথা বলেছিল, সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন? তিনি বললেন, আগামীকাল সকালে আমি তোমাদেরকে

আমাদের হেডকোয়ার্টারে সালারে আজম তকিউদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তিন গোয়েন্দার তল্লাশি নেয়া হল। তিনজনেরই কাছে খঞ্জর পাওয়া গেল। পুরুষ লোকটির কাছে পাওয়া গেল একটি পুটুলী। ভিতরে হাশীশ।

আতা আল-হাশেমী তার একদল জানবাজকে পাহারাদারির জন্য খানিক দূরে একস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসেছে। এখন সন্ধ্যা। কমান্ডার তাদেরকে আগন্তুক তিনজনের ব্যাপারে অবহিত করেন। বলেন, এরা গুপ্তচর ও নাশকতাকারী সন্ত্রাসী। হতে পারে, এদের সঙ্গীদের জানা আছে যে, এরা আমাদের এখানে আছে এবং তারা এদেরকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য হামলা করবে। কমান্ডার গোয়েন্দাদেরকে তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন। তার চোখে ঘুম এসে যায়।

অল্পক্ষণ পরই কমান্ডারের চোখ খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে মেয়ে দু'টোর চেহারা ভেসে উঠে। তিনি ভাবনার জগতে হারিয়ে যান। কী সুশ্রী ও দেখতে নিষ্পাপ দু'টো মেয়ে! অথচ তাদের দ্বারা কাজ নেয়া হচ্ছে কত ঘৃণ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। এরা যদি কোন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিত, তাহলে এখন এরা কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ হয়ে সম্মানজনক জীবনযাপন করত।

ভাবতে ভাবতে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় আতা আল-হাশেমীর। ভাবেন, আমার স্ত্রীও তো যখন বধূবেশে আমার ঘরে এসেছিল, তখন এদেরই ন্যায় যুবতী ও মনোহারী ছিল। স্ত্রীর স্মরণ আতা আল-হাশেমীকে কল্পনার জগতে নিয়ে যায়।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে চারদিক। আতা আল-হাশেমী শয়ন করেছিলেন একটি টিলার পার্শ্বে। তিনি শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ান। পা টিপে টিপে মেয়ে দু'টো যেখানে শুয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে যান, যেন তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন।

মেয়ে দু'টো শুয়ে আছে একত্রে। তাদের আশপাশে ঘুমিয়ে আছে সিপাহীরা। সুদানী পুরুষটি খানিক দূরে কয়েকজন সৈনিকের বেষ্টনীতে শায়িত।

আতা আল-হাশেমী নিজের পা দ্বারা একটি মেয়ের পায়ে আলতোভাবে আঘাত করেন। কারো পায়ের ছোঁয়া অনুভব করে মেয়েটির চোখ খুলে যায়। চাঁদের আলোতে চিনে ফেলে আতা আল-হাশেমীকে। মেয়েটি উঠে বসে। আতা আল-হাশেমী তাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করেন। মেয়েটি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠে যে, অবশেষে তাহলে আমার যৌবনের যাদু এই পাথরসম কমান্ডারকে প্রভাবিত করেছে!

মেয়েটি আতা আল-হাশেমীর পেছনে পেছনে হাঁটা দেয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বলে কিছুই অন্য সিপাহীরা টের পায়নি।

মেয়েটিকে নিজের জায়গায় নিয়ে যান আতা আল-হাশেমী। মেয়েটির মাথায় এখন ওড়না নেই। চাঁদের আলোয় মাথার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সোনার তারের ন্যায় চিকচিক করছে। কমান্ডার কিছুক্ষণ মেয়েটির প্রতি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটিও একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকে কমান্ডারের প্রতি। তারপর মুখে হাসি টেনে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'আপনি ভয় করছেন দেখে আমার অবাক্ লাগছে। আমাকে আপনার নিকট আপনারই জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আপনি কি আমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না?'

আতা আল-হাশেমীর মুখে কথা নেই। তিনি নিশ্চল মূর্তির ন্যায় চুপচাপ মেয়েটির প্রতি তাকিয়েই আছেন। মেয়েটি তার ডান হাতটা ধরে টেনে এনে নিজের ঠোঁটের সঙ্গে লাগায় এবং বলে, 'আমি জানি, আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন এবং কী ভাবছেন।'

মুখ খুললেন কমান্ডার– 'আমি ভাবছি, তোমার পিতা আমারই মত একজন পুরুষ।' মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমান্ডার বললেন– 'আমিও একজন পিতা। কিন্তু এই দুই পিতার মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য। তোমার পিতা কত আত্মমর্যাদাবোধহীন আর আমি আত্মমর্যাদার পাহারাদারি করার লক্ষ্যে নিজের সন্তানদের এতীম বানানোর চেষ্টা করছি।'

'আমার পিতা নেই'– মেয়েটির বলল–'হয়ত দেখেছি; কিন্তু স্মরণ নেই।'

'মারা গেছেন?'

'তাও মনে নেই।'

'আর মা?'

'কিছুই মনে নেই'– মেয়েটি বলল- 'এ-ও মনে নেই যে, আমি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম, নাকি কোন যাযাবরের তাঁবুতে। কিন্তু এটা তো এমন রসহীন আলাপ করার সময় নয়।'

'আমরা সৈনিকরা স্মৃতিচারণে স্বাদ পাই'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'আমি তোমার মাথায়ও তোমার অতীতের দু'চারটি স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।'

'আমি স্বয়ংই একটি সুদর্শন স্মৃতি'– মেয়েটি বলল– 'যার সঙ্গে আমি সামান্য সময়ও অতিবাহিত করি, আজীবনের জন্য আমি তার স্মৃতি হয়ে যাই। আমার নিজের কোন স্মৃতি নেই।'

'তুমি নিজেকে 'সুদর্শন' নয় একটি 'ঘৃণ্য' স্মৃতি বল'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'তোমার দেহ থেকে আমি পাপের উৎকট গন্ধ পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে আসলে আমি মাতাল হয়ে যাব। কোন পুরুষই তোমাকে স্মরণে রাখে না। তোমার মতো মেয়েদের শিকারীরা আজ এখানে কাল ওখানে রাত কাটায়। এক শিকার পেয়ে গেলে পূর্বের শিকারের কথা ভুলে যায়। তোমার

এই রূপ দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। তুমি এখন আমার হাতে বন্দী। তোমার এই চেহারাটাকে আমি এই মুহূর্তে শাস্তিস্বরূপ আহত করে বিশ্রী বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করব না। এই মরুভূমি, মদ, হাশীশ আর অপকর্ম তোমাকে অল্পদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলে পরিণত করবে। তখন কাছে টেনে নেয়ার পরিবর্তে মানুষ তোমাকে অকেজো ভেবে ছুঁড়ে ফেলবে। এই খৃস্টান আর এই সুদানীরা তোমাকে ভিক্ষা করার জন্য রাস্তায় ঠেলে দেবে।

আতা আল-হাশেমীর দৃঢ়তা ও প্রভাব মেয়েটির মনোজগতে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। তকিউদ্দীনের কমান্ডার বলছিলেন–

'আমার একটি মেয়ে আছে। বয়সে তোমার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে। আমি তাকে এমন সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেব, যে আমার ন্যায় কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে উন্নত জাতের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। আমার মত সে-ও রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার হবে। আমার কন্যা বধূসাজে সাজবে। স্বামীর ঘরের রাণী হবে। স্বামীর হৃদয়-রাজ্যে রাজত্ব করবে। মানুষ আমার সৌভাগ্যশীল মেয়েটিকে এক নজর দেখতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। আমি তাকে নিয়ে গর্ব করব। তার স্বামী তাকে এত বেশী ভালবাসবে যে, বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সেই ভালবাসা শেষ হবে না। অপরদিকে তোমাকে দেখার জন্য কেউ অস্থির হয় না। কারণ, তুমি একটি উন্মুক্ত রহস্য। কারো অন্তরে তোমার মর্যাদা নেই। তোমাকে ভালবাসা দেবে এমন কাউকেও তুমি খুঁজে পাবে না।'

'আপনি আমার সঙ্গে এসব কথাবার্তা কেন বলছেন?' মেয়েটি এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন কথাগুলো তার ভাল লাগছে না।

'আমি তোমাকে বুঝাতে চাই যে, তোমার মত মেয়েরা পবিত্র হয়ে থাকে'– আতা আল-হাশেমী জবাব দেন– 'আমরা মুসলমানরা মেয়েদেরকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করি। তুমি যদি সতীত্ব-সম্ভ্রম ও ধর্মের অর্থ বুঝে নিতে পার, তাহলে আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করবেন। কিন্তু তুমি তা বুঝবে না। কারণ, তুমি সেই ভালবাসা সম্পর্কে অবহিত নও, যা আত্মার গভীর থেকে উত্থিত হয় এবং আত্মার গভীরে গিয়ে স্থান করে নেয়। তুমি বদনসীব। তুমি পুরুষের মোহ দেখেছ, ভালবাসা দেখনি।'

আতা আল-হাশেমী ধীরে ধীরে বলে চললেন। তার কথা বলার ভঙ্গী আর প্রভাবই আলাদা। কিন্তু মেয়েটি এই ভেবে বিস্মিত যে, এই লোকটিও তো আর দশজনের ন্যায় পুরুষ। কিন্তু লোকটি আমার এই উপচেপড়া রূপ-যৌবনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিল না! আতা আল-হাশেমী তো পাষাণও নন। তিনি তো আপাদামস্তক আবেগে নিমজ্জিত একজন সুপুরুষ। মেয়েটি অস্থির হয়ে যায়। বলল, 'আপনার কথার মধ্যে আমি এমন নেশা ও মাদকতা অনুভব করছি, যা

আমার হাশীশে নেই। আপনার একটি কথাও আমি বুঝতে পারিনি। তথাপি প্রতিটি কথাই আমার অন্তরে দাগ কেটেছে।'

মেয়েটি বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ। এ ধরনের নাশকতামূলক কাজের জন্য বিচক্ষণতা অবশ্যকীয় গুণ। পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর জন্য ওকে ছোটবেলা থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পুরুষটি মেয়েটির সব বিদ্যা-বুদ্ধি অকেজো করে দিয়েছে। মেয়েটি আতা আল-হাশেমীকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে। ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নও করে। তার বলার ভঙ্গিতে এখন পেশাদারী ভাব নেই। এখন কথা বলছে যে স্বাভাবিক গতিতে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'তোমাকে আমি কোন শাস্তি দিতে চাই না'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'আগামীকাল সকালে আমি তোমাকে আমার সালারে আজমের হাতে তুলে দেব।'

'তিনি আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?'

'যা আমাদের আইনে লেখা আছে।'

'আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন?'

'না।'

'আমি শুনেছি, মুসলমানরা নাকি একের অধিক স্ত্রী রাখে'– মেয়েটি বলল– 'আপনি যদি আমাকে আপনার স্ত্রী বানিয়ে নেন, তাহলে আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন আপনার সেবা করব।'

'আমি তোমাকে আমার কন্যা বানাতে পারি– স্ত্রী নয়'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'কারণ, তুমি এখন আমার হাতে অসহায়। তুমি আমার আশ্রয়েও আছ, বন্দীতেও। আমি তোমার অসহায়ত্ব থেকে সুযোগ নিতে চাই না।'

আতা আল-হাশেমী ও গোয়েন্দা মেয়েটি কথা বলছেন। মেয়েটির পুরুষ সঙ্গী তিনজন সৈনিকের বেষ্টনীর মধ্যে শুয়ে আছে। কিন্তু সে জাগ্রত। আতা আল-হাশেমী মেয়েটিকে নিদ্রা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সে দেখেছিল। তাতে সে এই ভেবে আনন্দিত যে, মেয়েটি মুসলিম কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে খুন করতে পারবে। শুয়ে শুয়ে সে মেয়েটির ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।

দীর্ঘ সময় পর লোকটি ঘুমন্ত মুসলিমের প্রতি চোখ বুলায়। সিপাহীরা অচৈতন্য ঘুমিয়ে আছে। এই সুদানী লোকটি সন্ধ্যার পর তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল এবং হাসি-তামাশার মধ্যে তাদেরকে হাশীশ খাইয়ে দিয়েছিল। আতা আল-হাশেমী তল্লাশি চালিয়ে তার থেকে হাশীশের একটি পুটুলী উদ্ধার করলেও সামান্য একটু হাশীশ তার চোগার পকেটে লুকায়িত ছিল, যা আতা আল-

হাশেমী খুঁজে পাননি। রাতে গল্পের ছলে সেটুকু বের করে তিনজন সিপাহীকে খাইয়ে দেয়। মুসলিম সিপাহীরা নেশাপানে অনভ্যস্ত। তাই সামান্য একটুতেই অচেতন ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে সুদানী পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল।

সুদানী দেখল যে, তার সঙ্গী এক মেয়ে একটি টিলার পাদদেশে মুসলিম কমান্ডার আতা আল-হাশেমীর কাছে বসে আছে। এভাবে অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে আসছে না। সুদানী মনে করল, বোধ হয় মেয়েটি লোকটাকে খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

সুদানী শয়ন থেকে উঠে দাঁড়ায়। অতি সাবধানে ঘুমন্ত সিপাহীদের একটি ধনুক ও তূনীর থেকে কয়েকটি তীর হাতে তুলে নেয়। মুসলমানদের অস্ত্র দিয়েই মুসলিম কমান্ডারকে খুন করতে চাইছে সে। একপা-দু'পা করে অগ্রসর হতে শুরু করে। সামনে কয়েক ফুট উঁচু একটি জায়গা, যার কারণে আতা আল-হাশেমীকে দেখা যাচ্ছে না। পা টিপে টিপে জায়গাটা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় লোকটি।

এবার দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে। কমান্ডারের পিঠটা তার দিকে। তাই কমান্ডার তাকে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি চাঁদের আলোতে তীর-ধনুক হাতে একটি লোকের আগমন দেখতে পায়। আগত লোকটিকে চিনে ফেলে সে। আতা আল-হাশেমী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন। খঞ্জরটা তার কোষবদ্ধ পড়ে আছে এক পার্শ্বে। মেয়েটি ঝট করে খঞ্জরটা হাতে তুলে নেয়। দেখে আতা আল-হাশেমী খঞ্জর ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মেয়েটির প্রতি হাত বাড়ায়। কিন্তু এরই মধ্যে মেয়েটি অতি দ্রুততার সাথে নিজের সঙ্গী পুরুষটির প্রতি খঞ্জর ছুঁড়ে মারে।

দু'জনের মাঝে গজ কয়েকের ব্যবধান। অপরদিক থেকে আর্তচিৎকারের শব্দ কানে আসে। খঞ্জরটি সুদানীর ধমনীতে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং আহত হয়েও মেয়েটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে। শাঁ করে এসে তীরটি মেয়েটির বুকে বিদ্ধ হয়।

মেয়েটি যেদিকে খঞ্জর ছুঁড়ে মারল এবং যেদিক থেকে তীর আসল, আতা আল-হাশেমী সেদিকে দৌড়ে যান। সুদানী লোকটি ততক্ষণে দেহ থেকে খঞ্জরটি টেনে বের করে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। তার আক্রমণের আশংকায় আতা আল-হাশেমী লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ের সর্বশক্তি দিয়ে লোকটির পাজরে লাথি মারেন। লোকটি দূরে ছিটকে পড়ে। আতা আল-হাশেমী নিজে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান। কিন্তু সুদানী উঠতে পারল না। তার ক্ষতস্থানে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি খঞ্জর কুড়িয়ে হাতে নেন এবং মেয়েটির কাছে যান। মেয়েটি নিজেরই সঙ্গী ও দেহরক্ষীর তীর বুকে নিয়ে নির্জীব পড়ে আছে। তবে এখনো সে জীবিত। তীর বের করার কোন ব্যবস্থা নেই।

মেয়েটি আতা আল-হাশেমীর হাত চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছি। বিনিময়ে আপনি আপনার খোদাকে বলুন, যেন তিনি আমার আত্মাকে তার আশ্রয়ে নিয়ে নেন। আমার জীবনটা পাপের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি আমাকে নিশ্চয়তা দেন, আল্লাহ এই একটি নেকীর বিনিময়ে আমার গোটা জীবনের পাপ ক্ষমা করবেন কিনা। আপনি আপনার কন্যার মাথায় যেভাবে হাত বুলান, আমার মাথায়ও সেভাবে হাত বুলিয়ে দিন।'

আতা আল-হাশেমী মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি নিজে পাপ করনি, তোমাকে দিয়ে পাপ করানো হয়েছে। এতকাল কেউ তোমাকে আলোর পথ দেখায়নি।'

প্রচণ্ড ব্যথায় মেয়েটি কুঁকিয়ে উঠে শক্ত করে আতা আল-হাশেমীর ডান হাতটা ধরে বলতে থাকে–

'এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে সুদানীদের একটি ঘাঁটি আছে। তারা সেখানে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে অবস্থান করছে। আপনার সৈন্যরা এতবেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের ভাগ্যে এখন মৃত্যু বা বন্দীত্ব ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। আপনার প্রত্যেক কমান্ডার ও প্রতিটি সেনাদলের পেছনে আমার ন্যায় মেয়েদের লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি এ পর্যন্ত আপনার চারজন কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করেছি। আপনি মিসরের কথা ভাবুন। খৃস্টানরা সেখানে ভয়ানক ও সূক্ষ্ম জাল পেতে রেখেছে। আপনার জাতি ও সৈনিকদের মধ্যে এমন অনেক মুসলিম কর্মকর্তা আছে, যারা খৃস্টানদের বেতনভোগী গুপ্তচর ও ওফাদার। তারা আমার ন্যায় রূপসী নারী আর অঢেল সম্পদ ভোগ করছে। আপনারা মিসরকে রক্ষা করুন। সুদান ত্যাগ করে চলে যান। গাদ্দারদের চিহ্নিত করে শায়েস্তা করুন। আমি কারো নাম জানি না। যা জানা ছিল বলে দিলাম। আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে কন্যা আখ্যায়িত করলেন। আপনি আমাকে পিতার স্নেহ দিয়েছেন। তারই বিনিময়স্বরূপ আমি আপনাকে এসব তথ্য প্রদান করলাম। আপনি আপনার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনার উপর আক্রমণ হবে। ফাতেমী ও ফেদায়ীদের থেকে সাবধান থাকুন। তারা মিসরে এমন বহু কর্মকর্তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ও জাতির একান্ত বিশ্বস্ত ও অফাদার।'

ক্ষীণ হয়ে আসে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। সে দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

রাত কেটে ভোর হল। আতা আল-হাশেমী দু'টি লাশ ও জীবিত মেয়েকে নিয়ে তকিউদ্দীনের নিকট চলে যান। তকিউদ্দীনকে ঘটনা শোনান এবং নিহত মেয়েটির শেষ কথাগুলো তার কানে দেন। এসব নিয়ে তকিউদ্দীন পূর্ব থেকেই উদ্বিগ্ন। তিনি আরো বিচলিত হয়ে উঠেন। বললেন, 'তবে আমি সুলতান আইউবীর অনুমতি ব্যতীত পিছপা হতে চাই না। আমি বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল এক কমান্ডারকে কার্ক পাঠিয়েছি। তোমরা তার ফিরে আসা পর্যন্ত অটল থাক।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী দূতের বিবৃত যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান। তিনি তার উপদেষ্টাদের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বললেন–

'বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে পেছনে সরে আসা সহজ কাজ নয়। দুশমন তাদেরকে একত্রিত হতে দেবে না। তাছাড়া পেছনে সরে আসলেই সৈন্যদেরও মনোবল ভেঙ্গে পড়বে, যারা মিসরে অবস্থান করছে। বিষয়টা তাদেরও উপর প্রভাব ফেলবে, যারা আমার সঙ্গে এখানে রয়েছে। জনগণের মনও ভেঙ্গে যাবে। তবে বাস্তবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবতার দাবী হল, তকিউদ্দীন তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসুক। আমরা এ মুহূর্তে তাকে সাহায্য করতে পারছি না। কার্ক অবরোধ প্রত্যাহার করে তাকে সহযোগিতা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভাই বিরাট ভুল করল। আমার বড় মূল্যবান সৈন্যগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'সুদানের যুদ্ধ থেকে আমাদের হাত গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়া উচিত'– পদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন– 'নেতা ও শাসকবর্গের ভুল পদক্ষেপের কারণে সেনাবাহিনীর দুর্নাম হচ্ছে। দেশবাসীকে আমাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, সুদানে আমাদের পরাজয়ের জন্য সেনাবাহিনী দায়ী নয়।'

'সন্দেহ নেই যে, এটি আমার ভাইয়ের ভুল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর আমার ভুল হল, আমি তাকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলাম যে, কখনো কোন অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে যেন আমাকে কিছু না জানিয়েই করে ফেলে। এখন বেচারা সাত-পাঁচ বিবেচনা না করেই এতবড় অভিযান পরিচালনা করে ফেলল এবং নিজেকে দুশমনের দয়ার উপর ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি আমার ও আমার ভাইয়ের এই বিচ্যুতিকে দেশবাসী ও নূরুদ্দীন জঙ্গী থেকে গোপন রাখব না। আমি ইতিহাসকে ধোঁকা দেব না। আমি ইতিহাসের পাতায় লিখিয়ে রাখব যে, আমিই এই পরাজয়ের জন্য দায়ী– সেনাবাহিনী নয়। আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার অনাগত শাসকদের জন্য এই নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চাই যে, তারা যেন নিজেদের ত্রুটি গোপন রেখে নির্দোষ লোকদেরকে অপদস্থ না করে। নিজের দোষ ঢেকে রেখে

নিরপরাধ লোকদের উপর দায়-দায়িত্ব চাপানো এমন এক প্রবণতা ও প্রতারণা, যা বিশ্ব ভূমণ্ডলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবীর চেহারা লাল হয়ে যায়। কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি 'পেছনে সরে আস' উচ্চারণ করতে চাইছে না। তিনি কখনো পিছপা হননি। তিনি অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে লড়াই করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কাছে তিনি অসহায়। তিনি তকিউদ্দীনের প্রেরিত কমান্ডারকে বললেন–

'তকিউদ্দীনকে গিয়ে বল, সে যেন তার বাহিনীকে গুটিয়ে নেয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে পেছনে পাঠিয়ে দেয়। কোথাও দুমশন ধাওয়া করলে মোড় ঘুরিয়ে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করবে এবং এমন ধারায় লড়াই করবে, যেন দুশমন তোমাদেরকে ধাওয়া করতে করতে মিসরে ঢুকে না পড়ে। যখন যে দল মিসরে প্রবেশ করবে, তাদের সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেবে, যাতে দুশমন মিসর আক্রমণ করলে সফলতার সাথে তার মোকাবেলা করা যায়। নিরাপদে সরে আসার জন্য গেরিলা বাহিনীকে ব্যবহার করবে। কোন সেনাদলকে দুশমনের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ফেলে আসবে না। পেছনে সরে আসার এ সিদ্ধান্ত আমি বড় কষ্টে সহ্য করছি। কারণ, আমার এই সংবাদ বরদাশত করা সম্ভব হবে না যে, তোমাদের কোন বাহিনী দুশমনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পেছনে সরে আসা সহজ কাজ নয়। অগ্রাভিযানের তুলনায় মান-মর্যাদা বজায় রেখে নিরাপদে সরে আসা অনেক কঠিন কাজ। তোমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে। দ্রুতগামী একদল দূত সঙ্গে রাখবে। আমি লিখিত পয়গাম প্রেরণ করছি না। কারণ, পথে ধরা পড়ে গেলে দুশমন বুঝে ফেলবে যে, তোমরা পেছনে সরে যাচ্ছ।'

সুলতান আইউবী জরুরী নির্দেশনা দিয়ে দূত কমান্ডারকে বিদায় জানান। দূত রওনা হয়ে যায়।

দূতের ঘোড়ার পদশব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। এমন সময় জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন– 'কায়রো থেকে একজন দূত এসেছে।' সুলতান আইউবী তাকে ভেতরে ডেকে পাঠান। লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি। তিনি জানান, মিসরে দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে। আলী বিন সুফিয়ান তার পুরো বিভাগ নিয়ে তার মোকাবেলায় দিন-রাত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন নাজুক রূপ ধারণ করেছে যে, সেনা বিদ্রোহেরও আশংকা দেখা দিয়েছে।'

সুলতান আইউবীর চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। সমস্যা শুধু মিসরের

হলে চিন্তার তেমন কারণ ছিল না। মিসরকে তিনি বহু আশংকাজনক সমস্যা থেকে রক্ষা করেছেন। খৃস্টান ও ফাতেমীদের অনেক ভয়ংকর নাশকতামূলক পরিকল্পনা তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সমুদ্রের দিক থেকে আসা খৃস্টানদের ভয়াবহ হামলা তিনি সফলতার সাথে প্রতিহত করেছেন। খলীফাকে পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে রেখেছেন। কিন্তু কার্ক অবরোধ করে এখন তিনি সেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছেন। এই ময়দানে তার অনুপস্থিতি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কার্ক অবরোধ ছাড়াও তিনি দুর্গের বাইরে খৃস্টানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। এই অবরুদ্ধ খৃস্টান বাহিনী অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে সুলতান আইউবী তাঁর দুশমনের জন্য আপদ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এই যুদ্ধ তাঁর তত্ত্বাবধান ছাড়া লড়া সম্ভব নয়।

সুলতান আইউবীর আশংকা, তকিউদ্দীন যদি পলায়নের ধারায় পিছপা হতে শুরু করে, তাহলে শত্রু বাহিনী তাকে ওখানেই খতম করে সোজা মিসরে ঢুকে পড়বে। মিসরে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, তারা হামলা প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

এদিকে সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধের আশু সাফল্য সংশয়পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। উভয় রণাঙ্গনের সার্বিক চিত্র মিসরে বিদ্রোহের আশংকা জোরদার করে তুলছে, যার ফলে সুলতান আইউবীর সুদৃঢ় পা টলতে শুরু করেছে। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে থাকেন। খানিক পর মাথা তুলে বললেন–

'আমি খৃষ্টানদের সকল সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারি। আমি তাদের সেই বাহিনীরও মোকাবেলা করতে পারি, যাদেরকে তারা ইউরোপে সমবেত করে রেখেছে। কিন্তু আমার স্বজাতীয় গুটিকতক গাদ্দার আমাকে পরাজিত করে তুলেছে। কাফেরদের এই সহযোগীরা কেন নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছে? বোধ হয় তারা জানে, যদি তারা ধর্ম পরিবর্তন করে নতুন পরিচয় ধারণ করে, তাহলে খৃষ্টানরা তাদেরকে এই বলে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিবে যে, তোমরা ঈমানবেঁচা গাদ্দার। তাই ওরাই এদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে, তোমরা নাম-পরিচয়ে নিজ ধর্মে-ই থাক আর আমাদের থেকে বেতন-ভাতা নিয়ে গাদ্দারী কর।'

সুলতান আইউবী নীরব হয়ে যান। তাঁর তাঁবুতে যারা উপস্থিত ছিল, তারাও নীরব। সুলতান তাদের সকলের প্রতি একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন–

'আল্লাহ আমাদের থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে চাইছেন। আমরা যদি ঈমানের

উপর অটল থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কামিয়াব করবেন।'

সুলতান আইউবী তার সঙ্গীদের সাহস বাড়ানোর লক্ষ্যে একথা বললেন বটে; কিন্তু তার চেহারা বলছে তিনি শংকিত।

সুলতান আইউবীকে শুধু এটুকুই জানানো হয়েছিল যে, মিসরে বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিয়েছে এবং খৃষ্টানদের নাশকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বিস্তারিত তাকে জানানো হয়নি। এই সংক্রান্ত রিপোর্টের ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অনুপস্থিতির সুযোগে তিন-চারজন মুসলিম কর্মকর্তা খৃষ্টানদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। সুদান আক্রমণ করার দিনকয়েক পর-ই তকিউদ্দীন মিসরে রসদ চেয়ে পাঠান। যত দ্রুত সম্ভব রসদ প্রেরণ করার নির্দেশ পাঠানো হয়। কিন্তু দু'দিন পর্যন্ত রসদ পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাব আসে, একই সময়ে দু'টি ময়দান খোলা হয়েছে, এত রসদ আমি কোথা হতে দিব? এক পারি মিসরের বাহিনীকে উপোস রেখে সব খাদ্যসম্ভার ময়দানে পাঠিয়ে দিতে। এত পেট আমি ভরতে পারব না।

এই উক্তিটি যার, তিনি উচ্চপদস্থ একজন মুসলিম কর্মকর্তা এবং সুলতান আইউবীর ঘনিষ্টজনদের একজন। এমন এক ব্যক্তি, যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার প্রশ্নই আসেনা। ফলে তার জবাবের সত্যতা স্বীকার-ই করে নেয়া হল যে, আসলেই খাদ্যসম্ভারের অভাব রয়েছে। তথাপি তাকে অনুরোধ করা হল যে, যেভাবে সম্ভব ময়দানের যোদ্ধাদের জন্য কিছু রসদ পাঠিয়ে দিন। কর্মকর্তা কিছু রসদের ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু পাঠালেন আরো দু'দিন বিলম্ব করে।

পঞ্চম দিবসে রসদের কাফেলা রওনা হয়। উট ও খচ্চরের দীর্ঘ এক বহর। কাফেলার সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈনিক দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু কর্মকর্তা তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি যুক্তি দেখান, রসদ পরিবহনের সমস্ত পথ-ই নিরাপদ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তিনি মিসরেও পর্যাপ্ত সৈন্যের উপস্থিতির আবশ্যকতাও ব্যক্ত করেন। অবশেষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই রসদবাহী কাফেলা রওনা হয়ে যায়। ছয়দিন পর সংবাদ আসে, রসদ পথে-ই (সুদানের অভ্যন্তরে) দুশমনের কাছে আটকা পড়ে গেছে। সুদানী সৈন্যরা পশুপালসহ সমস্ত রসদ নিয়ে গেছে এবং পশুচালকদের হত্যা করে ফেলেছে।

কায়রোর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ অস্থির হয়ে পড়েন। এই রসদ বহর ধ্বংস হওয়া মিসরের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। সুদান রণাঙ্গনের বাহিনীর সংকট-অনুভূতি কর্মকর্তাদের আরো ভাবিয়ে তোলে। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে

বললেন, আপনি অবিলম্বে পুনরায় রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কর্মকর্তা বললেন, বাজারে খাদ্যসামগ্রীর তীব্র অভাব। আপনারা ব্যবসায়ীদেরকে বলুন, তারা খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিক। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হল। তারা তাদের খাদ্যগুদাম খুলে দেখায়–সব শূন্য। গোশতের জন্য দুম্বা, বকরী, গরু, মহিষ কিছু-ই পাওয়া গেল না। আরো খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মিসরে অবস্থানরত সৈন্যরাও পর্যাপ্ত রেশন পাচ্ছে না। তাই তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানায়, গ্রামাঞ্চল থেকে কোন মাল-ই আসছে না। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাইরে থেকে মানুষ মফস্বলে এসে তরি-তরকারী, ধান-চাল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী দামে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, মিসরের খাদ্যসামগ্রী পাচার হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এবার সকলের স্মরণ হল যে, তিন-চার বছর আগে সুলতান আইউবী মিসরের পূর্বেকার সেনাবাহিনীকে– যাদের অধিকাংশ ছিল সুদানী–বিদ্রোহের অপরাধে ভেঙ্গে দিয়ে তার অফিসার সৈন্যদেরকে সীমান্ত লাগোয়া আবাদযোগ্য জমি দিয়ে কৃষিকার্যে জুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা এখন মিসর সরকার এবং ব্যবসায়ীদেরকে তাদের উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছে না।

এ হল সুদান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে মাত্র ছয়-সাত দিনের মধ্যে। ফলে মিসর সরকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর অর্পণ করে। তারা দিন-রাত খাটা-খাটুনি করে সামান্য যা পেল, নিরাপত্তা হেফাজতে সুদানের রণাঙ্গন অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়া হল।

রসদ সংকটের বিষয়টি মিসরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে এমন খাদ্যসংকট কখনো দেখা যায়নি। তারা এই চিন্তায়ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, সুলতান আইউবী নিজে যদি রসদ চেয়ে বসেন, তা হলে কি জবাব দেবেন। মিসরে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, একথা সুলতান বিশ্বাস-ই করবেন না। এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হল। তাদের মধ্যে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সালীম আল-ইদরীসও রয়েছেন। সে সময়কার অপ্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, আল-ইদরীস সেই কমিটির প্রধান ছিলেন। অপর দু'জন ছিলেন তার থেকে মাত্র এক স্তর নিম্নপদের বে-সামরিক কর্মকর্তা।

রাতে কমিটির বৈঠক বসে। দু'সদস্য আল-ইদরীসকে বললেন, সুলতান আইউবী একত্রে দু'টি ময়দান খুলে মারাত্মক ভুল করেছেন। আর তকিউদ্দীন তো পরাজয়ের গ্লানি মাথায় না নিয়ে ফিরছেন না।

'ফিলিস্তীন মুসলমানদের ভূখণ্ড'– আল-ইসরীস বললেন–'ওখান থেকে খৃষ্টানদের বিতাড়িত করা আবশ্যক। মুসলমানরা ওখানে পশুর মত জীবন-

যাপন করছে। ওখানকার মুসলিম নারীদের ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই। মসজিদসমূহ আস্তাবলে পরিণত হয়েছে।'

'এ-সবই প্রচারণা'– বলল একজন– 'আপনি কি নিজ চোখে দেখেছেন যে, ফিলিস্তীনে খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর জুলুম করছে?'

'প্রচারণা নয়–আমি বাস্তব সত্য আপনাদের বলেছি'– আল-ইদরীস বললেন।

'আমাদের থেকে সত্য গোপন করা হচ্ছে'– অপরজন বলল– সালাহুদ্দীন আইউবী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশ করতে আমাদের ভয় করা উচিত নয়। দেশ দখলের মোহ আইউবীকে স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। আইউবী খান্দানকে তিনি শাহী খান্দানে পরিণত করতে চাইছেন। খৃষ্টান বাহিনী অপ্রতিরোধ্য ঝড়। তাদের মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই। খৃষ্টানরা যদি আমাদের দুশমন হত, তাহলে তারা ফিলিস্তীনের পরিবর্তে মিসর কব্জা করে নিত। তাদের এত সৈন্য আছে যে, এতদিন তারা আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পিষে ফেলতে পারত। তারা আমাদের নয়– সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন।'

'আপনার কথাগুলো আমার কাছে অসহ্য লাগছে'–আল-ইদরীস বললেন–' এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আসুন আমরা আসল কথা বলি।'

'কথাগুলো আমারও কাছে অসহনীয়'–একজন বলল– 'কিন্তু এক ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ পূরণের জন্য আমাদের গোটা জাতির স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত হবে না। আপনি উভয় ময়দানের জন্য রসদ সরবরাহের কথা বলছেন। কিন্তু রসদের অবস্থা তো দেখছেন যে, পাওয়া যাচ্ছে না। সুদানের ময়দান ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ভাবছি, এই ময়দানের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেব। তকিউদ্দীন পিছনে সরে আসবেন আর সাধারণ সৈন্যরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।'

'এ-ও তো হতে পারে যে, আমরা রসদ না পাঠালে তকিউদ্দীন অপারগতাবশত দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে'– আল-ইদরীস বললেন– 'এমনও হতে পারে যে, নিরুপায় হয়ে আমাদের সৈন্যরা দুশমনের হাতে আত্মসমর্পণ করবে।'

'আত্মসমর্পণ করুক, আমরা পরাজয়ের দায় সৈন্যদের উপর চাপিয়ে দেব।' লোকটি বলল।

'আপনি কেন এমনটি বলছেন?' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার চিন্তা খুবই স্পষ্ট'– লোকটি জবাব দেয়– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে জাতিকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জাতির নিরাপত্তার জিম্মাদার শুধু সেনাবাহিনী আর জাতির ভাগ্য সেনাবাহিনীর হাতে। আইউবী যদি সত্যিই শান্তিপ্রিয় মানুষ হতেন, তাহলে তিনি খৃষ্টান ও সুদানীদের

সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে শান্তির পথ বেছে নিতেন।'

আল-ইদরীস হঠাৎ শিউরে উঠেন। সুলতান আইউবী-বিরোধী ও খৃষ্টানদের পক্ষপাতিত্বমূলক কথাগুলো তার সহ্য হচ্ছে না। বৈঠকে তীব্র বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। কমিটির অপর দু'সদস্য আল-ইদরীসকে কথা-ই বলতে দিচ্ছে না। অবশেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আগামীকালই আমি আপনাদের মতামত ও প্রস্তাবাবলী নিয়ে ময়দানে আমীরে মেসের-এর নিকট পাঠিয়ে দেব।'

তিনি রাগের মাথায়-ই উঠে দাঁড়ান।

অপর দু'সদস্যের একজন সেখান থেকে চলে যায়। দ্বিতীয়জন—যার নাম আরসালান—আল ইদরীস-এর সঙ্গে থেকে যায়। আরসালান বলল, আপনি আসলে ব্যক্তিপূজারী ও আবেগপ্রবণ মানুষ। আমি সত্য কথা বললাম আর আপনি ক্ষেপে গেলেন। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ, 'আমার বিরুদ্ধে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে কিছু-ই লিখবেন না। এর অন্যথা হলে আপনার জন্য ভাল হবেনা।'

লোকটির কণ্ঠস্বর চ্যালেঞ্জ ও হুমকিমিশ্রিত। আল-ইদরীস তার প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। আরসালান বলল, 'সুযোগ দিলে আমি আপনার সঙ্গে নির্জনে আরো কিছু কথা বলতে চাই।'

'এখানেই বলুন।' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার ঘরে চলুন'—আরসালান বলল— 'খাবার আমার ঘরে খাবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এই সাক্ষাৎ হবে একেবারে গোপনীয়।'

আল-ইদরীস আরসালান-এর সঙ্গে তার ঘরে চলে যান। ভিতরে ঢোকার পর তার মনে হল, যেন তিনি কোন রাজমহলে এসেছেন। অথচ আরসালান তেমন উচ্চপদের কর্মকর্তাও নয়।

দু'জন একটি কক্ষে উপবিষ্ট। এমন সময়ে এক অতিশয় রূপসী যুবতী আকর্ষণীয় একটি সোরাহী ও রূপার গোলাকার একটি থালায় করে রূপার দু'টি গ্লাস হাতে কক্ষে প্রবেশ করে এবং পাত্রগুলো তাদের সম্মুখে রেখে দেয়। আল-ইদরীস ঘ্রাণ থেকে-ই বুঝে ফেললেন, পাত্রের পদার্থগুলো মদ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আরসালান, 'তুমি মুসলমান হয়ে মদপান করছ?'

আরসালান মুচকি হেসে বলল, 'এক চুমুক পান করুন, তাহলে আপনিও সেই সত্যকে বুঝতে পারবেন, যা আমি আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছি।'

দু'জন সুদানী ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের হাতে চকমকে তশতরীতে রকমারী খাবার। আল-ইদরীস বিস্ময়ভরা চোখে আরসালান-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আরসালান বলল, 'অবাক্ হবেন না মোহতারাম ইদরীস! এই শান-

শওকত আপনিও লাভ করতে পারেন। আমিও আপনার ন্যায় একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। কিন্তু আজ দেখুন কেমন রূপসী দু'টি যুবতী আমার ঘরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। আপনি দামেস্ক ও বাগদাদের আমীর-উজীরদের ঘরে গিয়ে দেখুন, তারাও এরূপ রূপসী যুবতী মেয়েদের দিয়ে হেরেম পূর্ণ করেছে। দেখবেন, ওদের হেরেমে মদের বন্যা বইছে।'

'এই রূপসী মেয়ে, এই ঐশ্বর্য, এই মদ খৃস্টানদের গোলামীর আশির্বাদ'–আল-ইদরীস বললেন–'নারী আর মদ সালতানাতে ইসলামিয়ারকে ফোক্‌লা করে দিল।'

'আপনি দেখছি, সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাষায় কথা বলছেন'– আরসালান বলল–'এ আপনার দুর্ভাগ্য।'

'তুমি কী বলতে চাও?'– আল-ইদরীস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন–'আমার মনে হচ্ছে তুমি ক্রুসেডারদের জালে আটকা পড়েছ।'

'আমি সোনবাহিনীর গোলামে পরিণত হতে চাই না'–আরসালান বলল–'আমি সেনাবাহিনীকে আমার গোলাম বানাতে চাই। তার একমাত্র পন্থা হল, সুদানে তকিউদ্দীনকে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিন। বিশেষ সাহায্য আসছে বলে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে তাকে যুদ্ধে জড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে সে সুদানীদের হাতে অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তকিউদ্দীন সুদানীদের হাতে মারা পড়বে এবং তার বাহিনী চিরদিনের জন্য ওখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা পরাজয়ের দায়ভার সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়ে জাতির সামনে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করব। তারপর জাতি সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকেও ঘৃণা করতে শুরু করবে। আপনি চেষ্টা করুন, এ পন্থা অবলম্বন করলে আপনি ঠকবেন না। আপনি এর এত প্রতিদান পাবেন, আপনি যার কল্পনা করতেও পারবেন না।'

'আমি তোমার মতলব বুঝে ফেলেছি'– 'আল-ইদরীস বললেন–'তুমি আমাকে দিয়ে ঈমান বিক্রি করাতে চাও। আমার দ্বারা কক্ষনো তা হবে না।'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর আল-ইদরীস বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এত ভয়ংকর কথা এমন বড় গলায় কিভাবে বলছ? আমি যে তোমাকে গ্রেফতার করে গাদ্দারীর শাস্তি দিতে পারি, সে কি তুমি ভুলে গেছ?'

'আহা, আমি কি বলতে পারবনা যে, আপনি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন?'–আরসালান বলল–'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার বিরুদ্ধে একটি শব্দও শুনবেন না।'

বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যান আল-ইদরীস। দেশের এমন পদস্থ একজন

কর্মকর্তা কত বড় এক শয়তানে পরিণত হয়ে গেল! লোকটি কেমন অহংকারের সাথে কথা বলছে!!

আল-ইদরীস নিজে একজন পরিপক্ক ঈমানদার মানুষ। তার বুঝেই আসছিল না যে, যারা নীলামে ঈমান বিক্রি করে ফিরে, তারা লাঞ্ছনার কত নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে!

আল-ইদরীস পদমর্যাদায় আরসালান-এর সিনিয়র। এই মুহূর্তে আরসালানকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আল-ইদরীস-এর কাছে তার একটিই পন্থা—ক্ষমতা প্রয়োগ করা। তিনি আরসালানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও এবং কী করছ, তা আমার আর বুঝতে বাকী নেই। তুমি যে অপরাধে লিপ্ত হয়েছ, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমাকে এতটুকু খাতির করতে পারি যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি তুমি অবস্থান পরিবর্তন করে পথে ফিরে আস এবং দুশমনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান কর যে, তুমি বাগদাদের খেলাফত ও স্বজাতির অফাদার, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তবে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলাম। এ দায়িত্ব আপাতত আমি নিজেই পালন করব। আমি তোমাকে সাতদিনের সময় দিলাম। সাতদিন অনেক দীর্ঘ সময়। এ-মুহূর্ত থেকে এ-বাড়িতে আমি তোমাকে নজরবন্দী করলাম। এমন যেন না হয় যে, অষ্টম দিনে এখান থেকে বের করে তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হয়।

আল-ইদরীস বসা থেকে উঠে দাঁড়ান । তিনি দেখলেন, আরসালান মিটিমিটি হাসছে।

আরসালান বলল, 'শুনুন মোহতারাম ইদরীস! আপনার দু'টি পুত্র আছে এবং দু'জনই যুবক।

'হ্যাঁ,—আল ইদরীস বললেন—'তাতে কী হয়েছে।'

'না, কিছু-ই নয়'— আরসালান বলল—'আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি যে, আপনার দু'টি যুবক পুত্রসন্তান রয়েছে। আর এরা ছাড়া আপনার আর কোন সন্তান নেই।'

আরসালান-এর ইংগিতটা বুঝতে পারলেন না আল-ইদরীস। তিনি বললেন, 'মদ তোমার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে।'

বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান।

আরসালানের ঘর থেকে বের হয়ে আল-ইদরীস সোজা আলী বিন সুফিয়ানের কাছে চলে যান এবং তাঁকে আরসালান-এর ঘটনা শোনান। শুনে

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আরসালান আমার সন্দেহভাজনদের একজন। তবে এ-যাবত আমি তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাইনি। তথাপি লোকটাকে আমি গোয়েন্দার নজরে রেখেছি।'

আল-ইদরীস শুধু অস্থির-ই নন–বিস্মিতও যে, আরসালান এত বীরত্বের সাথে গাদ্দারীতে লিপ্ত হল কি করে! আলী বিন সুফিয়ান তাকে জানালেন, 'সে একা নয়–গাদ্দারী চলছে সুসংগঠিতভাবে। এর জীবাণু সেনাবাহিনীতেও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ, সুদান রণাঙ্গনের জন্য রসদ প্রেরণ করা। আল-ইদরীস আলী বিন সুফিয়ানকে জানালেন, আমি আরসালানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি, রসদের এন্তেজাম এখন আমার নিজের করতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান তাকে জানালেন, 'দেশের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মফস্বল থেকে তরি-তরকারী, গরু, মহিষ, ভেড়া-বকরী ইত্যাদি সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাজারে খাদ্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আমি আমার গুপ্তচর ও তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি, তারা যেন রাতে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে এবং কোথাও খাদ্যসম্ভার চোখে পড়লে তুলে নিয়ে আসে। দীর্ঘ আলোচনার পর দু'জনে রসদ সংগ্রহের পন্থা ঠিক করে ফেলেন।

আল-ইদরীস জাতীয় কর্তব্য পালনে এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েন যে, তার মাথা থেকে আরসালান-এর এই ইংগিত ছুটে-ই যায় যে, 'তোমার দু'টি যুবক পুত্র আছে এবং ওরাই তোমার সাকুল্য সন্তান।' পুত্রদের চরিত্রের ব্যাপারে আল-ইদরীস-এর পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু মানুষের যৌবন অন্ধ হয়ে থাকে। সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে কায়রোতে অপকর্মের এমন এক ঢেউ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা যুব সমাজের চিন্তা-চেতনায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করে। দু'-তিন বছর আগেও এমন এক তুফান উঠেছিল; সুলতান আইউবী, যা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার এই ঢেউ জেগেছে মাটির নীচ থেকে এবং সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। চরিত্রহীনতার এই ঢেউ জেগেছে নানারকম খেলাধুলার নামে।

এক ব্যক্তি তাঁবু খাটিয়ে ও শামিয়ানা ঝুলিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেছে। এই খেলা-তামাশার মধ্যে বাহ্যত আপত্তিকর কিছু ছিল না। কিন্তু শামিয়ানার ভিতরে স্থাপন করা ছোট ছোট তাঁবুতে আলাদা আলাদাভাবে যুবকদেরকে ইংগিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের থেকে টাকা নিয়ে কাপড়ের উপর হাতের তৈরী বিভিন্ন প্রকার চিত্র প্রদর্শন করা হয়–অশ্লীল-উলঙ্গ নারীর ছবি। ছবি দেখানোর দায়িত্ব পালন করত যুবতী মেয়েরা,

যাদের মুচকি হাসি ও অঙ্গভঙ্গিতে থাকত পাপের আবেদন।

সেখানে-ই এক পর্যায়ে যুবকদেরকে হাশীশ খাওয়ানো হত। এই লজ্জাকর ও ভয়াবহ অভিযান পরিচালিত হত মাটির উপরে। কিন্তু কেউ কুচক্রীদের ধরতে পারতনা। তার কারণ, যে-ই ছবি দেখে কিংবা হাশীশের স্বাদ উপভোগ করে আসত, সে-ই নিজের এই অপরাধপ্রবণতার কথা লুকিয়ে রাখত। সেই পাপে এমন-ই স্বাদ ছিল যে, যে একবার যেত, সে বারবার যেতে বাধ্য হত। তারা বিষয়টা বাইরে এ জন্যেও প্রকাশ করত না যে, সরকার জানতে পারলে তারা এই আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই অপরাধের শিকার হচ্ছিল সমাজের যুবক শ্রেণী ও সেনাসদস্যরা। তাদের জন্য পর্দার অন্তরালে বেশ্যালয়ও খুলে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার এই অভিযান কিরূপ সফল ছিল? তার জবাব কার্ক দুর্গে খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের লড়াকু জার্মান বংশোদ্ভূত হরমুন তার সম্রাটদের দিয়েছিলেন এভাবে–

'এসব ছবি অংকন করেছে স্পেনের চিত্রকররা। এ এমন এক অশ্লীল চিত্র, যা পাথরের তৈরী পুরুষদেরকেও মাটির মূর্তিতে পরিণত করে দেয়।'

হরমুন একটি নারী-পুরুষের যুগল অশ্লীল চিত্র উপস্থিত সম্রাটদের দেখান। এটি বৃহৎ আকারের একটি ছবি, যা তুলির আঁচড়ে আকর্ষণীয় রং দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। খৃস্টান সম্রাটগণ ছবিটি দেখে পরস্পর অশ্লীল ঠাট্টা করতে শুরু করেন। হরমুন বললেন–

'আমি এমন অসংখ্য ছবি তৈরী করিয়ে মিসরের বড় বড় শহরে সে-সবের গোপন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি। ওখান থেকে আমাদের সফলতার সংবাদ আসছে। আমি কায়রোর যুবক শ্রেণীর মধ্যে পাশবিকতা উস্কে দিয়েছি। পাশবিকতা এমন এক শক্তিশালী চেতনা, যা উত্তেজিত হয়ে উঠলে সকল সামরিক চেতনাকে–যার মধ্যে জাতীয় চেতনা অন্যতম–ধ্বংস করে দেয়। আমার তৈরী করান চিত্রসমূহ মিসরে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদেরকে মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে অকর্মণ্য করে দিতে শুরু করে দিয়েছে। এসব চিত্রের স্বাদ নেশার আবেদনও সৃষ্টি করে। আমি তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি অনেকগুলো রূপসী যুবতী মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়রো ও অন্যান্য শহর-গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছি। ওরা উঁইপোকার ন্যায় সালাহুদ্দীন আইউবীর জাতি ও সেনাবাহিনীকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কায়রোতে আমার যে কয়টি মেয়ে ধরা পড়েছিল, তার কারণ ভিন্ন। এবার আমি যে নতুন পন্থা অবলম্বন করেছি, তা সফল হতে চলেছে। এখন ওখানকার মুসলমানরা নিজেরাই আমার মিশনের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তাতে শক্তি জোগাবে। তারা এই মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অল্প ক'দিন পর-ই আমি তাদের মন-

মানসিকতায় তাদের-ই স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিষ ঢুকাতে শুরু করব।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী অত্যন্ত সতর্ক মানুষ'– উপস্থিত লোকদের একজন বলল–'তিনি যখন-ই মিসরে ফিরে আসবেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব অভিযান শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবেন।'

'যদি তিনি মিসর পৌঁছাতে পারেন, তবে-ই তো ......'–হরমুন বললেন– 'এই প্রশ্নের জবাব আপনি-ই দিতে পারেন যে, আপনি তার অবরোধ সফল হতে দিবেন কিনা। তিনি রেমণ্ডের বাহিনীকে দুর্গের বাইরে ঘিরে ফেলেছেন এবং দুর্গ তার হাতে অবরুদ্ধ। কিন্তু এই ঘেরাও ও অবরোধ তার-ই জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনি এখানে চূড়ান্ত লড়াই লড়বেন না। আইউবীকে আমাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখতে দিন, যাতে তিনি এখানে-ই আবদ্ধ থাকেন এবং মিসর যেতে না পারেন। সুদানে আমাদের কমাণ্ডারগণ তকিউদ্দীনের বাহিনীকে অত্যন্ত সফলভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। তিনি এখন না পারছেন লড়াই করতে, না পারছেন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে। মিসরের সব বাজারের এবং ক্ষেত-খামারের সমুদয় খাদ্যসামগ্রী আমি উধাও করে ফেলেছি। আপনার প্রদত্ত অর্থ আপনাকে পূর্ণ ফল দিচ্ছে। আইউবীর এক অফাদার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আরসালান মূলত আপনার-ই অফাদার। লোকটি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তার আরো কয়েকজন সহকর্মীও আমাদের সঙ্গে আছে।'

'আরসালানকে বেতন-ভাতা কত দিচ্ছ?' –ফিলিপ আগস্টান জিজ্ঞেস করলেন।

'যতটুকু একজন মুসলিম কর্মকর্তার মস্তিস্ক নষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজন'– হরমুন জবাব দেন– 'নারী, মদ, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার নেশা যে কোন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারে। আমি তা-ই ক্রয় করে নিয়েছি। আমি আপনাকে এ সুসংবাদও দিতে পারি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী যদি এই মুহূর্তে মিসর যান, তাহলে তিনি ওখানকার জগত ভিন্ন কিছু দেখতে পাবেন। তিনি যে যুবসমাজের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করেন, তারা মুসলমান হয়েও ইসলামের কোন কাজে আসবে না। তাদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের রশি থাকবে আমাদের হাতে। তার এই প্রজন্ম যৌন উচ্ছৃঙ্খলরূপে গড়ে উঠেছে। একই দশা তার সেই বাহিনীরও হবে, যাদেরকে তিনি মিসর রেখে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমার ঘাতক কর্মীরা এমন অস্থিরতা ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে যে কোন মুহূর্তে তারা বিদ্রোহ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। আজ আমি পূর্ণ আস্থার সাথে এই দাবি করতে পারি যে, আমি আপনারও আগে আমার যুদ্ধের ইতি টানতে সক্ষম হব। প্রতিপক্ষের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে দিতে পারলে আর সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হবে না।'

হরমুনের এই উদ্দীপনামূলক রিপোর্ট শুনে খৃস্টান সম্রাটগণ বেজায় আনন্দিত হন। ফিলিপ অগাস্টাস সেই একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, যা তিনি আগেও কয়েকবার বলেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের লড়াই সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে নয়–ইসলামের সঙ্গে। একদিন আইউবীর মুত্যু হবে, আমরাও মরে যাব। কিন্তু আমাদের চেতনা ও প্রত্যয় জীবিত থাকতে হবে, যাতে এক সময় ইসলামেরও মৃত্যু ঘটে এবং দুনিয়ার শাসন-ক্ষমতা ক্রুশের হাতে চলে আসে। তার জন্য আমাদের এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র চালু করতে হবে, যদ্বারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকতার উপর জোরদার হামলা করা যায়। আমি হরমুনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, সে এমন যুদ্ধক্ষেত্র শুধু চালু-ই করেনি, বরং অভিযানে এক পর্যায়ে সফলতাও অর্জন করেছে।'

❁ ❁ ❁

সালীম আল-ইদরীস-এর দু'টি যুবক পুত্র আছে। একজনের বয়স সতের বছর। অপরজনের একুশ। তারাও কায়রোতে খৃস্টানদের পাতা চরিত্র-বিধ্বংসী ফাঁদে পা দিয়েছিল কিনা জানা না গেলেও এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বড় পুত্রের গোপন সম্পর্ক ছিল। মেয়েটি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং বে-পর্দায় ঘোরাফেরা করত। মেয়েটি কোন এক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ খান্দানের সন্তান। দু'জনের মিলন হত গোপনে। যেদিন আরসালান আল-ইদরীসকে বলেছিল যে, আপনার দু'টি যুবক পুত্র আছে, তার পরদিন মেয়েটি বড়পুত্রকে বলল, অন্য এক যুবক আমাকে খুব বিরক্ত করছে। আমি যেদিকে যাই, যুবকটি আমাকে অনুসরণ করছে এবং আমাকে অপহরণ করার হুমকি দিচ্ছে। বড় পুত্র মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, যুবকটি কে? কিন্তু মেয়ে তা বলেনি। বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে যায়। মেয়েটি আমতা আমতা করে বলল, বেশী সমস্যা হলে তোমাকে জানাব।

সেদিন সন্ধ্যায়-ই মেয়েটি তার কাছে এসে বলল, ঐ যুবকটি আমাকে সীমাহীন উত্যক্ত করতে শুরু করেছে। সে তোমার সম্পর্কে বলেছে, তোমাকে নাকি সে এমনভাবে খুন করবে যে, কেউ টের-ই পাবে না। কাজেই এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখ, বলা যায় না কখন কী ঘটে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি অপর যুবক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকেও একইভাবে উত্তেজিত করে এবং বলে, এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখ, বলা যায় না কখন কী ঘটে যায়।

অপর যুবক হল আল-ইদরীস-এর ছোট পুত্র। অর্থাৎ-মেয়েটির দু'দিকে দুই সহোদর। কিন্তু তাদের কেউ-ই জানেনা যে, মেয়েটি যে যুবক সম্পর্কে উত্তেজনার রিপোর্ট দিচ্ছে, সে তার-ই ভাই। এ-ও জানত না যে, তারা দু'ভাই

এক-ই মেয়ের জালে আটকা পড়েছে। দু'ভাই-ই খঞ্জর নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। মেয়েটিও উভয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করতে থাকে।

মাত্র পাঁচদিনে মেয়েটি দু'ভাইকে প্রথমে পশুতে, পরে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে। পঞ্চমদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি বড় ভাইকে শহরের খানিক দূরে এক অন্ধকার স্থানে মিলিত হতে বলে। ছোট ভাইকেও একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত থাকতে বলে। মেয়েটি উভয়কে এ কথাও বলে যে, যে যুবকটি আমাকে উত্যক্ত করছে, সে বলে গেছে, আজ সন্ধ্যায় তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার প্রেমনিবেদনকারীকে তোমার-ই চোখের সামনে হত্যা করব। মেয়েটি জানায়, আমি তাকে বলেছি, আচ্ছা, তুমি যদি এতই বীরপুরুষ হয়ে থাক, তাহলে অমুক সময় অমুক জায়গায় এসে পড়। তুমি যদি ওকে খুন করতে পার, তাহলে আমি একান্তভাবে তোমার-ই হয়ে যাব।

দু'ভাই প্রাণঘাতী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় বড় ভাই খঞ্জর হাতে মেয়েটির নির্দেশিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়েটি এতই দক্ষতার পরিচয় দেয় যে, জায়গাটা নির্ধারণ করেছে অন্ধকার দেখে। এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ রেখেছে, যেন দু'ভাই তার পৌঁছানোর আগেই একত্রিত হয়ে একে অপরকে চিনে না ফেলে।

মেয়েটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বড় ভাইকে উপস্থিত দেখতে পায়। সে তাকে জানায়, ঐ যুবকটি আমার পিছনে পিছনে আসছে। বড় ভাই খঞ্জর প্রস্তুত করে রাখে। খানিক পরেই ছোট ভাই এসে পৌঁছে। মেয়েটি বড় ভাইকে বলে, ও এসে পড়েছে; তবে আমি চাই না যে, তোমরা খুনাখুনিতে লিপ্ত হও। আমি গিয়ে ওকে বলি, তুমি চলে যাও। বলেই মেয়েটি ছোট ভাইয়ের নিকট ছুটে যায় এবং বলে, তোমার দুশমন পূর্ব থেকেই এখানে এসে উপস্থিত আছে। তার হাতে খঞ্জর। ছোট ভাইয়ের বিবেকের উপর যৌবনের তাজা খুন চেপে বসে আছে। ছেলেটি খঞ্জর হাতে নেয় এবং অন্ধকারের মধ্যে-ই আপন বড় ভাইয়ের প্রতি ধেয়ে আসে। বড় ভাই আক্রমণোদ্যত প্রতিপক্ষ যুবককে ছুটে আসতে দেখে সে-ও খঞ্জর হাতে দ্রুত এগিয়ে যায়। একজন অপরজনের উপর প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে বসে। অন্ধকারে দু'ভাইয়ের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এক ভাই অপর ভাইকে রক্তাক্ত করে ফেলে। মেয়েটি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উভয়কে উত্তেজিত করতে থাকে।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা কর্মীরা রাতে টহল দিচ্ছে। হঠাৎ এক অশ্বারোহী গুপ্তচর ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। দেখে মেয়েটি পালাতে উদ্যত হয়। আরোহী ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে। তাকে সঙ্গে করে আবার ঘটনাস্থলে

ফিরে যায়। দু'ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। মেয়েটি এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পর্কহীনতার প্রমাণ দিতে জোর চেষ্টা করে। কিন্তু আরোহী তাকে ছাড়ল না। মেয়েটি নানা রকম প্রলোভন দেখালেও আরোহী সেসব প্রত্যাখ্যান করে নীতির উপর অটল থাকে। আরোহী হাঁক দিয়ে তার সহকর্মীদের ডেকে আনে। ততক্ষণে দু'ভাই মারা গেছে।

মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। লাশ দু'টোও তুলে নেয়া হল। আলো জ্বালিয়ে লাশ দু'টি দেখা হল। আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রের লাশ। আল-ইদরীসকে সংবাদ দেয়া হল। দু'যুবক পুত্রের দু'টি লাশ একত্রে দেখার পর পিতার মানসিক অবস্থা কেমন হল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মেয়েটি এলোমেলো কথা বলে। 'তুমি কার মেয়ে, কোথায় থাক'—এ প্রশ্নের জবাব দিতে সে অপারগতা প্রকাশ করে। আল-ইদরীস ভীষণ বিমর্ষ-বিপর্যস্ত। তিনি ক্ষুব্ধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়েটাকে পিঞ্জিরায় আটকে রাখ আলী! এভাবে ওর মুখ থেকে কথা বের করা যাবে না।'

'আমার বলার আছে-ইবা কী?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলল। তারপর বড় ভাইয়ের লাশের প্রতি ইংগিত করে বলল, 'ইনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দেই। মধ্যখান থেকে ইনি (ছোট ভাইয়ের লাশের প্রতি ইশারা করে) এসে পড়লেন। আমার দখল নিয়ে দু'জন খঞ্জর হাতে পরস্পরে ঝাপিয়ে পড়লেন। আমি ভয়ে পালাতে উদ্যত হই। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে আমাকে ধরে নিয়ে আসেন। আমি পিতার নাম বলতে এজন্য ইতস্তত করছি যে, তাতে তার অপমান হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান বিচক্ষণ, ধীশক্তিসম্পন্ন ও উপস্থিত বুদ্ধির মানুষ। তার মনে পড়ে যায়, আরসালান ও আল-ইদরীস-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল। আরসালান তার সন্দেহভাজনদের একজন। তার ঘরে কী সব হচ্ছে, তাও তিনি জানেন। তিনি আল-ইদরীসকে ইশারা করে বললেন, মেয়েটি যে-ই হোক, ঘাতক নয়। একটি মেয়ে দু'টি যুবককে খুন করতে পারেনা। মেয়েটি যা বলেছে, সত্যই বলেছে। আমি তার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নিতে পারব না। বলেই তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'যাও, তুমি মুক্ত। আগামীতে কোন বেগানা পুরুষের সঙ্গে এতদূর যেও না; অন্যথায় কখন কার হাতে খুন হও বলা যায় না।'

ছাড়া পেয়ে মেয়েটি দ্রুতবেগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গুপ্তচরকে বললেন, 'তোমরা একজন মেয়েটি কোন্ পথে যায় লক্ষ্য রেখে অরেক পথে আরসালান-এর বাড়ির সদর দরজার সামান্য দূরে চুপচাপ বসে থাক। অপরজন অতি সাবধানে মেয়েটির অনুসরণ

করে দেখবে, ও কোথায় যায় এবং যেখানে-ই গিয়ে পৌছুক, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দিবে।'

দু'জন রওনা হয়ে যায়। মেয়েটি দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একজন তাকে অনুসরণ করছে। আলী বিন সুফিয়ানের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হল। মেয়েটি সোজা আরসালানের ঘরে চলে যায়। আলীর নিয়োজিত লোক এসে সংবাদ দেয়। আল-ইদরীস যখন জানতে পারলেন যে, মেয়েটির যোগাযোগ আরসালানের ঘরের সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ তার পিছনের ঘটনা মনে পড়ে যায়। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, ' আরসালান আমাকে বলেছিল, 'তোমার দু'টি যুবক পুত্র আছে'। কিন্তু তখন আমি সেই ইংগিত বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, সেই ইংগিত আর এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার স্পষ্ট ধারণা, এই ঘটনা আরসালান-ই ঘটিয়েছে। আমার দু'পুত্রকে সে-ই অভিনব এক পন্থায় একজনকে অপরজন দ্বারা খুন করিয়েছে।'

আল-ইদরীস পুলিশ প্রধানকে সংবাদ দেন। পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলবীস এসে পৌছান। আলী বিন সুফিয়ানেরও ক্ষমতা আছে। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, আরসালানের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে নজরবন্দী করা হোক।

'এবার আমি সালীম আল-ইদরীসকে বলব, আমি কেন এত সাহসিকতার সাথে কথা বলি'– মেয়েটির সাফল্যের কাহিনী শুনে আরসালান বলল– 'এবার আমি তাকে জানিয়ে দেব, আমি কী করতে পারি।' আরসালান মেয়েটিকে মদপান করতে দেয় এবং দু'জনে বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠে।

আরসালান-এর উৎসব এখনো শেষ হয়নি। এমন সময় বলা-কওয়া ছাড়াই কে যেন তার ঘরে ঢুকে পড়ে। লোকটি আল-ইদরীস। তিনি আরসালান ও একটি মেয়েকে নেশাগ্রস্থ ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পান। মেয়েটিকে তিনি চিনে ফেলেন। আরসালান নেশার ঘোরে-ই বলল, ' নিজের পুত্রদেরকে খুন করিয়ে তুমি নিজে আমার হাতে খুন হতে এসেছ? ....। দারোয়ান! লোকটি আমার অনুমতি ছাড়া আমার জান্নাতে ঢুকল কেন?'

'ঢুকেছি তোকে জাহান্নামে পাঠাতে'– আল-ইদরীস বললেন– 'আমি আমার পুত্রদের প্রতিশোধ নিতে আসিনি– 'এসেছি তোমাকে গাদ্দারীর পরিণতি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে।'

ইতিমধ্যে নগর প্রধান ভিতরে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে গিয়াস বিলবীস ও আলী বিন সুফিয়ান। তারা মেয়েটিকে গ্রেফতার করে ফেললেন। আরসালান-এর সব চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকদেরকে বের করে দিয়ে প্রাসাদোপম ভবনটির ভিতরে-বাইরে প্রহরা বসিয়ে দেয়া হল। অনুসন্ধানে ঘরের মধ্যে প্রশস্ত এক আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষ পাওয়া গেল। সেখান থেকে উদ্ধার করা হল বিপুল

পরিমাণ তীর-কামান ও বর্শা। পাওয়া গেল এক গাদা খঞ্জর ও বিস্ফোরক। একটি বাক্স খুলে পাওয়া গেল হাশীশ ও বিষ। অপর এক কক্ষ থেকে উদ্ধার হল, অনেকগুলো সোনার ইট ও স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি বেশ ক'টি থলে। আরসালান তার পুরাতন দু'স্ত্রী ও তাদের সন্তানদেরকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন ঘরে পাওয়া গেল তিনটি ষোড়শী কন্যা। তাদের একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসী। তিনজনই অমুসলিম। রাতারাতি চাকর-বাকরদের তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তাদের তিনজনই খৃস্টানদের গুপ্তচর।

'তুমি নিজেই বলে দাও তোমার মিশন কি?'– নগর প্রধান আরসালানকে বললেন– 'এই বিত্ত-বৈভব ও অস্ত্রের ডিপো তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট।'

'তাহলে মৃত্যুদণ্ড-ই দিয়ে দিন'– নেশার ঘোরে বলল আরসালান– 'জীবন যখন দিতে-ই হবে, মুখ খুলে লাভ কী?'

'জীবনের শেষ মুহূর্তে তুমি একটি নেক কাজ করে যাও; ঈমান, ইসলাম ও দেশের শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য দাও'– নগর প্রধান বললেন– 'আমি আশা করি, এর উছিলায় আল্লাহ তোমার এতবড় অপরাধও ক্ষমা করে দেবেন।'

'কিন্তু তোমরা তো ক্ষমা করবে না।' আরসালান বলল।

'সুলতান আইউবী এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আপনার জীবনে বেঁচে যাওয়ার পথ খুলতে পারে; এখানে কিরূপ নাশকতা চলছে বলে দিন এবং কিছু লোককে ধরিয়ে দিন।'

আরসালান কক্ষে পায়চারী করছে। অন্যরা এদিক-ওদিক উপবিষ্ট। আল-ইদরীস-এর কোমরে খঞ্জর সদৃশ একটি তরবারী বাঁধা। আরসালান নিশ্চুপ পায়চারী করতে করতে তার কাছে চলে যায় এবং হঠাৎ কোমর থেকে তরবারীটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে ও পেটের মধ্যখানে স্থাপন করে। উপস্থিত লোকেরা তার থেকে তরবারীটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তার আগেই আরসালান হাতলটা ধরে পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর আগাটা নিজের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। লোকেরা পেট থেকে তরবারীটা টেনে বের করে আনার চেষ্টা করলে আরসালান বলল, 'ওটা ওখানেই থাকুক, তোমরা আমার দু'তিনটি কথা শুনে রাখ। আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তরবারীটা বের করে নিও। আমি নিজেই নিজের শাস্তি দিয়েছি। আমি জীবিত অবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে উপস্থিত হতে চাইনি। কেননা, তিনি আমাকে তার অফাদার বন্ধু বলে বিশ্বাস করতেন। আমি তোমাদের কারুর কাছে কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। তরবারী তার কাজ করে ফেলেছে। তোমরা সাবধান হও, মিসর ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। মিসরে যে ফৌজ আছে, তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। খাদ্যের কৃত্রিম সংকট আমি-ই

সৃষ্টি করেছিলাম। সৈন্যরা ঠিকমত খাবার পেত না। খৃস্টান নাশকতাকারীরা ফৌজের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, দেশের গরু, ভেড়া-বকরী-দুম্বা, তরী-তরকারী, খাদ্যসামগ্রী সব বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলে যাচ্ছে আর সেখানকার সৈনিকেরা গনীমতের মালামাল দিয়ে বিলাসিতা করছে। আমার দলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ছিল। তবে আমি তাদের কারো নাম বলব না। ফাতেমী ও ফেদায়ীরা ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তোমরা বিদ্রোহ প্রতিহত করতে পারবে না। নতুন সৈন্য নাও, পরিস্থিতি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের...।' আরসালান শেষ বাক্যটি আর পূর্ণ করতে পারল না। তার আগেই তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল।

আরসালানের ঘর থেকে যে দু'টি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তারা নিজেদের সম্পর্কে জানায় যে, আমাদেরকে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও পুরুষদেরকে ফাঁদে আটকিয়ে ব্যবহার করার জন্য পাঠান হয়েছিল। তারা জানায়, আরসালান-এর ঘরে প্রতি রাতে বৈঠক হত, যাতে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের অনেক অফিসার আসা-যাওয়া করতেন। তাদের গোপন সাক্ষাৎ ও বৈঠক এই মেয়েদের অনুপস্থিতিতে হত। মেয়েরা স্বীকারোক্তি দেয় যে, মিসরে বিদ্রোহের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মেয়েটি আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রকে একে অপরের দ্বারা খুন করিয়েছিল, সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করে। মেয়েটি জানায়, সে আল-ইদরীস-এর বড় পুত্রকে আগেই ভালবাসার জালে আটকিয়ে ফেলেছিল। আরসালান তাকে স্বয়ং আল-ইদরীস-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আরসালান পরিকল্পনা পাল্টে দেয় এবং মেয়েটিকে বলে তুমি আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রকে একজন দ্বারা অপরজনকে খুন করাও।

মাত্র এক রাতের অভিযানের পর প্রায় আড়াইশ' উট কেন্দ্রীয় দফতরের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। উটগুলো খাদ্য-সামগ্রীতে বোঝাই। এই উটগুলো তিন-চারটি পয়েন্ট থেকে ধরে আনা হয়েছে। তরী-তরকারী ইত্যাদি যাতে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি তাদের প্রথম সাফল্য। ধরে আনা উট কাফেলার সঙ্গে যেসব মানুষ ছিল, তারা শহরের কয়েকজন ব্যাপরীর নাম বলে, যারা দেশের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে সীমান্তের বাইরে চালান করার কাজে জড়িত। মধ্যরাতের পর তারা এসব পণ্য বিদেশের অপরিচিত ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি করত। ধৃত লোকগুলো পল্লী এলাকার ও এমন কয়েকটি জায়গার নাম বলে, যেখানে অপরিচিত ব্যবসায়ীরা অবস্থান করত এবং পণ্যদ্রব্য কিনে জমা করে নিয়ে যেত। উষ্ট্রচালকরা সীমান্তবর্তী এমন একটি অঞ্চলের কথা জানায়, যেখান

থেকে এসব কাফেলা সুদান ঢুকে পড়ত। ওখানে একটি সীমান্তপ্রহরী ইউনিট ছিল। তদন্তে জানা গেল, তার কমাণ্ডার নিয়মিত দুশমনের কাছ থেকে ঘুষ নিত এবং কাফেলার সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ করে দিত। আরো জানা গেল যে, এর সবই হচ্ছিল আরসালান-এর নেতৃত্বে।

❁ ❁ ❁

আল-ইদরীস ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাগণ আরসালান-এর গাদ্দারী, আল-ইদরীস-এর শত্রুদের মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠকে বসেন। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস অভিমত ব্যক্ত করেন; পরিস্থিতি এত-ই নাজুক রূপ লাভ করেছে যে, এখন তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা প্রস্তাব করেন, মিসরে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার এবং ফাতেমী কিংবা ফেদায়ীদের হাতে উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তিত্বের খুন হওয়ার আগেই সুলতান আইউবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত করা হোক এবং তাঁকে পরামর্শ দেয়া হোক, কার্ক অবরোধ তাঁর নায়েবদের হাতে সোপর্দ করে তিনি কায়রো চলে আসুন। একজন দূত আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল বটে; কিন্তু তাকে বিস্তারিত জানান হয়নি। এখন পরিস্থিতি আরো কঠিন আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, আলী বিন সুফিয়ান ময়দানে গিয়ে সুলতান আইউবীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

কার্ক অবরোধের বয়স দু'মাস হয়ে গেল। কিন্তু এখনো সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খৃস্টানরা অস্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাদের একটি ব্যবস্থাপনা এই যে, তারা শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-পানীয়'র আয়োজন করে রেখেছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এক গুপ্তচর ভিতর থেকে তীরের সঙ্গে বার্তা বেঁধে বাইরে নিক্ষেপ করে। যাতে লিখা ছিল–'ভিতরে খাদ্য-পানীয়'র কোন অভাব নেই। মুসলমান অধিবাসীর উপর এমন কঠোর পাবন্দী আরোপ করে রাখা হয়েছে যে, তাদের ঘরের দেয়ালগুলোও তাদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করছে। ফলে ভিতরে নাশকতামূলক তৎপরতা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যথায় খৃস্টানদের এসব খাদ্যসম্ভার ধ্বংস করে দেয়া যেত।'

শহরে সুলতান আইউবীর গুপ্তচরেরও অভাব ছিল না। তারা মাঝে-মধ্যে রাতের বেলা তীরের সঙ্গে পয়গাম বেঁধে সময়-সুযোগমত বাইরে ছুঁড়ে মারত। সেনাদের প্রতি নির্দেশ ছিল এরূপ তীর পেলে যেন তারা কমাণ্ডারদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। খৃস্টানরা অবরোধ ভাঙ্গার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে। তারা সুলতান আইউবীর শক্তি ক্ষয় করার কৌশল অবলম্বন করেছে। সুলতান তাদের কৌশল

ধরে ফেলেছেন। তাই জবাবে তিনিও পন্থা পরিবর্তন করেন।

খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে থেকে আইউবীর উপর আক্রমণ করার যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, সুলতান তা ব্যর্থ করে দেন। এই হামলার জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অতি কৌশলে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন।

খৃস্টানদের এই বাহিনীটি সুলতান আইউবীর বেষ্টনীতে আটকা পড়েছে দেড় মাস হয়ে গেছে। বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তারা চারদিক থেকে হামলাও করতে থাকে। কিন্তু সুলতান তাদের কোন হামলায়-ই কামিয়াব হতে দেননি। অবশ্য তাতে ঘেরাও কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এলাকাটা ছিল সবুজ-শ্যামল। খৃস্টান সৈন্য ও তাদের পশুদের খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা ছিল। তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। হাজার-হাজার উট-ঘোড়ার জন্য সে খাদ্য-পানীয় ছিল অপর্যাপ্ত। পানির জন্য সেখানে কোন নদ-নদী ছিল না। ছিল তিন-চারটি কূপ, যার পানি দেড় মাসেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে খৃস্টান সৈন্যদের মাঝে বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয়'র অভাবে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাতে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনী তাদের উপর গেরিলা হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করতে থাকে। দেড় মাসে এই বাহিনী সংখ্যায় অর্ধেকে নেমে আসে। তাদের পশুগুলোরও বেহাল অবস্থা। খৃস্টান সম্রাট রেমাণ্ড এই বাহিনীর কমাণ্ডার। চরম বিপর্যস্ত এক অবস্থার মধ্যে তিনি অপেক্ষা করছেন, কখন বন্ধুরা হামলা করে তাদেরকে আইউবীর কবল থেকে মুক্ত করে নিবে। কিন্তু তার কোন লক্ষ-ই দেখা যাচ্ছে না।

সুলতান আইউবী ইচ্ছে করলে চারদিক থেকে হামলা করে এই বাহিনীকে পরাস্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে তাদেরও প্রাণহানীর ঘটনা ঘটত প্রচুর। তাছাড়া তাতে যুদ্ধের গতি পাল্টে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজের শক্তি ক্ষয় করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি খৃস্টান বাহিনীকে মার দিতে চাচ্ছেন ধীরে ধীরে। সেভাবে-ই তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য তাতে তার এই ক্ষতি হচ্ছিল যে, তার বাহিনীর তৃতীয় যে অংশটি খৃস্টান বাহিনীকে ঘিরে রাখার অভিযানে আবদ্ধ হয়ে আছে– তাদেরকে তিনি শহর অবরোধ সফল করে তোলার কাজে ব্যবহার করতে পারছিলেন না। সুলতান আইউবী এখন আর অবরোধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন, কিভাবে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকা যায়। সে যুগে এক একটি অবরোধ সাধারণত দীর্ঘ-ই হত। এক একটি শহরকে শত্রুরা দু'বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখত। ছয়-সাত মাসের অবরোধকে 'দীর্ঘ' ভাবা হত না। কিন্তু সুলতান আইউবী অবরোধ দীর্ঘ করার পক্ষপাতি নন। তিনি ঐসব রাজা-বাদশাদের ন্যায়ও ছিলেন না, যারা কোন দেশের রাজধানী অবরোধ করে ভিতরের লোকদের কাছে বার্তা

পাঠাবে যে, এতগুলো সোনা-রূপা, এত হাজার ঘোড়া কিংবা এত পরিমাণ সুন্দরী নারী পাঠিয়ে দাও, আমরা চলে যাব। সুলতান আইউবীর লক্ষ্য আরব ভূখণ্ড থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করা। তিনি বলতেন, এই ভূখণ্ড ইসলামের ঝর্ণাধারা, যা গোটা পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করবে। তিনি তার আয়ুকে প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে করতেন। তিনি বারবার বলতেন, এ-কাজটি আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সমাপ্ত করে যেতে চাই। অন্যথায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম শাসকগণ এই পবিত্র ভূমিকে খৃস্টানদের হাতে বিক্রি করতে চলেছে।

এক রাত। সুলতান আইউবী তাঁর তাঁবুতে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন তিনি। এক পর্যায়ে তার মাথায় বুদ্ধি এল যে, দুর্গের আশপাশ থেকে সুড়ঙ্গ খনন করে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। আরো কিছু পন্থাও তার মাথায় জাগলো। এখন দিনকয়েকের মধ্যেই তিনি কার্ক দুর্গ দখল করতে চাচ্ছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করেন। আলীকে দেখে সুলতান আনন্দিত হলেন না। কারণ, তিনি ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন যে, মিসরের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। চেহারায় বেদনার ছাপ নিয়েই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় তুমি আমার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসনি'।

'আমীরে মেসের যথার্থ বলেছেন। আপনার জন্য আমি কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনতে পারিনি।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান মিসরের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী বিবৃত করতে শুরু করেন। তার মত একজন দায়িত্বশীল মানুষ সুলতান আইউবীর নিকট থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারেন না, পারেন না তিনি তাকে অলীক আশার বাণী শোনাতে। সুলতান আইউবীকে খোলামেলা সব কথা বলে দেয়াই সময়ের দাবী। আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সুলতান আইউবীরও দু'একটি ভুলের কথা খোলাখুলি উল্লেখ করেন। আরসালান-এর গাদ্দারীর কাহিনী এবং আল-ইদরীসের পুত্রদের খুন হওয়ার ঘটনা শুনে সুলতানের চোখে পানি এসে যায়। আরসালান যদি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সপে না দিত, তাহলে তিনি কখনো বিশ্বাস-ই করতেন না যে, তার এই কর্মকর্তা– যাকে তিনি নিজের অফাদার বন্ধু মনে করতেন– গাদ্দারী করতে পারে।

'আরসালান আরো কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলে অবশিষ্ট তথ্যও ফাঁস করে দিত'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তার সর্বশেষ বাক্য (যা সে পূর্ণ করে যেতে পারেনি) থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মিসরে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। মিসরে আমাদের যে বাহিনী আছে, তাদেরকে মানসিকভাবে

হীনমন্য করে দেয়া হয়েছে। আমার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণ করে, আমাদের এক একজন কমান্ডার পর্যন্ত ভুল বুঝাবুঝি ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও মাছ-গোশতের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এই সেনাবাহিনীর মাঝে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সব রেশন ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমন অপপ্রচারও করা হয়েছে যে, ফৌজের বরাদ্দ কর্মকর্তারা বিক্রি করে খাচ্ছে। মিসরে দুশমনের ষড়যন্ত্র পুরোপুরি সফল হয়েছে।'

'দুমশনের চক্রান্ত সে দেশেই সফল হয়, যে দেশের কতক মানুষ দুশমনের সঙ্গ দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমাদের আপনজনরা যদি দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা দুশমনের মোকাবেলা করব কিভাবে? আমি যেভাবে আল্লাহর ঐ সিংহদের চেতনার জোরে এবং তাদের জীবন কোরবান করে খৃস্টানদেরকে রণাঙ্গনে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছি, আমার প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও যদি তেমন পাকা মুসলমান হত, তাহলে প্রথম কেবলা আজ দখলমুক্ত থাকত এবং আমাদের আযানের সুর ইউরোপের গীর্জাগুলোতেও ধ্বনিত হত। কিন্তু আমি আজও মিসরে আটকা পড়ে আছি, আমার চেতনা, আমার প্রত্যয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে।' সুলতান আইউবী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন এবং কি যেন চিন্তা করে আবার বললেন, 'আমাকে সর্বাগ্রে ঐ গাদ্দারদের খতম করতে হবে; অন্যথায় ওরা দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে উঁইপোকার ন্যায় খেতেই থাকবে।'

'আমি আপনার সমীপে এই পরামর্শ নিয়ে এসেছি যে, যদি ময়দান আপনাকে অনুমতি দেয়, তাহলে আপনি মিসর চলুন'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আমি বাস্তবতাকে এড়াতে পারি না আলী'– সুলতান বললেন– 'তবে আমি তোমাকে এ কথাও না বলে পারছি না যে, যারা আমার হাত থেকে খৃস্টানদের গর্দান আর ফিলিস্তীনকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তারা আমারই ভাই-স্বজন শোন আলী! যারা স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করে, যারা ইসলামের দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, আমি যদি তাদেরকে এখনই খতম না করি, তাহলে তারা কখনোই নিঃশেষ হবে না আর আমাদের ইতিহাসকে এই গোষ্ঠীটি আজীবন কলংকিত করতেই থাকবে।' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'সুদানের রণাঙ্গনের সংবাদ কী? আমি তকিউদ্দীনের নিকট পয়গাম পাঠিয়েছিলাম, যেন সে ময়দান গুটাতে শুরু করে।'

'মিসরে কেউ-ই জানে না যে, আপনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আর কারো জানবার প্রয়োজনও নেই।' সুলতান আইউবী বললেন।

দারোয়ানকে ডাক দিলেন তিনি। দারোয়ান আসলে তিনি বললেন,

'কেরানীকে ডেকে আন। কেরানী কাগজ-কলম নিয়ে এসে উপস্থিত হলে সুলতান বললেন, লিখ, মাহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গী... ।'

❁ ❁ ❁

দ্রুতগতিসম্পন্ন একজন দূতকে পত্রটি দিয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গী বরাবর প্রেরণ করা হল। দূত সুলতান আইউবীর এই পয়গাম পরদিন রাতের শেষ প্রহরে বাগদাদে নূরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। সুলতান দূতকে বলে দিয়েছিলেন, পথে প্রতিটি চৌকিতে তুমি তাজাদম ঘোড়া পেয়ে যাবে। তবে ঘোড়া বদল করতে যতটুকু সময় লাগবে, ঠিক ততটুকু বিলম্ব করবে, তার বেশী নয়। যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবে। ঘোড়ার গতি শ্লথ হতে দেবে না কোথাও। নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পৌঁছতে যদি রাত হয়ে যায়, তাহলে দারোয়ানকে বলবে তাকে জাগিয়ে দিতে। ভাই জঙ্গী যদি তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাহলে বলবে, সালাহুদ্দীন বলেছেন, আমরা সকলে জেগে আছি।

সুলতান আইউবীর এই দূত যখন নুরুদ্দীন জঙ্গীর দরজায় গিয়ে উপনীত হয়, রক্ষী বাহিনী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, পয়গাম পৌঁছানোর জন্য তোমাকে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দূত ঘোড়া তো একাধিকবার বদল করেছিল, কিন্তু নিজে এক ঢোক পানি পান করার সময়ও ব্যয় করেনি। ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, সর্বোপরি দু'রাতের নিদ্রাহীনতায় লোকটির মৃতপ্রায় অবস্থা। পিপাসায় এতই কাতর যে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। দু'দিনের না-খাওয়া বলহীন শরীর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তাই শুধু ইঙ্গিতে বলল, 'অনেক জরুরী পয়গাম।'

নুরুদ্দীন জঙ্গীও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় বিশিষ্ট আমলা, দারোয়ান ও দেহরক্ষীদের বলে রেখেছিলেন, জরুরী কোন বার্তা আসলে যেন তার নিদ্রা ও বিশ্রামের পরোয়া না করা হয়।

রক্ষী কমান্ডার ভেতরে প্রবেশ করে নুরুদ্দীন জঙ্গীর কক্ষের দরজায় করাঘাত করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গী জাগ্রত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং পত্রটি হাতে নিয়ে দূতকে সঙ্গে করে সাক্ষাতের কক্ষে প্রবেশ করেন। টলটলায়মান পায়ে কক্ষে প্রবেশ করেই দূত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নূরুদ্দীন জঙ্গী তার কর্মচারীদের ডাক দেন। তারা এলে দূতকে তুলে নিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলার নির্দেশ দেন। সময় নষ্ট না করে তিনি সুলতান আইউবীর পত্রখানা পাঠ করতে শুরু করেন–

'আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার পয়গাম আপনাকে সন্তুষ্ট করবে না। আপাতত আপনার জন্য সন্তোষজনক সংবাদ শুধু এটুকুই যে, আমি হিম্মত হারাইনি। আমি আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করছি। আপনি

আমার নিকট চলে আসুন; আমি আপনাকে সব ঘটনা শুনাব। আমি কার্ক অবরোধ করে রেখেছি। এখনো সফল হইনি। শুধু এতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি যে, খৃস্টানদের একটি বাহিনী সম্রাট রেমান্ডের নেতৃত্বে আমার উপর হামলা করেছিল; আমি নিরাপদ অবস্থান থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছি। এ যাবত তার অর্ধেক সৈন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত খৃস্টান সৈন্যরা তাদের সুদূর এলাকা থেকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে আসা উট-ঘোড়াগুলো জবাই করে খাচ্ছে। আমি রেমান্ডকে জীবিত ধরার চেষ্টায় আছি। কিন্তু কার্ক অবরোধ দীর্ঘ হতে চলেছে। খৃস্টানদের মেধা ও যুদ্ধরীতি এখন আগের চেয়ে উন্নত। আমি অবরোধ সফল করার চেষ্টায় আছি। আমি আশাবাদী যে, আমার জানবাজ মুজাহিদরা দুর্গ ভাঙ্গতে সক্ষম হবে। তারা যে চেতনা ও উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছে, তা আপনাকে বিস্মিত করবে। কিন্তু সুদানে আমার ভাই তকিউদ্দীন ব্যর্থ হয়েছে। আমি তাকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছি। মিসরের সংবাদও ভাল নয়। গাদ্দার ও ঈমান-বিক্রেতারা দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে বিদ্রোহ ও ক্রুসেড আক্রমণের পথ সুগম করে দিয়েছে। আপনি আলী বিন সুফিয়ানকে ভাল করে চিনেন। সে আমার কাছে এসেছে। আমি তার পরামর্শকে উপেক্ষা করতে পারি না। সে আমাকে মিসর চলে যেতে বলছে। মুহতারাম! আমি কার্ক দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার করতে পারি না। অন্যথায় খৃস্টানরা বলবে, সালাহুদ্দীন পিছপা হতে পারে। দুশমনের ঘাড় আমার মুঠোয়। আপনি আসুন, এই ঘাড় আপনি নিজের মুঠোয় তুলে নিন। সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আসবেন। আপনার বাহিনীকে আমি মিসর নিয়ে যাব। অন্যথায় মিসর বিদ্রোহের শিকার হয়ে পড়বে। আমি আশা করি, আপনি আমার দ্বিতীয় বার্তার অপেক্ষা করবেন না।'

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। রাতের পোষাকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের তলব করলেন এবং তাদের জরুরী নির্দেশ প্রদান করেন। দিনের এখনো অর্ধেকও অতিবাহিত হয়নি, তার বাহিনী কার্ক অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সুলতান জঙ্গী একজন মর্দে মুজাহিদ। তার নাম শুনলে খৃস্টানরা কেঁপে উঠত। তার বক্ষে ছিল ঈমানের প্রদীপ। ছিল যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শিতা। তিনি পথে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে এতদ্রুত ময়দানে গিয়ে উপনীত হন যে, দেখে সুলতান আইউবী হতবাক হয়ে যান। দূত যদি আগেভাগেই তাকে অবহিত না করত যে, সুলতান জঙ্গী সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছেন, তাহলে দূর থেকে দেখে সুলতান আইউবী মনে করতেন, খৃস্টান বাহিনী হামলা করতে আসছে। সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেলেন। তাকে দেখে নুরুদ্দীন জঙ্গী ঘোড়া থেকে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইসলামের দু'প্রহরী যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হন, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সব ঘটনা এবং গাদ্দারদের সবিস্তার কাহিনী শোনান। জঙ্গী বললেন, শোন সালাহুদ্দীন! ইসলামের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, গাদ্দাররা আমাদের জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং জাতি তাদের থেকে কখনো মুক্ত হতে পারবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এমন একটি সময় আসবে, তখন গাদ্দাররা যথারীতি এ জাতিকে শাসন করবে। তারা দুশমনের বিরুদ্ধে কথা বলবে, বড় বড় দাবি করবে, দুশমনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করবে, কিন্তু জাতি জানতেই পারবে না যে, তাদের শাসকরা মূলত তাদের ও তাদের দ্বীন-ধর্মের দুশমনের সঙ্গে তলে তলে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। দুশমন তাদেরকে ঢাল-তরবারীরূপে ব্যবহার করবে এবং তাদের হাতে জাতিকে পিষে মারবে। তুমি অস্থির হয়ো না সালাহুদ্দীন! আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব। তুমি মিসর চলে যাও এবং তকিউদ্দীনকে সাহায্য দিয়ে সুদান থেকে বের করে আন। ডানে-বাঁয়ে আক্রমণ করে দুশমনকে অস্থির করে তোল, যাতে তকিউদ্দীনের বাহিনী কোথাও দুশমনের বেষ্টনীতে আটকা না পড়ে। মিসরের সৈন্যদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তাদের মস্তিষ্ক থেকে বিদ্রোহের পোকা বের করে দেব।'

সন্ধ্যার পর নুরুদ্দীন জঙ্গী তার বাহিনীকে কার্ক অবরোধে নিয়োজিত করেন এবং সুলতান আইউবীর বাহিনী পেছনে সরে আসে। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এখানে কিছু ভুল হয়ে যায়। সুলতান আইউবী রেমান্ডের বাহিনীকে ঘিরে রেখেছিলেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী যখন জরুরী নির্দেশনা দিয়ে তার বাহিনীকে তথায় প্রেরণ করেন, তখন নির্দেশনার কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। রেমান্ড অকস্মাৎ সেনাবেষ্টনীর সেই দিকটিতে আক্রমণ করে বসে, যেদিকে সুলতান আইউবীর অবস্থান দুর্বল বলে তার ধারণা। ভুল বুঝাবুঝির কারণে মুসলিম বাহিনী সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না। রেমান্ড সেদিক থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপরও কিছু সৈন্য বেষ্টনীতে আটকা পড়ে থাকে। তারা পরদিন জানতে পারে যে, তাদের অধিনায়ক রেমান্ড পালিয়ে গেছেন। তখন তারাও এলোপাতাড়ি পালাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। তারা তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য লড়াই করে। ফলে কতিপয় নিহত হয়, বাকীরা ধরা পড়ে। এতে সুলতান আইউবীর এতটুকু ক্ষতি হয় যে, রেমান্ড পালিয়ে গেছে। পাশাপাশি উপকারও হয় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী কার্ক

অবরোধ সফল করে তোলার কাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী যখন কায়রো রওনা হন, তখন তিনি বেদনাহত চোখে কার্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি জঙ্গীকে বললেন, 'ইতিহাস একথা বলবে না তো যে, সালাহুদ্দীন আইউবী পিছপা হয়েছিল? আমি অবরোধ প্রত্যাহার করিনি তো?'

'না, সালাহুদ্দীন!'– নুরুদ্দীন জঙ্গী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি পরাজিত হওনি। তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ। যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না।'

'আমার ফিলিস্তীনে আমি আবার আসব'– কার্কের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি আসব...।' বলেই তিনি ঘোড়া হাঁকান, আর পেছনে ফিরে তাকাননি।

নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীর গমনপথে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকেন। একসময় দূর পথে সুলতানের ঘোড়া যখন ধূলো-বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন তিনি তার এক নায়েবকে বললেন, 'ইসলামের প্রতিযুগেই একজন সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রয়োজন হবে।' ঘটনাটি ১১৭৩ সালের (৬৫৯ হিজরী) মধ্যভাগের।

কার্ক দুর্গের পতন

মিসরের পল্লী এলাকার মানুষ লোকটির পথপানে তাকিয়ে আছে। সকলের মুখে একই কথা– 'ইনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন নিয়ে এসেছেন। ইনি মানুষের মনের কথা বলে দেন, ভবিষ্যতের অন্ধকারকে আলোকিত করে দেখান। ইনি মৃত মানুষকে জীবিত করেন।'

কে 'ইনি'? লোকটিকে যে-ই দেখেছে, তার কারামত দেখে এতই অভিভূত হয়েছে যে, কেউ জানবার প্রয়োজন মনে করল না ইনি কে? মানুষের বিশ্বাস, লোকটি আকাশ থেকে এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তার কারামতের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে। কেউ তাকে পয়গাম্বর বলে বিশ্বাস করে। অনেকে তাকে বৃষ্টির দেবতা বলে জানে এবং তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে প্রস্তুত। তার ধর্ম কী, তার বিশ্বাস কী– জানবার গরজ নেই কারুর।

সেকালের মিসরের যে অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলছি, তারা ছিল পশ্চাৎপদ অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সম্প্রদায়। যার ব্যাপারেই তাদের প্রতীতি জন্মাত যে, তার কাছে সমস্যার সমাধান আছে, তার পায়ে গিয়েই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত। তবে ধর্ম পরিচয়ে তারা বেশীরভাগই মুসলমান। ইসলামের আলো তাদের কাছে পৌঁছেনি তা নয়। অনেক মসজিদও নির্মাণ করে রেখেছিল তারা। কাবার প্রভূর দরবারে পাঁচ ওয়াক্ত সেজদাবনতও হত। কিন্তু ইসলামের নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাস থেকে ছিল তারা বঞ্চিত। তাদের ইমামরা ছিল অজ্ঞ। নিজেদের কারামত ফুটিয়ে তোলার জন্য মানুষকে আজগুবি সব কল্পকাহিনী শুনিয়ে মাতিয়ে রাখত। পবিত্র কুরআনকে তারা সাধারণ মানুষের জন্য এক অস্পৃশ্য গ্রন্থরূপে পরিচিত করেছে। ফলে সাধারণ মুসলমানরা কুরআনের গায়ে হাত দিতেও ভয় পেত।

ইমামগণ মুসলমানদের অন্তরে একটি শব্দ 'গায়েব' বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যা কিছু আছে, সবই গায়েবী ব্যাপার-স্যাপার আর গায়েবের ইলম অর্জন করার শক্তি আছে শুধু ইমামের। ইমামরা জনসাধারণকে একটি দুর্বল পদার্থে পরিণত করে রাখে।

এখান থেকেই জনমনে অলীক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জন্ম নেয়। মরুঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে তারা প্রাণীর কণ্ঠ শুনতে পায়। ইমাম বলছেন,

এসব অদৃশ্য প্রাণী তোমরা দেখতে পাবে না। তাদের বিশ্বাসে রোগ-ব্যাধি এখন জ্বিন-ভূতের প্রভাব, যার চিকিৎসা করার ক্ষমতা ইমাম ছাড়া কারুর নেই। ইমামদের দাবি, জ্বিন জাতি তাদের কব্জায়। মানুষ এখন 'গায়েব' আর 'গায়েবের শক্তি'কে এতই ভয় পেতে শুরু করেছে যে, তাদের অন্তরে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিশ্বাস এসে স্থির হয়েছে এখন সেসব স্বর-শব্দে, যা তাদেরকে 'গায়েবী প্রাণী'ও তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

চিত্রটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন পল্লী এলাকার। সে যুগে সীমান্ত বলতে স্পষ্ট কিছু ছিল না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কাগজের উপর একটি রেখা টেনে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বলতেন, ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের কোন সীমানা নেই। সীমানা মূলত বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইসলামের পরিধি যতটুকু, ইসলামী সালতানাতের সীমানাও ততটুকু। যেখান থেকে অনৈসলামী চিন্তা-চেতনা শুরু, সেই এলাকা অন্য দেশের।

মিসরের যে প্রান্তীয় গ্রামগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাকে মিসরের সীমান্তগ্রাম বলা হত। সে কারণেই খৃস্টানরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার চিন্তা-চেতনার উপর আক্রমণ চালাত এবং ইসলামী বোধ-বিশ্বাসকে দুর্বল করে তদস্থলে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে সীমান্তের মর্যাদা যতটা ভৌগলিক ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল সাংস্কৃতিক। সে যুগের ঘটনাবলী থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য অমুসলিমদের অন্যতম অস্ত্র ছিল সংস্কৃতিক আগ্রাসন। তারা জানত, মুসলমান যুদ্ধকে 'জিহাদ' বলে। আর কুরআন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করে দিয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদ নামায অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের এই অমোঘ বিধানটিও তাদের জানা ছিল যে, কোন অমুসলিম দেশের মুসলিম অধিবাসীরা যদি নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে তাদেরকে অমুসলিমদের নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা অন্য দেশের মুসলমানদের জন্য ফরজ।

ইসলামের এসব বিধানই মুসলমানদের মাঝে এমন সামরিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মুসলমান যখনই কোন দেশে অভিযান চালাত কিংবা ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হত, তাদের চিন্তা-চেতনায় যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। ইসলামের সৈনিকদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মালে গনীমত হালাল হলেও লুটপাট করা ইসলামের সৈনিকদের লক্ষ্য হত না, তারা গনীমতের লোভে লড়াই করত না। তার বিপরীতে খৃস্টানদের যুদ্ধ হত আগ্রাসনমূলক

প্রতিপক্ষের সম্পদ লুট করা ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাতে খৃস্টানদের একটি ক্ষতি এই হত যে, যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামরিক শক্তি থাকত মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ থেকে দশ গুণ। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হাতে পরাজয়বরণ করত, অন্তত বিজয় অর্জন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। তারা জানত যে, পবিত্র কুরআন মুসলমানদের মধ্যে সামরিক চেতনা সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা আল্লাহর নামে লড়াই করে, জান দেয়। তাই খৃস্টান সেনাপতিদের অন্যতম ভাবনা ছিল, কিভাবে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই 'যুদ্ধ-চেতনা' দূর করা যায়। তারা জানত, একজন মুসলমান দশজন খৃস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তারা আকাশের ফেরেশতা বা জ্বিন-ভূত নয়, বরং তারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর শক্তি অনুভব করে থাকে, যা তাদেরকে সব ধরনের লোভ-লালসা এমনকি নিজের জীবন থেকেও উদাসীন করে তোলে। তাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীরও বহু আগে ইহুদী ও খৃস্টান আলেম-পন্ডিতগণ মুসলমানদের সামরিক চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে সূক্ষ্ম বিকৃতি সাধন করে তাদের ঈমানকে দুর্বল করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীর দুর্ভাগ্য যে, যখন তারা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে খৃস্টানদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অনেকখানি সফল হয়ে গেছে। ইসলামের দুশমনরা এই আগ্রাসনকে দু'ধারায় পরিচালিত করেছিল। উচ্চ পর্যায়ের মুসলমানদেরকে– যাদের মধ্যে ছিল শাসক, আমীর ও মন্ত্রীবর্গ– অর্থ, নারী ও মদ দ্বারা ঘায়েল করেছিল। আর নিম্নস্তরের মুসলমানদের বিপথগামী করেছিল কুসংস্কার ও ধর্মের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে। সর্বশেষ সুলতান আইউবী ও সুলতান জঙ্গী খৃস্টানবিরোধী অভিযানে যেমন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি পাশাপাশি খৃস্টানরাও মুসলমানদের নৈতিক আগ্রাসনের ময়দানে নতুন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে উঠে। তিন-চারজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এমনও লিখেছেন, একটি সময় এমনও এসেছিল যে, কোন কোন খৃস্টান সম্রাট যুদ্ধের ময়দানের কথা চিন্তা করাই বাদ দিয়েছেন। তারা এই কৌশল অবলম্বন করে যে, এমন যুদ্ধে লড় যাতে মুসলমানের জিহাদী চেতনা ও সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর জোরদার হামলা চালাও আর তাদের অন্তরে এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দাও, যা সাধারণ মুসলমান ও সৈন্যদের মাঝে অবিশ্বাস-অনাস্থা ও ঘৃণার জন্ম দেয়। ফিলিপ অগাস্টাস ছিলেন এই তালিকার প্রধান ব্যক্তি। এই খৃস্টান সম্রাট ইসলামের শত্রুতাকে তার ধর্মের মূল কাজ মনে করতেন এবং বলতেন,

আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবী-নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিরুদ্ধে নয়– ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের এই লড়াই ক্রুশ বনাম ইসলামের লড়াই, যা আমাদের জীবদ্দশায় না হলেও কোন না কোন সময় অবশ্যই সফল হবে। তার জন্য তোমরা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতায় জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের পরিবর্তে যৌনতার বীজ ঢুকিয়ে দাও এবং তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও।

নিজের এই মিশনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে অগাস্টাস যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে সন্ধির পথ অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমি যে যুগের (১১৬৯ সাল) কাহিনী বলছি, সে সময়ে সম্রাট অগাস্টাস নুরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে পরাজিত হয়ে বিজিত এলাকাসমূহ প্রত্যার্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জরিমানাও আদায় করেছিলেন এবং আর যুদ্ধ করবেন না বলে চুক্তি স্বাক্ষর করে জিযিয়া প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনি শুধু কয়েকজন পঙ্গু মুসলিম সৈনিককেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য সুস্থ-সবল সৈনিকদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর এখন তিনি কার্ক দুর্গে ইসলামের মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে মহাব্যস্ত। ইসলামের শত্রুতা যেন তার মজ্জাগত বিষয়। তার কোন কোন কর্মকৌশল এতই গোপনীয় হত যে, তার সমমর্যাদার খৃস্টান নেতা-সেনাপতিরাও তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। তার সহকর্মীরা তার উপর এই অপবাদও আরোপ করেছিল যে, সম্রাট অগাস্টাস তলে তলে মুসলমানদের আপন এবং গোপনে তাদের সঙ্গে সওদাবাজী করছেন। এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আন্দ্রে আজবন-এর ভাষ্য মতে, এই অপবাদের জবাবে অগাস্টাস একবার বলেছিলেন, একজন মুসলিম শাসককে জালে আটকানোর জন্য আমি আমার কুমারী কন্যাদেরকেও তার হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হব না। তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ও বন্ধুত্ব করতে ভয় পাচ্ছ। কারণ, তার মধ্যে তোমার লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা এ কথা ভেবে দেখছ না যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দান অপেক্ষা সন্ধির ময়দানে মার দেয়া সহজ। প্রয়োজনে তাদের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর কর আর ঘরে এসে তার বিপরীত কাজ কর। আমি কি এমনই করছি না? তোমরা কি জান না যে, আমার রক্ত সম্পর্কের দু'টি যুবতী মেয়ে দামেস্কের এক শায়খের হেরেমে অবস্থান করছে? তোমরা কি সেই শায়খের হাত থেকে বিনা যুদ্ধে অনেক ভূখণ্ড দখল করনি? তিনি কি বন্ধুত্বের হক আদায় করেননি? তিনি আমাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করেন; অথচ আমি তাকে আমার জানী দুশমন জ্ঞান করি। আমি প্রত্যেক অমুসলিমকে বলব, তোমরা মুসলমানদের

সঙ্গে চুক্তি করে চল এবং তাদেরকে প্রতারণা জালে আটকিয়ে মার।

❀ ❀ ❀

এ হল ক্রুসেডারদের সেই মানসিকতা, যা এক সফল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার ভিতকে উঁই পোকার ন্যায় খেয়ে ফোকলা করে চলেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের-ই ফলে মিসরে বিদ্রোহের স্ফূলিঙ্গ লেলিহান শিখায় পরিণত হতে শুরু করেছিল, যাকে অবদমিত করার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এমন এক মুহূর্তে কার্ক অবরোধ থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে তুলে আনতে হল, যখন তিনি খৃস্টানদের শক্তিশালী একটি বাহিনীকে দুর্গের বাইরে পরাস্ত করে ফেলেছেন। কার্ক অবরোধ সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে সৈন্যসহ কায়রো ফিরে যেতে হল। তাতে সুলতান আইউবী হীনবল হননি বটে, কিন্তু পরিস্থিতি তার মনের উপর বিরাট এক বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা তার চেহারায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। তার বাহিনীর সৈন্যরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, তাদেরকে বিশ্রামের জন্য কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাহিনীর কমান্ডারগণ (যারা সুলতান আইউবীর প্রত্যয় ও যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অবগত) এই ভেবে বিস্মিত যে, তিনি নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সৈন্যসহ ডেকে আনলেন কেন? অবরোধই বা তুলে নিলেন কি কারণে? তিনি তো জয় বা পরাজয় পর্যন্ত লড়াই করার পক্ষপাতি ছিলেন। বস্তুত, সুলতান আইউবীর হেড কোয়ার্টারের দু'-তিনজন সালার ছাড়া কেউ জানত না, মিসরের পরিস্থিতি শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে, তকিউদ্দীনের সুদান হামলা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে জান বাঁচিয়ে পেছনে সরে আসতে হচ্ছে। সুলতান আইউবীর সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিয়ে এসেছিলেন।

সুলতান আইউবী কার্ক ত্যাগ করে মিসর অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে এই আদেশও প্রদান করেন যে, পথে যাত্রাবিরতি হবে খুব কম এবং চলতে হবে অতি দ্রুত। এই নির্দেশে সকলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সমস্যা কিছু একটা হয়েছে।

সফরের প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলা। বাহিনী রাতের জন্য একস্থানে থেমে যায়। সুলতানের জন্য তাঁবু খাটান হয়। তিনি তার উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় কমান্ডের দায়িত্বশীলদের একত্রিত করেন। তিনি বললেন, আপনারা অধিকাংশই জানেন না যে, আমি কেন কার্ক অবরোধ তুলে আনলাম এবং কেনইবা বাহিনীকে মিসর নিয়ে যাচ্ছি। অবরোধ ভেঙ্গে যায়নি ঠিক, আপনারা কেউ পিছপাও হননি। কিন্তু আমি একে 'পরাজয়' না বললেও 'পিছপা' হওয়া বলব অবশ্যই। আমার বন্ধুগণ! আমরা পিছপা হচ্ছি এবং আপনারা শুনে

বিস্মিত হবেন যে, যারা আপনাদেরকে পিছপা হতে বাধ্য করেছে, তারা আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। এখন তারা খৃস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রস্তুত। আলী বিন সুফিয়ান, তার নায়েব ও গিয়াস বিলবীস যদি চৌকস না হতেন, তাহলে আজ আপনারা মিসর যেতেই পারতেন না। ওখানে এখন চলত খৃস্টান ও সুদানীদের রাজত্ব। আরসালানের ন্যায় কর্মকর্তা খৃস্টানদের ক্রীড়নক প্রমাণিত হয়েছে। লোকটি আল-ইদরীসের দু'যুবক পুত্রকে খুন করিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে। আরসালানের মতো লোকই যখন গাদ্দার প্রমাণিত হল, এমতাবস্থায় আপনারা আর নির্ভর করবেন কার উপর!

সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনে শ্রোতারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অস্থিরতা ও উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠে সকলের চোখে-মুখে। সুলতান নীরব হয়ে সকলের প্রতি চোখ বুলালেন। তৎকালের এক ঐতিহাসিক কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডায়েরীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তখন দু'টি প্রদীপের কম্পমান আলোয় সকলের মুখমণ্ডল এমন দেখাচ্ছিল, যেন তাদের কেউ কাউকে চেনে না। আইউবীর বক্তব্য শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল সবাই। সুলতান আইউবীর ভাষা অপেক্ষা বর্ণনাভঙ্গী ও উপস্থাপনার ঢং তাদেরকে বেশী প্রভাবিত করছিল। সুলতানের কণ্ঠে জোশ ছিল না বটে, তবে এতই গাম্ভীর্য ছিল যে, সবাই প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যেও গাদ্দার আছে' বলে আমি মাফ চাইব না। আমি আপনাদেরকে এ কথাও বলব না যে, আপনারা কুরআন হাতে নিয়ে হরফ করে বলুন, আপনারা ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার অফাদার। কারণ, আমি জানি, যারা ঈমান বিক্রি করতে জানে, তারা কুরআনে হাত রেখেও মিথ্যা অঙ্গীকার করতে পারে। আমি আপনাদেরকে শুধু এটুকু বলব যে, যে ব্যক্তি মুসলমান নয়, সে-ই আপনাদের দুশমন। দুশমন যখন আপনার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তখনও তার মধ্যে দুশমনী লুকিয়ে থাকে। তারা আপনাকে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে এবং যখনই মুসলমানদের উপর তার শাসন করার সুযোগ আসে, তখন সে মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানি এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করে থাকে। এ-ই তার লক্ষ্য। আমরা যে লড়াই লড়ছি, তা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়; এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের বা কোন দেশ দখল করার প্রচেষ্টা নয়। এটি হল দু'টি বিশ্বাসের লড়াই– কুফর ও ইসলামের। এ যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না কুফর কিংবা ইসলাম নির্মূল হবে।

'গোস্তাখী মাফ করুন সালারে আজম!'– এক সালার বললেন– 'আমরা যে

গাদ্দার নই, তা যদি প্রমাণই করতে হয়, তাহলে আপনি আমাদেরকে মিসরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করুন। দেখবেন, আমরা প্রমাণিত করব যে, আমরা কী। আরসালান সেনাবাহিনীর নয়– প্রশাসনের কর্মকর্তা ছিলেন। আপনি গাদ্দার প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে খুঁজে পাবেন– সেনাবাহিনীতে নয়। কার্ক দুর্গের অবরোধ আপনি তুলে নিয়েছেন– আমরা আনিনি। মোহতারাম জঙ্গীকে ডেকে এনেছেন আপনি- আমরা নই। আমাদের পরীক্ষা হবে যুদ্ধের ময়দানে- নিরাপদ পিছু হটার মাধ্যমে নয়। আপনি বলুন, মিসরে কী সব ঘটছে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'আলী! এদেরকে বল, মিসরে কী হচ্ছে।'

আলী বিন ফিয়ান বললেন–

'গাদ্দাররা দুশমনের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুদানের রণাঙ্গনের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য উধাও করে ফেলেছে। দেশের পল্লী এলাকাগুলোতে অপরিচিত লোকজন এসে খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারী ইত্যাদি চড়া মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। গোশত এখন দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ময়দানে রসদ প্রেরণ করা হলেও অজ্ঞাত কারণে বিলম্ব ঘটান হচ্ছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, রসদ রওনা করিয়ে দুশমনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে দুশমন রসদের বহর পথে ধরে ফেলেছে। শহরে অপরাধপ্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে জুয়াবাজির প্রসার ঘটান হয়েছে যে, আমাদের যুবসমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ফৌজে নতুন ভর্তির জন্য পল্লী অঞ্চলগুলোতে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। গরু-মহিষ, ছাগল-দুম্বা-ভেড়াও উধাও হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। খৃস্টানরা তাদেরকে এই প্রলোভন দেখিয়েছে। অজ্ঞাত উৎস থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ তাদের হাতে আসছে। যেহেতু সরকারের সব ব্যবস্থাপনা তাদের হাতে, তাই তারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা দুশমনের জন্য অনুকূল। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল, পল্লী এলাকাগুলোতে আজগুবি ধরনের নতুন নতুন বিশ্বাসের প্রসার ঘটছে। মানুষ ইসলাম পরিপন্থী চিন্তা-চেতনা লালন ও পালন করতে শুরু করেছে। সেসব ভিত্তিহীন ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। এ এক বিরাট আশংকার বিষয়।

'আপনি কি তার প্রতিকার করেননি?' উপস্থিতদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'জি, করেছে'– আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন– 'আমার গোটা বিভাগ অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ ও তাদের গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

আমি আমার গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদেরকে পল্লী এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে রেখেছি। কিন্তু দুশমনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এত-ই বেড়ে গিয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীদেরকে ধরা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সবচে' বড় সমস্যা হল, আমাদের মুসলমান ভাইরা-ই দুশমনের গুপ্তচর ও দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করছে। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, পল্লী এলাকার কোন কোন মসজিদের ইমামও দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে।'

'এমন তো হতে পারে না যে, আমি প্রশাসনকে সেনা বিভাগের হাতে তুলে দেব!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সেনাবাহিনীকে যে কাজের জন্য গঠন করা হয়েছে, যদি তারা যথাযথভাবে তা পালন করে যায়, তাহলে দেশের জন্যও মঙ্গল, তাদের জন্যও কল্যাণকর। একজন কোতোয়াল যেমন সালার হতে পারেন না, তেমনি একজন সালারও কোতোয়ালের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তবে প্রত্যেক সালারকে অবশ্যই খবর রাখতে হবে, প্রশাসন কী করছে। এক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে না তো? আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আমাদেরকে ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন। মিসরের পরিস্থিতি আপনারা শুনেছেন। সুদানের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তকিউদ্দীন তার ভুলের জন্য সুদানের মরুভূমিতে আটকা পড়ে আছে। তার বাহিনী ছোট ছোট দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তার নিরাপদে পেছনে সরে আসার সম্ভাবনাও নজরে আসছে না। তাছাড়া মোহতারাম জঙ্গী কার্ক জয় করতে পারবেন কিনা, তাও আমার জানা নেই। তিনিও যদি ব্যর্থ হন, তাহলে তার দায়ভার আমাকেই বহন করতে হবে। আমি জানি, আপনারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে পরাজিত করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুশমন যে ময়দানে হামলা করেছে, তাতে দুশমনকে পরাস্ত করা আপনাদের পক্ষে বাহ্যত সহজ বলে মনে হয় না। আপনারা ধারাল তরবারী। আপনারা মরুভূমির শাহসাওয়ার। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, ক্রুসেডারদের এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা অস্ত্র সমর্পণ করে ফেলবেন।'

মজলিসের ভেতরে বেশকিছু লোকের জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল। তারা ইসলাম ও দেশের স্বার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত। শুনে সুলতান আইউবী বললেন–

'বর্তমানে মিসরে যে সৈন্য আছে, তারা যখন কার্ক ও শোবকের ময়দান থেকে মিসর ফিরছিল, তখন তাদের কমান্ডার-দায়িত্বশীলদের জযবাও ঠিক এমন ছিল, যেমনটি এখন আপনাদের। কিন্তু কায়রো পৌঁছে যখন তারা দুশমনের সবুজ বাগান দেখতে পেল, তখন তারা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আর আজ তাদের নৈতিক অবস্থা এমন যে, আপনারা তাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না।'

'আমরা এ ধরনের প্রত্যেক কমান্ডারকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হব।' তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে এক সালার বললেন।

'আমরা সর্বপ্রথম নিজেদেরকে গাদ্দারদের থেকে পবিত্র করব।' বললেন আরেকজন।

'আমার পুত্রও যদি খৃস্টানদের আপন বলে প্রমাণ পাই, তাহলে নিজ তরবারী দ্বারা তার মাথা কেটে আমি আপনার পায়ে এনে ফেলব।' বললেন প্রবীণ এক নায়েবে সালার।

'আমি এরূপ আবেগময় উত্তেজনাপূর্ণ কথার পক্ষে নই।' সুলতান আইউবী বললেন।

উপস্থিত সামরিক কর্মকর্তাদের সকলেই উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। এরা এমন মানুষ, যারা সুলতান আইউবীর সামনে মুখ খুলে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু যখন শুনতে পেল যে, তাদের সহকর্মীরা দুশমনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত, তখন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। একজন তো সুলতান আইউবীকে এমনও বলে ফেলল যে, 'আপনি সবসময় আমাদেরকে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করতে বলে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমনও সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, তখন ধৈর্য ও সহনশীলতা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আপনি অনুমতি দিন, আমরা পথে আর কোথাও যাত্রাবিরতি না দিয়ে সোজা কায়রো পৌঁছে যাই। আমরা ঐ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে বন্দী করে ফেলব।'

পরিবেশ এতই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে যে, নিয়ন্ত্রণে রাখা সুলতান আইউবীর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উত্তেজনার মধ্যেই তিনি আরো কিছু কথা বলে ও শুনে বৈঠক মুলতবী করে দেন। প্রত্যুষে কাফেলা আবার রওনা হয়। সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলে তারা। সুলতান আইউবী তার আমলাদের থেকে খানিক আলাদা হয়ে এগুচ্ছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আলী বিন সুফিয়ান তার সঙ্গে নেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাহিনীকে দু'বার কিছু সময়ের জন্য থামানো হয়। রাতেও কাফেলা চলতে থাকে। রাতের প্রথম প্রহর শেষ প্রায়। সুলতান আইউবী রাতে অবস্থানের জন্য যাত্রাবিরতি দেন। সুলতানের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আলী বিন সুফিয়ানের আগমন ঘটে।

'সারাদিন কোথায় ছিলে আলী!' সুলতান জিজ্ঞেস করেন।

'গতরাতে আমার মনে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল'– আলী বিন সুফিয়ান জবাবে দেন– 'তার বাস্তবতা খতিয়ে দেখার জন্য দিনভর বাহিনীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'কী সন্দেহ!' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চান সুলতান আইউবী।

'রাতে আপনি দেখেননি যে, সকল সালার, কমান্ডার ও ইউনিট দায়িত্বশীলরা কিভাবে মিসরে অবস্থানরত বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, এরা নিজ নিজ অধিনস্থ সিপাহীদেরও ক্ষেপিয়ে তুলবে। বাস্তবে আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তারা বাহিনীকে এমন সব কথাবার্তা দ্বারা উত্তেজিত করে তুলেছে যে, গোটা বাহিনীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি সাধারণ সৈনিকদের বলতে শুনেছি যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানে আহত হচ্ছি, শহীদ হচ্ছি আর আমাদের সহকর্মী অন্য সৈনিকরা কায়রোতে বসে মৌজ করছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করছে। আমরা মিসর গিয়ে নিই, আগে তাদেরকে শেষ করে তারপর সুদানে আটকাপড়া বাহিনীকে সাহায্য করব। মহামান্য আমীর! আমরা যদি এ ব্যাপারে আগাম কোন ব্যবস্থা না নিই, তাহলে এই বাহিনীর কায়রো পৌছামাত্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের এই বাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রতিশোধপরায়ণ। সবাই উত্তেজিত। আর মিসরের বাহিনী পূর্ব থেকেই অজুহাতের সন্ধানে রয়েছে।'

'আমি এ জন্য আনন্দিত যে, অবিরাম যুদ্ধক্লান্ত এই বাহিনীর মধ্যে এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে'– সুলতান বললেন– 'কিন্তু আমাদের দুশমনের একান্ত কামনা যে, আমাদের বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আপসে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ুক।'

সুলতান আইউবী গভীর চিন্তায় ডুবে যান। কিছুক্ষণ পর বললেন–

'কৌশল একটা পেয়েছি। কায়রো থেকে উল্লেখযোগ্য দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার একজন বিচক্ষণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন দূত পাঠিয়ে মিসরের বাহিনীকে অন্যপথে কার্ক অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেব। এমনও হতে পারে যে, আমি আগেভাগে গিয়ে বাহিনীকে রওনা করাব। এতে আমাদের সঙ্গে যে বাহিনী আছে, তারা ওখানে পৌছে কোন সৈন্য দেখতে পাবে না। বিষয়টা তদন্ত করে তুমি ভালই করেছ আলী। বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি।'

❁ ❁ ❁

সীমান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলের রহস্যময় সেই লোকটি ভক্ত-সহচরদের নিয়ে দলবেঁধে সফর করে বেড়ায়। লোকটি বৃদ্ধ নয়। তার কাজল-কালো ভ্রু, গৌরবর্ণ মুখাবয়ব। মাথায় লম্বা চুল। দু'চোখে চাঁদের চমক। দাঁতগুলো তারকার ন্যায় শুভ্র। দীর্ঘকায় সুঠাম দেহ। কথা বললে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে তার বিপুলসংখ্যক সহচর ও অগণিত উট। তার কাফেলা জনবসতি থেকে দূরে কোথাও গিয়ে অবস্থান নেয় এবং লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়। জনবসতিতে অনুপ্রবেশ করে না সে কখনো।

যে রাতে আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলছিলেন

যে, আমাদের এই কায়রোগামী বাহিনী মিসরে অবস্থানরত সৈন্যদের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, সে রাতে রহস্যময় সেই লোকটি কায়রো থেকে বেশ দূরবর্তী এক খর্জুরবীথি-ঘেরা এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে। তার নিয়ম ছিল, সে কখনো জ্যোৎস্না রাতে কাউকে সাক্ষাৎ দিত না। দিনের বেলা কারো সঙ্গে কথা বলত না। অন্ধকারের রাতগুলোই ছিল তার প্রিয়। তার মাহফিল এমন সব বাতি দ্বারা আলোকিত হত, যার একটির রং ছিল অন্যটি থেকে আলাদা। সেই আলোরও বিশেষ এক প্রভাব ছিল, যা উপস্থিত লোকদের উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করত।

বর্তমানে লোকটি যেখানে অবস্থানরত, তার খানিক দূরে একটি লোকালয়, যার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। সুদানী হাবশীও আছে কিছু। এলাকায় একটি মসজিদও আছে, যার ইমাম স্বল্পভাষী মানুষ। একটি যুবক ছেলে আজ দেড়-দু'মাস হল তার নিকট দ্বীনি তালীম হাসিল করতে আসা-যাওয়া করছে। মাহমদু বিন আহমদ নামক এই যুবকটি এসেছে অন্য এক এলাকা থেকে। তার সব ভাবনা ইমাম আর তার ইলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আরো একটি জিনিস নিয়ে তার কৌতূহল আছে- একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটির নাম সাদিয়া। সাদিয়া মাহমুদকে ভালবাসে। মেয়েটি কয়েকবার তাকে তার বকরীর দুধপান করিয়েছে।

দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে লোকালয় থেকে দূরে এক চারণভূমিতে। যেদিন সাদিয়া তার চারটি বকরী ও দু'টি উট চড়াতে সেখানে গিয়েছিল, সেদিন মাহমুদও চলার পথে সেখানে পানি পান করার জন্য থেমেছিল। দু'জনের চোখাচোখি হলে সাদিয়াই প্রথম জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাচ্ছেন? মাহমুদ জবাব দেয়, আমি কোথাও থেকে আসেনি এবং কোথাও যাচ্ছি না। শুনে সাদিয়া ফিক্ হেসে ফেলে। সাদিয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মুসলমান? সুদানী? মাহমুদ জবাব দেয়, আমি মুসলমান। মেয়েটি মুচকি হাসে। মাহমুদ মেয়েটির সঙ্গে এমন কিছু কথা বলে, যা তার কাছে ভাল লাগে। সাদিয়া তাকে সুদানের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তার কথার ধরনে বুঝা যায়, ইসলামী ফৌজের প্রতি তার সমর্থন রয়েছে। মেয়েটি সুলতান সালাহুদ্দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ তার এমন সব প্রশংসা করে যে, সুলতান আইউবী মানুষ নন- আসমান থেকে নাযিল হওয়া ফেরেশতা। সাদিয়া জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও বড় বুযুর্গ, যিনি আকাশ থেকে এসেছেন এবং মৃত প্রাণীকে জীবিত করে ফেলেন?

'না, সালাহুদ্দীন আইউবী মৃত প্রাণীকে জীবিত করতে পারেন না।' মাহমুদ জবাব দেয়।

'আমরা শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি জীবন্ত মানুষকে খুন করে ফেলেন!' সন্দেহমূলক প্রশ্ন করে সাদিয়া– 'মানুষ এ-ও বলছে, তিনি নাকি মুসলমান এবং আমাদের ন্যায় নামায-কালাম পড়েন?'

'তোমাকে কে বলেছে যে, তিনি মানুষ খুন করেন?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের গ্রাম দিয়ে অনেক মুসাফির আসা-যাওয়া করে। তারা বলে, সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি খুব খারাপ মানুষ।' সাদিয়া জবাব দেয়।

'তোমাদের মসজিদের ইমাম কী বলেন?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'তিনি অত্যন্ত ভাল কথা বলেন'– সাদিয়া জবাব দেয়– 'তিনি বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবী সমগ্র মিসরে ও সুদানে ইসলামের আলো বিস্তার করার জন্য এসেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম-ই আল্লাহ্ পাকের একমাত্র সত্য দ্বীন।'

মাহমুদ বিন আহমদ মেয়েটির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে থাকে। আলোচনা থেকে সে জানতে পারে যে, তার গ্রামে এমন কিছু লোক আসা-যাওয়া করে থাকে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে; কিন্তু কথা-বার্তা এমন বলে যে, তাতে কিছু লোকের মনে ইসলামের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেছে। মাহমুদ সাদিয়ার মনের সংশয় দূর করে দিয়েছে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও মধুর ভাষায় তার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে ফেলে যে, মেয়েটি অকপটে বলেই ফেলে, আমি এখানে প্রায়-ই বকরী চড়াতে আসি। আপনি এ-পথে আসলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মাহমুদ মেয়েটিকে আবেগ ও বাস্তবতার মাঝে ফেলে রেখে তার গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যায়।

সাদিয়া একাকি দাঁড়িয়ে ভাবে, লোকটি কে? কোত্থেকে এল? যাচ্ছে-ইবা কোথায়? লোকটির পোশাক অত্র এলাকার বটে, কিন্তু তার গঠন-আকৃতি, তার কথা-বার্তা প্রমাণ করছে সে এখানকার কেউ নয়।

সাদিয়ার সন্দেহ যথার্থ। মাহমুদ অত্র এলাকার মানুষ নয়। বাড়ি তার ইস্কান্দারিয়া। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ সদস্য। বেশ কয়েক মাস যাবত সে অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে সীমান্তবর্তী পল্লী এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তার থাকা-খাওয়ার ঠিকানা গোপন। সঙ্গে আরো কয়েকজন গুপ্তচর রয়েছে, যারা অত্র এলাকার-ই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। ক'দিন পর পর তারা নির্ধারিত গোপন ঠিকানায় একত্রিত হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়। এভাবে-ই আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পাচ্ছেন যে, দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে কী সব ঘটনা ঘটছে।

মাহমুদ বিন আহমদ সাদিয়াকে তার গ্রামের মসজিদের ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার কারণ, ইতিপূর্বে দু'টি গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে সে এমন ইমামের সন্ধান পেয়েছে– যাদেরকে তার সন্দেহ হয়েছিল। এলাকার

লোকদের থেকে সে জানতে পারে যে, ইমামরা এখানে নতুন এসেছেন। এর আগে এসব মসজিদে ইমাম ছিলেন-ই না। তারা দু'জন-ই জিহাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন, কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। রহস্যময় সেই লোকটিকে সমর্থন করেন এবং জনসাধারণকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মাহমুদ ও তার দু'সহকর্মী মিলে এই ইমামদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো পাঠিয়ে দেয়। আর এখন সে যাচ্ছে সাদিয়ার গ্রামের দিকে। তার একথা শুনে বেশ ভাল লেগেছিল যে, সেই গ্রামে ইমাম সুলতান আইউবীর ভক্ত ও ইসলামের জন্য নিবেদিত। মাহমুদ বিন আহমদ সেই মসজিদকে নিজের ঠিকানা বানাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

❁ ❁ ❁

মাহমুদ সাদিয়ার এলাকার মসজিদে পৌঁছে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলে, আমি ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমাকে দ্বীনের তালীম দিন। ইমাম তাকে তালীম দেবেন বলে ওয়াদা দেন এবং তাকে মসজিদে-ই থাকার প্রস্তাব করেন। মাহমুদ মসজিদে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। সে ইমামকে বললে, দু'-তিন দিন পরপর আমাকে বাড়ি যেতে হবে। ইমাম নাম জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ নিজের আসল নাম গোপন রেখে অন্য নাম বলে। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে সে দূরবর্তী কোন সীমান্ত এলাকার কথা বলে। ইমাম মুচকি হেসে বলে উঠলেন, মাহমুদ বিন আহমদ! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তুমি তোমার কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন নও। ইস্কান্দারিয়ার মুসলমানরা দায়িত্ব পালনে বড় পাকা।

মাহমুদ সহসা চমকে ওঠে। সে মনে করেছিল ইনি খৃষ্টানদের চর। কিন্তু ইমাম তাকে দীর্ঘ সময় সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকতে দিলেন না। বললেন, অন্তত তোমার কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেয়া উচিত। আমি তোমার-ই বিভাগের একজন কর্মকর্তা। আমি তোমার সব সঙ্গীকেই– যারা এ অঞ্চলে কর্মরত আছে–জানি। তোমরা কেউ আমাকে চিননা। আমি আলী বিন সুফিয়ানের সেই স্তরের কর্মকর্তা, যারা দুশমনের উপর দৃষ্টি রাখার পাশপাশি নিজেদের গুপ্তচরদের উপরও নজর রাখে। আমি ইমাম সেজে গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব পালন করছি।

'তারপর-ও আমি আপনাকে বিচক্ষণ বলব না'–মাহমুদ বিন আহমদ বলল–'আপনি যেভাবে আমার সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন, তেমনি দুশমনের কোন গুপ্তচরের সামনেও করতে পারেন।'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম তুমি আমার-ই মানুষ'–ইমাম বললেন–'প্রয়োজনের তাগিদে-ই আমি নিজেকে তোমার সামনে প্রকাশ করে দেয়া আবশ্যক মনে

করেছি। আমার দু'জন রক্ষী আছে। তারা ছদ্মবেশে এই এলাকায় অবস্থান করে। তবে আমার আরো লোকের প্রয়োজন ছিল। ভালোই হল, তুমি এসে পড়েছ। এই গ্রামে দুশমনের সন্ত্রাসীরা আসছে। তুমি নিশ্চয় ঐ লোকটির কথা শুনে থাকবে, যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারে এবং মৃত প্রাণীকে জীবিত করতে পারে। এই গ্রামটিও তার সেই সব অদেখা কারামতের কবলে চলে গেছে। আমি গ্রামবাসীদেরকে প্রথমদিকে বলেছিলাম যে, এর সবই মিথ্যা। কোন মানুষ লাশের ভিতরে জীবন ঢুকাতে পারে না। কিন্তু তার প্রভাব এত-ই ব্যাপক যে, মানুষ আমার বিরোধী হয়ে উঠে। আমি সংযত হয়ে যাই। কারণ, আমি এই মসজিদ থেকে বের হতে চাইনা। আমার একটি আড্ডা এবং একটি ঠিকানার তো প্রয়োজন। এখানকার পথহারা মানুষগুলোকে ইসলামের সোজা রাস্তাও তো দেখাতে হবে। পনের-বিশদিন পর রাতে দু'জন লোক আমার নিকট আসে। আমি তখন মসজিদে একা। তাদের উভয়েই ছিল মুখোশপরা। তারা আমাকে হুমকি দেয়, আমি যেন এখান থেকে চলে যাই। তাদেরকে বললাম, আমি অসহায় মানুষ, আমার আর কোন ঠিকানা নেই। তারা বলল, এখানে থাকতেই যদি চান, তাহলে দারস বন্ধ করে দিয়ে সেই ব্যক্তির কথা প্রচার করুন, যিনি আসমান থেকে এসেছেন এবং আল্লাহর সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আমি তখন ইচ্ছে করলে দু'জনের মোকাবেলা করতে পারতাম। অস্ত্র তো সবসময় সঙ্গে-ই রাখি। কিন্তু লড়াই করে কাউকে হত্যা বা নিজে নিহত হয়ে তো আমি কর্তব্য পালন করতে পারতাম না। আমি কৌশল অবলম্বন করি। আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দেই যে, আজ থেকে তোমরা আমাকে তোমাদের-ই লোক মনে কর। তারা বলল, আপনি যদি আমাদের কথামত আজ করেন, তাহলে আপনি দু'টি পুরস্কার পাবেন। প্রথমত আপনার জীবন রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত আপনার অর্থের অভাব হবে না।

'তারপর আপনি আপনার বয়ানের ধারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন?'—মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'এক রকম'—ইমাম জবাব দেন—'এখন আমি দু'রকম কথাই বলি। আমার স্বর্ণমুদ্রার নয়—প্রয়োজন শুধু জীবনটার। আমি কর্তব্য পালন না করে মরতে চাই না। গ্রামের বাইরে গিয়ে তোমাকে বা তোমার অন্য কোন সহকর্মীকে খুঁজে বের করাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সে রাতে আমার দেহরক্ষীরাও আমার কাছে ছিল না। এখন আল্লাহ নিজেই তোমাকে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। তুমি আমার কাছে আমার শিষ্য হয়ে থাক। কথা বলবে সরল-সহজ গ্রাম্য মানুষদের মত। গ্রামের চার-পাঁচজন মানুষ এমন আছে, যারা আমাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। আমরা

যদি কাছাকাছি কোন সীমন্ত রক্ষী বাহিনী পেয়ে যেতাম, তাহলে কাজ হত। তবে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কোন কমাণ্ডারের উপর ভরসা রাখাও বিপজ্জনক। দুশমন সোনা-দানা আর নারী দিয়ে অনেককে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। তারা বেতন খায় আমাদের কোষাগারের, আর কাজ করে দুশমনের।'

মাহমুদ বিন আহমদ ইমামের কাছে থেকে যায়। সেদিনই ইমাম তার দু'দেহরক্ষীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

সন্ধ্যার সময় সাদিয়া মসজিদে ইমামের জন্য খাবার নিয়ে আসে। মাহমুদকে দেখে প্রথমে থমকে যায়। তারপর মুচকি হাসে। মাহমুদ জিজ্ঞেস করে, আমার জন্য খাবার আনবে না? সাদিয়া খাবারের পাত্র ইমামের হুজরায় রেখে ছুটে যায়। কিছুক্ষণ পর কয়েকটি রুটি ও এক পেয়ালা বকরীর দুধ নিয়ে আসে।

সাদিয়া চলে যায়। ইমাম মাহমুদকে বললেন, এটি অত্র অঞ্চলের সবচে' সুন্দরী মেয়ে। বয়স কম। বুদ্ধিমতীও বটে। মেয়েটির বেচা-কেনার কথা-বার্তা চলছে।

'বেচা-কেনা না বিবাহ?' বিস্ময়ের সাথে মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'বেচা-কেনা'—ইমাম বললেন—'তুমি জান না, এদের বিবাহ মূলত ক্রয়-বিক্রয়-ই হয়ে থাকে। কিন্তু সাদিয়ার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের পেরেশান হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তার ক্রেতা একজন সন্দেহভাজন মানুষ। লোকটি এখানকার বাসিন্দা নয়। মনে হচ্ছে, যারা আমাকে হুমকি দিয়েছিল, এরা তারাই। তুমি একটু চিন্তা করলে-ই বুঝতে পারবে যে, ওরা মেয়েটিকে ওদের রঙে রঙিন করে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই মেয়েটিকে রক্ষা করা জরুরী। তাছাড়া মেয়েটি মুসলমান। সালতানাতের পাশাপাশি আমাদেরকে দেশের মেয়েদের সম্ভ্রমের হেফাজত করাও আবশ্যক। আমি আশা রাখি, এই সওদা হতে পারবে না। সাদিয়ার পিতাকে আমি আমার মুরীদ বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু সমস্যা হল, লোকটি গরীব ও নিঃসঙ্গ মানুষ। সমাজের রীতি-নীতি উপেক্ষা করে টিকে থাকার মত শক্তি তার নেই। এক কথায়, জগতে সাদিয়ার মোহাফেজ আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাহমুদ ইমামের শিষ্য হয়ে যায়। দিন যেতে থাকে। সাদিয়ার সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে। মেয়েটি বকরী নিয়ে চারণভূমিতে যায়, মাহমুদও যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। দু'জনে কথা হয়, গল্প হয়।

মাহমুদ সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করে, ঐ যে কে যেন তোমাকে কিনতে চায়, লোকটা কে?

সাদিয়া তাকে চিনে না। লোকটা অপরিচিত—অন্য এলাকার মানুষ। গরু-

মহিষ ক্রয় করার আগে মানুষ যেভাবে দেখে থাকে, ঐ লোকটাও এসে সাদিয়াকে সেভাবে দেখে গেছে।

সাদিয়ার ভাল করেই জানা আছে যে, সে কারো স্ত্রী হবে না। আরবের কোন বিত্তশালী ব্যবসায়ী-আমীর বা উজীর তাকে নিজের হেরেমে বন্দী করে রাখবে আর কোন পুরুষের স্ত্রীত্বের মর্যাদা না পেয়ে-ই বৃদ্ধা হয়ে মরে যাবে। কিংবা নাচ-গান শিখিয়ে তাকে বিনোদনের উপকরণে পরিণত করবে। মেয়েটি তার গ্রামের সৈন্যদের কাছে এরূপ মেয়েদের অনেক কাহিনী শুনেছে।

একটি অনুন্নত এলাকার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাদিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে সচেতন সে। প্রথম সাক্ষাতে মাহমুদের মনে স্থান করে নেয়। তারপর যখন বুঝল যে, মাহমুদও তাকে কামনা করতে শুরু করেছে, তখন সে মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, সে বিক্রি হবে না। মেয়েটি জানত, ক্রেতাদের থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন সাদিয়া মাহমুদকে জিজ্ঞেস করে–

'আপনি কি আমাকে কিনে নিতে পারেন না?'

'পারি'–মাহমুদ জবাব দেয়–'কিন্তু আমি যে মূল্য দেব, তা তোমার পিতা গ্রহণ করবেন না।'

'কত মূল্য দেবেন?'

'আমার কাছে দেয়ার মত আমার হৃদয়টা ছাড়া আর কিছুই নেই'–মাহমুদ জবাব দেয়–'জানিনা তোমার হৃদয়ের মূল্য জানা আছে কিনা।'

'আপনার অন্তরে যদি আমার ভালবাসা থাকে, তাহলে এই মূল্য আমার জন্য অনেক বেশী'–সাদিয়া বলল–'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমার পিতা এই মূল্য গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমি একথাও বলে দিব যে, আমার পিতা আমাকে বিক্রি করতে-ই চান না। তার সমস্যা হল, তিনি গরীব এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। আমার কোন ভাই নেই। ক্রেতারা তাকে হুমকি দিয়েছে, তিনি যদি তাদের মূল্য গ্রহণ না করেন, তাহলে তারা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।'

'তোমার পিতা এত মূল্য কেন গ্রহণ করছেন না?'–মাহমুদ জিজ্ঞেস করে–'মেয়েদেরকে বিক্রি করার তো এতদঞ্চলে নিয়ম আছে।'

'আব্বা বলছেন, ওদেরকে মুসলমান বলে মনে হয়নি'–সাদিয়া বলল–'আমিও আব্বাকে বলে দিয়েছি, আমি অমুসলিমদের কাছে যাব না। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমি এখনই যেতে রাজি আছি।'

'আমি প্রস্তুত'– মাহমুদ বলল।

'তাহলে চলুন'–সাদিয়া বলল– 'আজ রাতেই চলুন।'

'না'—মাহমুদ বলে ফেলল—'আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন না করে যেতে পারব না।'

'কী কর্তব্য?'—সাদিয়া জিজ্ঞেস করে।

মাহমুদ বিন আহমদ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সাদিয়াকে বলা সম্ভব নয় যে, তার কর্তব্য কী। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাদিয়া ছাড়বার পাত্রী নয়। মাহমুদের হঠাৎ স্মরণ এসে যায়। বলল, 'আমি ইমামের কাছে ধর্মশিক্ষা নিতে এসেছি; তা সম্পন্ন না করে যাব না।'

'ততদিন জানিনা আমি কোথায় চলে যাব!'—হতাশ কণ্ঠে বলল সাদিয়া।

মাহমুদ বিন আহমদ নিজের কর্তব্যের উপর একটি মেয়েকে প্রাধান্য দিতে পারেনি। তার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, এই মেয়েটি দুশমনের চরও তো হতে পারে যে, আমাকে বেকার করে দেয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে! মাহমুদ মেয়েটিকে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন অনুভব করে।

✿ ✿ ✿

সুলতান আইউবীর বাহিনীর অবস্থান কায়রো থেকে আট-দশ মাইল দূরে। তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল যে, এই বাহিনী উত্তেজিত এবং মিসরের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। সুলতান আইউবী সেখানে-ই ছাউনী ফেলার নির্দেশ দেন এবং নিজে সৈন্যদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করেন। তিনি নিজে সৈন্যদের জযবা যাচাই করে দেখতে চান। তিনি একজন অশ্বারোহী সৈন্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সঙ্গে আরো কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁর চতুর্পার্শ্বে ভীড় জমায়। তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করেন এবং স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলতে শুরু করেন। হঠাৎ এক সিপাহী মুখ খুলল। 'গোস্তাগী মাফ করুন সালারে আজম! এখানে ছাউনী ফেলার প্রয়োজন তো ছিল না। আমরা তো সন্ধ্যা নাগাদ-ই কায়রো পৌঁছে যেতে পারতাম!'

'তোমরা দীর্ঘদিন লড়াই করে এসেছ'—সুলতান আইউবী বললেন—'আমি তোমাদেরকে এই খোলা ময়দানে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিতে চাই।'

'আমরা এসেছি লড়াই করতে, যাচ্ছিও লড়াই করতে।'—সিপাহী বলল।

'লড়াই করতে যাচ্ছ?' কিছুই জানেন না এমন ভান ধরে সুলতান বললেন—'আমি তো তোমাদেরকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে!'

'ওরা আমাদের দুশমন'—সিপাহী বলল—'আমাদের বন্ধুরা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে ওরা আমাদের শত্রু।'

'খৃস্টানদের চেয়েও ঘৃণ্য শত্রু'— আরেক সিপাহী বলল।

'কেন সালারে আজম'—কায়রোতে গাদ্দারী ও বিদ্রোহ চলছে, একথা কি

সঠিক নয়?' জিজ্ঞেস করে অন্য এক সিপাহী।

'কিন্তু সমস্যা হয়েছে শুনেছি'–সুলতান আইউবী বললেন– 'আমিও দোষীদের শাস্তি দেব।'

'আপনি সমগ্র বাহিনীকে কী শাস্তি দেবেন?' এক সৈন্য বলল– 'শাস্তি আমরা দেব। আমাদের কমান্ডারগণ আমাদেরকে কায়রোর পুরো ঘটনা শুনিয়েছেন। আমাদের সঙ্গীরা শোবক ও কার্কে শহীদ হয়েছে। কার্ক-শোবকে আমাদের মা-বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। কার্কে তো এখনো হচ্ছে। আমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুনে জ্বলে-পুড়ে শহীদ হয়েছে। আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস কাফেরদের দখলে। আর আমাদের সেনাবাহিনী কিনা কায়রো বসে মৌজ করছে, আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে! যাদের কাছে শহীদের মর্যাদা নেই, নিজ কন্যার মান-সম্ভ্রমের মূল্য নেই, তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। আমরা খবর পেয়েছি, তারা ইসলামের দুশমনের দোস্ত হয়ে গেছে। যতক্ষণ না আমরা গাদ্দারদের মস্তক ছিন্ন করব, ততক্ষণ শহীদদের আত্মা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। আমরা যে জখমী ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আপনি তাদের প্রতি একটু তাকান। তাদের কারো পা নেই, কারো হাত নেই। এরা কি চিরদিনের তরে এই জন্য পঙ্গুত্ববরণ করে নিল যে, আমাদের সাথী-বন্ধুরা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হবে? না, আমরা তা বরদাশত করব না। তাদেরকে আমরা নিজ হাতে শাস্তি দেব।'

দেখতে না দেখতে বিপুল সৈন্য সুলতান আইউবীর চারদিকে এসে জড়ো হয়। সকলের চোখে প্রতিশোধের আগুন, মুখে প্রতিবাদী ভাষা। সুলতান আইউবী তাদের এই জোশ এই চেতনা অবদমিত করে তাদের মন ভাঙ্গতে চাইছেন না। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার উপদেশ দিলেন– কোন নির্দেশ দিলেন না।

সুলতান নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন। উপদেষ্টা ও নায়েবদের ডেকে এনে বললেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বাহিনী এখানেই অবস্থান করবে। তিনি বললেন–

'আমি চাক্ষুস দেখেছি যে, এই বাহিনী মিসর গেলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। সেনাবাহিনী যদি পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে দুশমন লাভবান হয়। আমি আজ রাতেই কায়রো যাচ্ছি। কেউ যেন টের না পায় যে, আমি এখানে নেই। সৈন্যদের স্পৃহাও দমন করার চেষ্টা করবেন না।'

কতিপয় জরুরী নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন–

'আমাদের কায়রোর যে বাহিনী বিদ্রোহ করতে উদ্যত, আমার দৃষ্টিতে

তারা নির্দোষ। জাতির যে যুবক শ্রেণী মদ-জুয়া ও মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে চলেছে, আমার মতে তাদেরও কোন দোষ নেই। আমাদের প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই ভুল তথ্য দিয়ে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ঐ কর্মকর্তাদেরই ইঙ্গিতে দুশমন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শহরে নগ্নতা ও বিলাসিতার উপকরণ ছড়িয়েছে। দেশের এই নৈতিক অধঃপতন এ কারণেই বিস্তার লাভ করার সুযোগ পেয়েছে যে, আমাদের প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল এসব প্রতিহত করা, তারাই এ কাজে মদদ যুগিয়েছে। দুশমন তাদেরকে ভাতা দিচ্ছে। যখনই কোন জাতির রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হয়, তখন সেই জাতির পরিণতি এমনই নয়। আমাদের একদল সৈন্য সুদানের মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে না খেয়ে লড়ছে, মরছে আর প্রশাসন তাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে বসে আছে। এসব কি দুশমনের ষড়যন্ত্র নয়, যা সফল করে তুলছে আমাদেরই কর্মকর্তারা? আমাদের কোন কোন ভাই মিসরের ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখছে। তারা সর্বাগ্রে সেনাবাহিনীকে জনগণের চোখে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, যাতে ক্ষমতা দখল করে তারা ইচ্ছেমত শাসন করতে পারে। আমার বন্ধুগণ! আমার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোন খায়েশ নেই। আমার বিরুদ্ধবাদীদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে, তাহলে আমি তার বাহিনীতে একজন সাধারণ সিপাহী হয়ে কাজ করব। কিন্তু এমন লোকটি কে? ওরা অবশিষ্ট জীবন রাজা হয়ে কাটাতে চায়। তার জন্য দুশমনের হাতে হাত মিলাতে হলেও তারা প্রস্তুত। আর আমি আমার জীবদ্দশায়ই জাতিকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করতে চাই, যেখানে তারা তাদের দ্বীনের দুশমনের মাথায় পা রেখে রাজত্ব করবে। আমাদের ঐসব লোভী ও গাদ্দার শাসকদের দৃষ্টি বর্তমানের উপর। আর আমার নজর জাতির ভবিষ্যতের প্রতি।'

সুলতান আইউবী বলতে বলতে থেমে যান। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'এক্ষুণি আমার ঘোড়া প্রস্তুত কর।' তিনি যাদেরকে সঙ্গে নেবেন, তাদের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'চুপিচুপি এদেরকে ডেকে আন এবং বলে দাও তাদের কায়রো যেতে হবে। আমার তাঁবু এখানে এভাবেই থাকবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, আমি এখানে নেই।'

সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলছি, মিসরের যে বাহিনী বিদ্রোহ করতে চাচ্ছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাব না। তোমরা কেউ তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। আমি এ্যাকশন নেব তাদের বিরুদ্ধে, যারা সেনাবাহিনী ও দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত

ও অপদস্ত করার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের এই বাহিনীই যখন দুশমনের মুখোমুখি হবে এবং দুশমন তীর ছুঁড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে, তখন তাদের স্মরণ এসে যাবে যে, তারা আল্লাহর সৈনিক। তখন তাদের মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বেরিয়ে যাবে। আপনারা যখন নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাদের দ্বীনের দুশমনকে দেখিয়ে দেবেন, তখন তাদের চিন্তা-চেতনা আপনা-আপনিই জুয়া থেকে সরে গিয়ে জিহাদমুখী হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি, ইসলাম ও ইসলামী সালতানাতের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা সেনাবাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়। খৃস্টান ও ইহুদীদের প্রত্যয়, তাদের যুদ্ধরীতি ও গোপন তৎপরতার আলোকে আমি বলে দিতে পারি যে, তারা আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চায়। কোন মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। আমাদের আজকের ভুল পদক্ষেপ ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেবে। আমি বলতে পারি না, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের বিচ্যুতি, ব্যর্থতা ও সফলতা থেকে লাভবান হতে পারবে কিনা।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের!'– এক উপদেষ্টা বলল– 'আমাদের ভাইয়েরা যদি গাদ্দারীর বিদ্যায়-ই পান্ডিত্য অর্জন করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়েই থাকতে বাধ্য হবে। তারা জানবেই না, আযাদী কাকে বলে এবং জাতীয় মর্যাদাইবা কী? আমাদের কাছে কি এর কোন প্রতিকার নেই?'

'জাতির মন-মস্তিষ্ককে সচেতন কর'– সুলতান বললেন– 'জনগণকে প্রজা বল না। দেশের প্রতিটি মানুষই আপন আপন ক্ষেত্রে রাজা। দেশের একজন মানুষকেও জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত কর না। আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাথায় রাজা ও খলীফা হওয়ার ভূত সাওয়ার হয়েছে। তাই তারা জাতিকে প্রজা বানিয়ে তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে ব্যবহার করতে চায়। মনে রেখ, 'জাতি শুধু কতগুলো দেহের সমষ্টিই নয়, যাদেরকে তোমরা পশুপালের ন্যায় হাঁকাতে থাকবে। জাতির মধ্যে মেধা-মস্তিষ্কও আছে। আত্মা আছে। আছে জাতীয় মর্যাদাবোধও। তোমরা জাতির এই গুণগুলোকে শাণিত কর, যাতে তারা নিজেরাই ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে শিখে। সচেতন দেশবাসী যদি অনুভব করে যে, দেশে সালাহুদ্দীন আইউবী অপেক্ষা ভাল ও যোগ্য নেতা আছেন, যিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হবেন, তাহলে যে কেউ আমার পথরোধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বলতে পার যে, সালাহুদ্দীন ! তুমি মসনদ ছেড়ে দাও, আমরা তোমার অপেক্ষা যোগ্য নেতা

পেয়ে গেছি। এমন সচেতনতা ও সাহিসকতা দেশের মানুষের থাকা উচিত। তোমরা দোয়া কর, আমার মধ্যে যেন ফেরাউনী চরিত্র ঢুকে না পড়ে যে, কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বলল আর আমি অমনি জল্লাদ ডেকে তার মাথাটা কেটে ফেললাম। আমার আশংকা, মিল্লাতে ইসলামিয়া এরূপ ফেরাউনদের বলির শিকার হতে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ জাতিকে একদিন প্রজা ও পশুতে পরিণত করা হবে। তখন মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না। থাকলেও থাকবে নামমাত্র। ধর্ম পরিচয়ে তারা মুসলমানই থাকবে, কিন্তু সভ্যতা হবে খৃস্টানদের।'

এমন সময়ে এক মোহাফেজ ভেতরে প্রবেশ করে বলল, ঘোড়া প্রস্তুত। যে তিন-চারজন নায়েব সালারকে তলব করা হয়েছিল, তারাও এসে পড়েছেন। সুলতান আইউবী চারজন মোহাফেজ সঙ্গে নিলেন। অন্যদের বললেন, তোমরা আমার এই শূন্য তাঁবুটি পাহারা দাও। কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, আমি এখানে নেই। যেসব আমলা তার সঙ্গে যাবে, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সাবধানে অমুক স্থানে চলে যাও, আমি যথাসময়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। একজন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েন।

❁ ❁ ❁

অন্ধকার মরুভূমি। দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে চৌদ্দটি ঘোড়া। সুলতান আইউবী ভোরের আলো ফোঁটার আগেই কায়রো পৌঁছুতে চান। আলী বিন সুফিয়ানকে তিনি সঙ্গে রেখেছেন। চৌকিতে সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগ্রত সান্ত্রীরাও টের পায়নি যে, তাদের সালার বেরিয়ে গেছেন। আর কায়রোবাসীদের তো কল্পনায়ও নেই যে, তাদের সুলতান এই মুহূর্তে কায়রো ঢুকে যেতে পারেন।

রাতের শেষ প্রহর। সুলতান আইউবীর কাফেলা কায়রোতে প্রবেশ করে। তাদের কোন সান্ত্রীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল না। কোন সান্ত্রী ছিলও না সেখানে। সুলতান তার সঙ্গীদের বললেন, 'এ হল, বিদ্রোহের প্রথম ধাপ। শহরে কোন প্রহরী নেই। বাহিনী ঘুমিয়ে আছে- বেপরোয়া, উদাসীন। অথচ দু'টি ময়দানে আমাদের যুদ্ধ চলছে। দুশমনের হামলার আশংকা আছে প্রতি মুহূর্তে।'

গন্তব্যে পৌঁছে যান সুলতান আইউবী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি মিসরের অস্থায়ী সেনা প্রধানকে তলব করেন। আল-ইদরীসকেও ডেকে পাঠালেন। সেনাপ্রধান সুলতান আইউবীকে দেখে ভয় পেয়ে যান। সুলতান আল-ইদরীসের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। আল-ইদরীস বললেন, 'আমার ছেলেরা যদি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হত, তাহলে আমি আনন্দ পেতাম। কিন্তু আফসোস, ওরা নিহত হল প্রতারণার শিকার হয়ে।' তিনি বললেন, 'এখন

পুত্রদের বিরহে মাতম করার সময় নয়। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অন্য উদ্দেশ্যে তলব করেছেন। বলুন, হুকুম কী?'

ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলমান। সুলতান আইউবী তাদের দু'জনের নিকট থেকে কায়রোর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের দৃষ্টিতে প্রশাসনের কোন্ কোন্ কর্মকর্তা সন্দেহভাজন। তিনি বিশেষ করে সেনা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা সুলতান আইউবীকে কয়েকটি নাম বলেন। তিনি নির্দেশ দিতে শুরু করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হল, সন্দেহভাজন কর্মকর্তাগণ কায়রোয় কেন্দ্রীয় দফতরেই অবস্থান করবে এবং সকল সৈন্যকে সূর্যোদয়ের আগে আগেই অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী একটি পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আলী বিন সুফিয়ানকেও কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেনাক্যাম্পে তোলপাড়া শুরু হয়ে যায়। সৈন্যদেরকে সময়ের আগেই জাগিয়ে তোলা হল। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সন্দেহভাজন কর্মকর্তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর হেডকোয়ার্টারে ডেকে নেয়া হয়। তারা ভেবে বিস্মিত যে, এ সব কী হয়ে গেল! তারা শুধু এতটুকু জানতে পেরেছেন যে, সুলতান আইউবী এসে পড়েছেন। তারা সুলতানের ঘোড়াও দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখেননি। সুলতানও এসে পরিকল্পনামাফিক নিজেকে তাদের থেকে গোপন রেখেছেন।

ভোরের আলো এখনো ফোটেনি। সৈন্যরা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। পদাতিক ও আরোহীদের সারির পেছনে রসদ ও অন্যান্য সামানপত্রে বোঝাই উটের বহর। সুলতান আইউবী দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, কখনো তাৎক্ষণিক নির্দেশ পেলে যেন এক ঘন্টার মধ্যে রসদ ও অন্যান্য সামানসহ প্রস্তুত হয়ে যায়। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল এখানেও। বাহিনী রাত শেষ হওয়ার আগেই রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুলতান আইউবী ঘোড়ায় আরোহন করেন। মিসরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানও তাঁর সঙ্গে। সুলতান সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান বাহিনীর প্রতি চোখ বুলান এবং একটি সারির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করেন। মুখে তার হাসি হাসি ভাব। তিনি বলছেন, 'শাবাশ! শাবাশ! ইসলামের বীর সেনানীরা! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই অবনত। সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে আছে তাদের মহান সেনাপতির মুখের প্রতি। সেই সঙ্গে তাঁর মুচকি হাসি আর প্রশংসামূলক উক্তি সৈন্যদের আরো প্রভাবিত, আরো

উজ্জীবিত করে তোলে। মিসরের গবর্নর ও সালারে আজমের সাধারণ সৈন্যদের এতটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়াই ছিল যথেষ্ট।

সমগ্র বাহিনী পরিদর্শন করে এবার সুলতান আইউবী সেনাদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন–

'আল্লাহর নামে জীবনদানকারী মুজাহিদগণ! তোমরা শোবকের দুর্ভেদ্য দুর্গ– যা ছিল কুফরের সবচেয়ে নিরাপদ আস্তানা– বালির স্তূপ মনে করে গুড়িয়ে দিয়েছিলে। তোমরা খৃস্টানদেরকে মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত করে হত্যা করেছিলে এবং অনেকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে নিয়েছ। তোমাদের সঙ্গীরা, তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। তোমরা তাদের লাশ নিজ হাতে দাফন করেছ। তোমরা সেই কমান্ডো শহীদদের কথা স্মরণ কর, যারা দুশমনের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছে। তোমরা তাদের জানাযা পড়তে পারনি, দাফন করতে পারনি। এমনকি তাদের মৃতদেহটা পর্যন্ত তোমরা এক নজর দেখতে পারনি। দুশমন তাদের লাশের সঙ্গে কী আচরণ করেছে, তা তোমরা জান। তোমরা শহীদদের বিধবা স্ত্রী ও এতীম সন্তানদের কথা স্মরণ কর, যাদের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আল্লাহর নামে কোরবান হয়ে গেছে। আজ শহীদদের আত্মা তোমাদের ডাকছে। তোমাদের আত্মমর্যাদা ও পৌরুষকে চীৎকার করে আহ্বান করছে। দুশমন কার্ক দুর্গকে এত দুর্ভেদ্য ও মজবুত করে তুলেছে যে, তোমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুন ভেদ করে প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে...।

'ইসলামের মর্যাদার প্রহরীগণ! কার্ক দুর্গে তোমাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃদ্ধদেরকে পশুর ন্যায় খাটান হচ্ছে। যুবকদেরকে বন্দীশালায় আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে আমি খৃস্টানদের পাথরের কেল্লা ভেঙ্গে চুরমার করেছিলাম, সেই আমি মাটির দুর্গ জয় করতে পারলাম না। আমার শক্তি তোমরা। আমার ব্যর্থতা তোমাদেরই ব্যর্থতা।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠস্বর আরো উঁচু হয়ে যায়। তিনি দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন–

'তোমরা আমার বুকটা তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা করে দাও। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার জীবন হরণ করার আগে আমাকে অবশ্যই এ সুসংবাদ শোনাতে হবে যে, তোমরা কার্ক দুর্গ জয় করে নিয়েছ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোন-কন্যাদের উদ্ধার করেছ।'

তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, সুলতান আইউবীর ভাষণ মুসলিম সৈনিকদের অন্তরে তীরের ন্যায় গেঁথে যাচ্ছিল। তাদের চেহারা

রক্তিম হয়ে ওঠে এবং তারা আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাদের হৃদয় থেকে বিদ্রোহের আগুন নিভে যেতে শুরু করে। সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

সালতানাতে ইসলামিয়ার মুহাফিজগণ! তোমাদের তরবারীগুলো ভোতা করে দেয়ার জন্য খৃস্টানরা তাদের মেয়েদের ইজ্জত ও হাশীশ ব্যবহার করছে। তোমরা হয়ত জান না, খৃস্টানরা তাদের একটি মেয়ের ইজ্জত বিলিয়ে এক হাজার মুজাহিদকে বেকার করে তুলছে। একটি মেয়েকে দিয়ে আমাদের হাজার মেয়ের চরিত্র নষ্ট করছে। তারা তোমাদের মাঝে একটি চরিত্রহীনা মেয়ে ঢুকিয়ে আমাদের হাজার হাজার মেয়ের চরিত্র বিনষ্ট করছে। তোমরা যাও, আপন বোন-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষা কর। তোমরা সেই কার্ক অভিমুখে রওনা হচ্ছ, যেখানে পবিত্র কুরআনের পাতা ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে ও কাফিরদের পায়ে দলিত হচ্ছে। যেখানে তোমাদের মসজিদগুলো খৃস্টানদের শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। যে খৃস্টানরা তোমাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত, ওখানে তারা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছে। শোবক তোমরা জয় করেছিলে; কার্কও তোমাদের-ই জয় করতে হবে।'

সুলতান আইউবী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তিনি কারো ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের ইঙ্গিতও করেননি। তার স্থলে তিনি বাহিনীর চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধকে উত্তেজিত করে তোলেন, যার ফলে যে বাহিনী এতক্ষণ এই ভেবে বিস্মিত ছিল যে, এত সাত সকালে কেন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হল, এখন তাদের বিস্ময়ের কারণ হল, কেন আমাদেরকে এক্ষুণি কার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে না!

সুলতান আইউবীর ভাষণের পর সমস্ত বাহিনী এখন উত্তেজিত। তিনি ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কমান্ডারদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তিনি তাদেরকে রওনা হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাহিনীকে যে পথে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন, সেটি সেই রাস্তা থেকে অনেক দূরে, যে পথে রণাঙ্গনের বাহিনী ফিরে আসছে। সুলতান আইউবী যে কমান্ডারদেরকে কার্ক থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকেও রওনাকারী বাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি আগেই গোপনে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। বাহিনী যখন রওনা হওয়ার নির্দেশ পায়, তখন সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনিতে কায়রোর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। আবেগের অতিশয্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে সুলতান আইউবীর মুখমণ্ডল।

বাহিনী যখন সুলতান আইউবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তখন তিনি

একজন দূতকে পয়গাম দিয়ে সেই ছাউনীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন, যেখানে রণাঙ্গন থেকে আগত বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। দূতকে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয়। বার্তা হল, পয়গাম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করাও।

পথের দূরত্ব ছিল আট-দশ মাইল। দূত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তৎক্ষণাৎ বাহিনী রওনা হওয়ার নির্দেশ পায়। সূর্যাস্তের পর বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিট কায়রোতে ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ে অন্যান্য ইউনিটও। তাদেরকে থাকার জন্য সেই স্থান দেয়া হয়, যেখানে গতরাত পর্যন্ত কার্কের উদ্দেশ্যে রওনাকারী বাহিনী অবস্থান করছিল। কমান্ডাররা সৈন্যদেরকে অবহিত করে যে, এখানকার বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা ছিল ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। আলী বিন সুফিয়ান এদেরকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবী পরম বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্রোহের আশংকাও দূর করে দেন এবং গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও নিঃশেষ করে দেন। তিনি ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ও সেসব সেনা কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠান, যারা সীমান্ত বাহিনীগুলোর জিম্মাদার। সীমান্তে কত সৈন্য আছে এবং কোন্ কোন্ স্থানে আছে জেনে নিয়ে তিনি সে পরিমাণ সৈন্য সকাল সকাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সুলতানকে অবহিত করা হয়েছিল যে, সীমান্ত বাহিনীগুলো দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য ও সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র বাইরে পাচার করার ব্যাপারে দুশমনের সহযোগিতা করছে। সুলতান আইউবী এই বাহিনীগুলোর কমান্ডারকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সীমান্ত থেকে প্রত্যাহৃত বাহিনীগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দেন, যেন তাদেরকে ওখান থেকেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

❁ ❁ ❁

সাদিয়া দু'বেলা মসজিদে ইমামকে খাবার দিয়ে যায়। মাহমুদ বিন আহমদ শিষ্য পরিচয় নিয়ে ইমামের নিকট থেকে ধর্মশিক্ষা অর্জন করছে। সাদিয়া যে চারণভূমিতে বকরি চরায়, মাঝে-মধ্যে সেখানেও যাওয়া-আসা করে সে। ওখানে টিলা আছে। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। পানির অভাব নেই। এলাকাটা লোকালয় থেকে খানিক দূরে।

সাদিয়া মাহমুদকে নিজের মোহাফেজ ভাবতে শুরু করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মাহমুদ তাকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করবে-ই। কিন্তু মাহমুদ এখন-ই তাকে নিজ গ্রামে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। সাদিয়া মাহমুদকে এমনও বলে যে, তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে রেখে এস, তারপর

বিদ্যা অর্জন কর। মাহমুদ তাকে বলতে পারছে না যে, তার বাড়ি মিসরের অন্য প্রান্তে, যেখানে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।

মাহমুদ তার অভিজ্ঞতা বলে বুঝে ফেলেছে, সাদিয়া দুশমনের ক্রীড়নক নয়। কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক না হলেও আরো আগেই মাহমুদ মেয়েটিকে এলাকায় নিয়ে যেত। তাছাড়া মসজিদের ইমাম তারই বিভাগের একজন অফিসার, যার উপস্থিতিতে সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। ইমাম তাকে এ-ও বলেছিলেন যে, তুমি আমার সঙ্গে-ই থাক। মাহমুদের দৃষ্টিতে এটি তার প্রতি তার অফিসারের নির্দেশ।

একদিন হঠাৎ গ্রামে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। কিছু অপরিচিত লোকের চেহারা চোখে পড়তে শুরু করে। সকলের মুখে এক-ই কথা–তিনি আসছেন। তিনি আকাশ থেকে এসেছেন। মৃতকে জীবন দানকারী আসছেন...।

আজ গ্রামের প্রতিটি মানুষ বেজায় খুশি। তারা বলছে, তাদের উদ্দেশ্য পূরণকারী আসছেন।

সাদিয়া দৌঁড়ে আসে। মাহমুদ বিন আহমদকে বলে, শুনেছ, তিনি আসছেন। তুমি কি জান, আজ আমি তার কাছে কি চাইব? আমি তাকে বলব, মাহমুদ যেন আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়। তারপর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

মাহমুদ কোন জবাব দিতে পারল না। এখনও সেই রহস্যময় লোকটিকে দেখেনি সে। মাহমুদের ডিউটি এলাকায় এই প্রথমবার-ই আসছেন তিনি। তার কেরামতের কাহিনী এ এলাকার মানুষ শুনেই আসছে শুধু।

মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অপরিচিত লোকদের মধ্যে তার দু'জন গোয়েন্দা সহকর্মী দেখতে পায়। তাদের কর্মস্থল অন্য এলাকা। মাহমুদ তাদেরকে এখানে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে, আমরা গায়েবজানা লোকটিকে দেখতে এসেছি। তবে তারা এসেছে গুপ্তচর হিসেবে নয়। তারা লোকটির দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত। তারা কোথাও লোকটির কারামত দেখেছে। সেই কাহিনী তারা মাহমুদের কাছে এমনভাবে বিবৃত করে, যেন এতে তাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাদের বিবরণে মাহমুদও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মাহমুদের এ দু'সহকর্মী গায়েবজানা লোকটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। মাহমুদ ভাবে, আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা যার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারে না।

সাদিয়া যেখানে উট-বকরী চরানোর বাহানা দেখিয়ে মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হত, মাহমুদ সেই সবুজঢাকা এলাকায় চলে যায়। কিন্তু এখন সেখানে ভিন্ন পরিবেশ। দু'ব্যক্তি দূরে থাকতেই তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে, খোদার

প্রেরিত পয়গাম্বর আসছেন। এ জায়গা তার জন্য পরিস্কার করা হচ্ছে। তিনি এখানে অবস্থান করবেন।

মাহমুদ দূর থেকে তাকিয়ে দেখে, টিলার ভিতরে গুহামত কি যেন তৈরী করা হচ্ছে এবং জায়গাটা সমতল করা হচ্ছে। এখন সেখানে কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। গ্রামের মানুষ কাজ-কর্ম ত্যাগ করে সেদিকে ছুটছে আর নির্দিষ্ট স্থানে এসে জড়ো হচ্ছে। জায়গাটা পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পালাক্রমে এসে এসে জনতাকে আগন্তুকের অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছে। মানুষ আনন্দিত ও অভিভূত হচ্ছে।

রাতেও মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটির প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের অবস্থা এই যে, সেদিন তারা মসজিদে যাওয়ার কথাও ভুলে যায়। পরদিন ভোর হতে না হতে-ই মানুষ আবার সেখানে সমবেত হতে শুরু করে। রাতে আপরিচিত লোকদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তারা সেখানে গর্তও খনন করছিল। তাদের সঙ্গে কয়েকটি উটও আছে, যেগুলো মালামাল দ্বারা বোঝাইকরা। মালপত্র নামানোর কাজ শুরু হয়। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো তাঁবু বেরিয়ে এল। তারা তাঁবুগুলো স্থাপন করতে শুরু করে।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। তারপর রাত। অন্ধকার রাত। 'তিনি' অন্ধকার রাত ছাড়া মানুষকে সাক্ষাৎ দেন না। সন্ধ্যার পরও মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উৎসুক জনতার একধারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো মেয়ে। তাদের মধ্যে আছে সাদিয়াও।

মেহমানদের জন্য যে জায়গাটা পরিস্কার করা হচ্ছিল, সেখানে প্রদীপ জ্বলছে। সাদিয়া যে মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, দু'জন লোক তাদের পিছনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েগুলো তাদের দেখেনি। সম্মুখে আছে তিন-চারজন। এরা অপরিচিত। মেয়েদের কাছে এসে তারা বলে উঠে, এই ,তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তারা মেয়েগুলোকে সরাবার জন্য তাড়া দেয়। মেয়েরা ছুটে পালাতে উদ্যত হয় এবং এক একজন এক একদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একজন পিছন থেকে সাদিয়ার গায়ের উপর কম্বল ছুড়ে মারে। শক্ত দু'টি বাহু দ্বারা তার কোমর ঝাপটে ধরে। তারপর কম্বল পেছানো অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে। এক তো অন্ধকার। দ্বিতীয়ত সঙ্গী মেয়েরা যার যার মত পালিয়ে গেছে। তাই সাদিয়ার অপহরণ ঘটনা দেখেনি কেউ।

পরদিন ভোরবেলা। চারণভূমি অভিমুখে মানুষের ঢল নেমেছে যেন। জনতার বিশাল এক মিছিল এগিয়ে চলছে চারণভূমির দিকে। মিছিলের সম্মুখে ষোল-সতেরটি উট। প্রতিটি উটের উপর একটি করে পালকি। প্রতিটি পাল্কি পর্দা দ্বারা ঢাকা। তার কোন একটিতে 'তিনি' উপবিষ্ট। সামনে বাজছে দফ ও সানাই। দফ-সানাইয়ের বাজনার তালে গুনগুন করে কি যেন গাইছে কিছু

মানুষ। উটগুলোর ঘাড়ে ঝুলন্ত বড় বড় ঘন্টার আওয়াজ সেই বাজনার-ই অংশ বলে মনে হচ্ছে। জনতার এত বিপুল সমাগম, কিন্তু কোন হৈ হুল্লোড়, চেচামেচি নেই। নিঝুম-নীরব এগিয়ে চলছে সকলে। এটি মুরীদ ও ভক্তদের মিছিল। এরা কোথা কোথা থেকে 'পীর সাহেব'-এর পিছনে পিছনে হেঁটে চলছে। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেন পালকি বহনকারী উটটি আকাশ থেকে অবতরণ করছে।

কাফেলাটি সবুজ-শোভিত জায়গায় চলে যায়। এলাকাটা চারদিক থেকে টিলায় ঘেরা। একস্থানে অনেকগুলো তাঁবু বসানো আছে পূর্ব থেকেই। তন্মধ্যে একটি তাঁবু বেশ বড়। উৎসুক জনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে কেউ দেখতে পেল না পাল্‌কি থেকে কে নামল আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তদের ভীড় দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে পড়ে। সাদিয়ার গ্রামের মানুষ তাদের থেকে 'পবিত্র মানুষ'টির গল্প-কাহিনী শুনতে থাকে। মানুষ যত গোঁয়ার, পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, আজগুবি কল্প-কাহিনীর প্রতি তত দুর্বল হয়। সেই পরিবেশ-ই বিরাজ করছে এখন এখানে।

এ দৃশ্য অবলোকন করছেন ইমামও। দেখছে মাহমুদ বিন আহমদও। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে মাহমুদ। কায়রো থেকে তার এবং তার সহকর্মীদের কাছে নির্দেশ এসেছে, সীমান্ত এলাকায় নতুন এক বিশ্বাসের বিস্তার ঘটছে। সে সম্পর্কে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট দাও, সেসমস্ত আসলে কী এবং কারা তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কায়রো এখনো এ ব্যাপারে কোন তথ্য পায়নি। তার কারণ, রহস্যময় লোকটি এ-যাবত যে ক'টি এলাকায় গমন করেছে, সেসব এলাকার গুপ্তচররাও তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেছে। তারা তার বিপক্ষে কোন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোও তার প্রভাবে প্রভাবিত। পালা এবার ইমামের। তিনি যাচাই করে দেখবেন, এসব আসলে কী? ভাওতা? ভন্ডামী? বুযুর্গী? তিনি লক্ষ করছেন, মানুষ শুধু তার গল্প শুনে এত-ই প্রভাবিত হয়ে পড়ছে যে, তারা মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। লোকটাকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে।

ইমাম ও মাহমুদ একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদিয়ার পিতা এসে তাদের সামনে দাঁড়ান। অস্থিরচিত্তে বললেন, সাদিয়া রাত থেকে নিখোঁজ। তার সঙ্গী মেয়েরা বলছে, রাতে তারা এখানে কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কয়েকজন লোক এসে তাদেরকে সম্মুখ থেকে তাড়া দেয় এবং চলে যেতে বলে। ভয়ে তারা এদিক-সেদিক দৌড় দেয়। এক মেয়ে বলল, সে তাদের পিছনে দু'টি লোক দেখেছিল। তারপর কী হয়েছে কেউ বলতে পারেনা।

সাদিয়ার পিতা সাদিয়ার সন্ধানে নেমে পড়ে। মাহমুদও তার সঙ্গ নেয়।

এখানে কোথায় পাওয়া যাবে সাদিয়াকে! তারপরও পিতার মন! বেচারা অস্থিরমনে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। মাহমুদও তার সঙ্গে ঘুরছে। হঠাৎ অপরিচিত এক ব্যক্তি তাদেরকে থামতে বলে। তারা থেমে যায়। লোকটি জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি কাউকে খুঁজছ? সাদিয়ার পিতা বললেন, হ্যাঁ, গত রাতে আমার একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এই একটু আগেই কে যেন আমাকে বলল, তুমি তার বাপ। অপরিচিত লোকটি সাদিয়ার গঠন-আকৃতির বিবরণ দিয়ে বলল- 'তুমি মেয়েটিকে এখানে খুঁজে পাবেনা। এতক্ষণে সে মিসরের সীমানা পার হয়ে অনেক দূর চলে গেছে হয়ত। গতকাল সন্ধ্যায় আমি একটি ঘোড়া দেখেছিলাম। একটি অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে তার সঙ্গী মেয়েদের থেকে সরে ঘোড়াটির কাছে চলে যায়। আরোহী ঘোড়ার কাছেই দাঁড়ানো ছিল। মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলে। আরোহী ঘোড়ায় চড়ে কয়েক পা সরে আড়ালে চলে যায়। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার পিছনে পিছনে চলে যায়। নিকটে গিয়ে সে নিজেই আরোহীর সামনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ কে একজন আমাকে বলল, মেয়েটি তোমার কন্যা। এখন আর ওকে তালাশ করে লাভ নেই।

সাদিয়ার পিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মাহমুদ ভাবে ভিন্ন কিছু। সে গোয়েন্দা । তার বিশ্বাস, লোকটি জ্বলন্ত মিথ্যা কথা বলছে। তার বক্তব্যের আগাগোড়া পুরোটাই অসত্য। ঘটনাটা দেখেছে যখন সে একা, তাহলে অন্য কেউ কি করে তাকে বলল, মেয়েটি কার কন্যা? গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, কারো কথা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে না এবং প্রথম প্রথম যে কাউকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

মাহমুদ অপরিচিত এই লোকটির পিছু নেয়, লোকটি ভীড়ের মধ্যদিয়ে টিলার পিছনে চলে যায় এবং অসংখ্য তাঁবুর কোন একটির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এসব তাঁবুর-ই কোন একটিতে আছে এবং তার অপহরণে এই লোকটির হাত আছে। লোকটি সাদিয়ার সেই কাষ্টমারদেরও একজন হতে পারে, যারা এক পর্যায়ে সাদিয়ার পিতাকে মেয়ের অপহরণের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সাদিয়ার পিতা লোকটাকে চিনেনি। সাদিয়ার পিতা যাতে মেয়েকে খুঁজে না বেড়ায়, সেজন্য লোকটি তাকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

মাহমুদ ইবনে আহমদ গভীরভাবে ভালবাসে সাদিয়াকে। সে মেয়েটিকে উদ্ধার করার প্রত্যয় নেয়। মসজিদে গিয়ে ইমামকে বিষয়টি অবহিত করে। ইমাম গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিচক্ষণ কর্মকর্তা। তিনিও অভিমত ব্যক্ত

করেন যে, এই গরীব লোকটিকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। মাহমুদ এলাকায় অবস্থানকারী দু'গোয়েন্দার কথা উল্লেখ করে বলে, আমি সাদিয়াকে উদ্ধার করব; এ-কাজে আমার ওদের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। এ মুহূর্তে টিলার অভ্যন্তরে যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

❁ ❁ ❁

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী তার বাহিনীকে কার্ক অবরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং কিভাবে দুর্গ ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা যায় ভাবতে থাকেন। তিনি প্রথম দিন-ই তাঁর কমান্ডারকে বলে দেন, যে দুর্গ সালাহুদ্দীন আইউবী জয় করতে পারেননি, তা তোমরাও সহজে পদানত করতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী তো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর মত মানুষ।

সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীকে অবহিত করে গেছেন যে, তিনি দুর্গজয়ে কি কি পন্থা প্রয়োগ করেছেন। দুর্গের অভ্যন্তরে কি কি আছে, তাও তিনি জঙ্গীকে জানিয়ে গেছেন। খৃষ্টানদের রসদ কোথায়, পশুপাল কোথায়, জনবসতি কোন্ দিকে সব-ই তিনি জঙ্গীকে জানিয়ে গেছেন। তিনি গোয়েন্দা মারফত এসব তথ্য জেনেছিলেন। তিনি ভিতরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মিনজানীক ছোট হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তার বিপরীতে খৃষ্টানদের কাছে আছে বড় বড় কামান, যার গোলা বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আইউবীর মিনজানীকের পাল্লা কম। এ কারণে দুর্গের ফটকেও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন দিক থেকে মুজাহিদরা প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করলে উপর থেকে খৃষ্টানরা জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারের ড্রাম গড়িয়ে ছেড়ে দেয়।

নুরুদ্দীন জঙ্গী তার নায়েবদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বললেন-

'সালাহুদ্দীন আইউবী আমাকে বলেছিলেন, তিনি বড় মিনজানীক তৈরি করিয়ে ভিতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা হল, ভিতরে মুসলমান বসতিও আছে। তিনি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন না, যাতে একজন মুসলমানেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু আমি আইউবীর চিন্তাধারার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি এত বড় মিনজানীক তৈরি করার ব্যবস্থা করেছি, যার দ্বারা নিক্ষিপ্ত আগুন ও ভারী পাথর বহু দূর গিয়ে পতিত হবে। তাতে ভিতরে দু'একজন মুসলমানের ক্ষতি হলেও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা যদি কার্কের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা জানতে, তাহলে বলতে, ওদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। ওখানে একজন মুসলমানেরও ইজ্জত নিরাপদ নয়। মুসলিম মেয়েরদের খৃষ্টানদের বিছানায় রাতযাপন করতে হচ্ছে। পুরুষরা বন্দীদশায় বেগার

খাটছে। তারা হয়ত এ দুআ-ই করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও। আমাদের অবরোধ যত দীর্ঘ হবে, তাদের দুর্দশাও তত দীর্ঘতর হতে থাকবে। তাছাড়া আমাদের এ অভিযানে মুসলমানদের ক্ষতি হলেও ক'জনের আর হবে। যতটুক হবে, সে কোরবানী আমাদের দিতে-ই হবে। আপনারাও তো মরবার জন্যই এসেছেন। ইসলামকে জিন্দা রাখতে হলে কিছু জীবন হারাতে-ই হবে। আমি বিষয়টা আপনাদেরকে এজন্য অবহিত করলাম, যেন আপনারা কেউ আমার উপর এই অভিযোগ আরোপ করতে না পারেন যে, আমি একটি দুর্গ জয় করার জন্য নিরপরাধ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মেরেছি।'

'না, আমরা কেউ তেমনটা ভাবব না'– এক সালার বললেন– 'এখানে আমরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে আসিনি। ফিলিস্তীন মুসলমানদের। আমরা এখানে আমাদের রাসূলের বাদশাহী বহাল করতে এসেছি। প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস আমাদের– ইহুদী-খৃষ্টানদের নয়।'

'আমরা ইহুদীদের এ দাবিও সমর্থন করি না যে, ফিলিস্তীন ইহুদীদের আদি জন্মভূমি'– অন্য একজন বললেন– 'আমরা প্রত্যেকে আগুনে পুড়ে মৃতবরণ করতে প্রস্তুত আছি। আমরা এ যুদ্ধজয়ে আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকেও কোরবান করতে কুণ্ঠাবোধ করব না।'

সুলতান নুরুউদ্দীন জঙ্গী দু'ঠোটে মুচকি হাসি টেনে বললেন-

'আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ফিলিস্তীনকে নিজেদের আবাসভূমিতে পরিণত করার জন্য ইহুদীরা কোন্ কোন্ ময়দানে লড়াই করছে। তারা তাদের ধন- সম্পদ ও বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে এসং তাদের দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। তারা তাদের সম্পদ ও মেয়েদের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করছে। তাদের প্রধান টার্গেট সালাহুদ্দীন আইউবী ও মিসর। মিসরের বড় বড় শহরগুলোতে দুশ্চরিত্রা নারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এরা সবাই ইহুদী কন্যা। দুঃখজনক সত্য হল, আমাদের মুসলিম নেতৃবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা ইহুদীদের জালে আটকে গেছে। এবার কাফেররা তাদেরকে আপসে সংঘাতে লিপ্ত করবে। যদি আমাদের হুঁশ ফিরে না আসে, তাহলে ইহুদীরা একদিন না একদিন ফিলিস্তীনকে কব্জা করে নিবেই। আর মুসলমানরা বুঝতেও পারবে না যে, তাদের সেই পারস্পারিক দ্বন্ধের পিছনে ইহুদী ও খৃষ্টানদের হাত আছে। তা হবে অর্থ, নারী আর মদের প্রতিক্রিয়া, যার প্রভাব ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। আমাদের যদি ভবিষ্যৎ বংশধরকে সম্মানজনক জীবন উপহার দিয়ে যেতে হয়, তবে তার জন্য বর্তমান প্রজন্মের কিছু সন্তানকে কোরবান করতে-ই হবে। আমি আগামী মাসের নতুন

চাঁদ উদিত হওয়ার আগে-ই কার্ক জয় করতে চাই। হোক তা কার্কের ধ্বংস্তূপ, থাকুক তাতে মুসলমানদের ভস্মিভূত লাশ। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারিনা। ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে আমাদের রোম সাগরে ডুবাতেই হবে। এ কাজ আমি আমার জীবদ্দশাতে-ই সম্পন্ন করে যেতে চাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পরে ইসলামের পতাকা গাদ্দার ও ক্রুশ-প্রেমিক মুসলমানদের হাতে চলে যাবে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী একদল কারিগরও সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কারিগরদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা লম্বা লম্বা খেজুরের ডাল কেটে মিনজানীক তৈরি করে। কারিগররা দিন-রাত অবিশ্রাম মিনজানীক তৈরির কাজে ব্যস্ত। তার পাশাপাশি নুরুদ্দীন জঙ্গী ভারী ভারী পাথরেরও স্তূপ তৈরি করে ফেলেন। তাঁর কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর রেখে যাওয়া জ্বালানীও রয়েছে। বিপুল পরিমাণ তরল দাহ্য পদার্থ তিনি সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর আগুনের গোলা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক এ সময়ে মিসর থেকে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনীও এসে পৌঁছে। তাদের সম্পর্কে নুরুদ্দীন জঙ্গীকে জানানো হয়েছিল, তারা বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতান জঙ্গীও তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আভাষও পেলেন না। সুলতান জঙ্গী সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। তিনিও এই বাহিনীকে এক জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন, যেমনটা জ্বালাময়ী ভাষণে উত্তেজিত করে প্রেরণ করেছেন সুলতান আইউবী।

একদিন। সূর্য ডুবে গেছে। খৃষ্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সেনা কমান্ডারগণ দুর্গের ভিতরে বৈঠক করছেন। তাদের কথা-বার্তা প্রমাণ করছে, দুর্গ অবরোধ সম্পর্কে তাদের কোন অস্থিরতা নেই। তারা এ-ও জানে যে, সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন এবং নুরুদ্দীন জঙ্গী এসে তার দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। বৈঠকের দিন সকালে তারা জানতে পারে যে, মিসর থেকে নতুন সৈন্য এসেছে। এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য তাদের এ বৈঠকের আয়োজন।

সবেমাত্র তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনি সময়ে বিস্ফোরণের ন্যায় একটি শব্দ তাদের কানে আসে। ধসেপড়া ইট-পাথরের পতনের শব্দও শুনতে পায়। খৃষ্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারা যে কক্ষে বৈঠক করছিল, তারই সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষের ছাদ ফেটে গেছে। একটি ভারী পাথরের আঘাতে ছাদ ফেটে যাওয়ার শব্দ-ই বিস্ফোরণের মত মনে হয়েছিল। তার-ই সন্নিকটে এসে পড়েছিল আরো একটি পাথর। অবস্থা আশংকাজনক মনে করে খৃষ্টানরা সেখান থেকে সরে যায়। তারা বুঝে ফেলেছে

যে, মুসলমানরা মিনজানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করছে। তারা দুর্গের প্রাচীরের নিকট গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে; কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছু-ই দেখা গেল না।

এটি নুরুদ্দীন জঙ্গীর তৈরিকরা মিনজানীকের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার। নুরুদ্দীন জঙ্গী মধ্যরাতের পর পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। তাতে খৃষ্টানদের প্রধান কার্যালয়ের দু'টি ছাদ ধসে পড়ে এবং কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ফেটে যায়। এই ক্ষয়ক্ষতি তেমন মারাত্মক না হলেও তাতে খৃষ্টানদের মনোবলে ভাটা পড়ে যায়, তাদের মনে ভয় ধরে যায়। দেয়ালের কয়েকটি ফাটল হেডকোয়ার্টারের রক্ষীসেনা ও অন্যান্য আমলাদেরকে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে। ভোর নাগাদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ এক ভয়াবহ সংবাদ হয়ে নগরীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অথচ, মধ্য রাতের পর নুরুদ্দীন জঙ্গীর নতুন উদ্ভাবিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর তা অকার্যকর হয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

সাদিয়া মহল্লার বাইরে যেখানে বকরী চরাত, সে ভূখন্ড এখন এমন এক জনবসতিতে পরিণত হয়েছে, যার চাকচিক্য তথাকার লোকদের চোখে এক স্বর্গীয় পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে। সূর্য অস্ত গেছে বেশ আগে। এখন চারদিক অন্ধকার। উৎসুক জনতা পর্বতময় এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে গেছে। তবে কারো কোন টিলার উপরে ওঠার অনুমতি নেই। একধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে সবাইকে। যে যেখানে বসেছে, সেখান থেকে নড়াচড়া করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাউকে কোন নির্দেশ দেয়া হচ্ছেনা; শুধু 'তার' ভয় দেখানো হচ্ছে যে, কারো কোন আচরণে যদি 'তিনি' রুষ্ট হন, তাহলে সকলের উপর বিপদ নেমে আসবে। সবাই নীরব-নিশ্চুপ বসে আছে। কারো মুখে রা নেই।

জনতার অবস্থানের খানিক দূরে বড় বড় দু'টি পালংক পাতানো। বেশ চমৎকার পালংক। উপরে জাজিম বিছানো। পালংকের পিছনে কতগুলো পর্দা ঝুলছে। পর্দাগুলোর গায়ে চকমক করছে কতগুলো তারকা। এক স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করা আছে কতগুলো প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে-ই তারকাগুলো ঝলমল করছে। পর্দার পেছনে কতগুলো টিলা, যার পাদদেশে গুহা খনন করছে অপরিচিত মানুষগুলো। টিলার পিছনে কতটুকু সমতল ভূমি। সেখানে নানা রংয়ের তাঁবু পাতানো।

পরিবেশ- পরিস্থিতিতে উৎসুক জনতা এত-ই প্রভাবিত যে, তারা পরস্পর কানে-কানেও কথা বলছে না। যে রাতে সাদিয়া অপহৃত হয়েছিল, এটি তার পরের রাত। জনতার সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা পর্দা ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করে। পর্দার তারকাগুলো আকাশের তারকারাজির ন্যায় টিমটিম করছে এবং এমন

বাজনা শোনা যাচ্ছে, যা মানুষ ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করছে বাজনাটি। পার্বত্য এলাকার নীরব রাতে এই বাজনা জনতার অন্তর ভেদ করছে মনে হচ্ছে। এমনও মনে হচ্ছে যে, বাজনার এই তাল জনতার মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে, যা দেখাও যাবে ছোঁয়াও যাবে। ফলে মানুষ বারবার উপরে ও ডানে-বাঁয়ে তাকাতে শুরু করে। কিন্তু তারা কিছু-ই দেখতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর যাদুময় এই বাজনার সঙ্গে যোগ হয় অন্য এক গুঞ্জন। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, বেশকিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একই সুরে গুনগুন করে গান গাইছে। তাতে নারী কণ্ঠও আছে। তার সঙ্গে যখন টিলার সামনে ঝুলন্ত লম্বা পর্দাগুলো দুলতে শুরু করছে, তখন মনে হচ্ছে, যেন রাতের এই পরিবেশের উপর মাদকতা নেমে এসেছে।

উৎসুক জনতা এখন সম্পূর্ণরূপে বিমুগ্ধ, অবচেতন। এমন সময়ে কোথাও থেকে বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠে, 'তিনি এসে পড়েছেন, তিনি আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। তোমরা তোমাদের দেল-দেমাগকে সবরকম ভাবনা-চিন্তা থেকে শূন্য কর। তিনি তোমাদের দেল-দেমাগে খোদার সত্য বাণী অবতারণ করবেন।'

ঝুলন্ত পর্দাগুলো একটু নড়ে উঠে। পর্দার আড়াল থেকে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আকারে-গঠনে তিনি মানুষ বটে, কিন্তু বাজনামুখর, ভীতিপ্রদ ও আলোক-উজ্জ্বল এই পরিবেশে তাকে কোন এক ঊর্ধ্ব জগতের প্রাণী বলে মনে হল। তার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ। রেশমের ন্যায় চিক চিক করছে চুলগুলো। কাজল কালো ভ্রু। গোলগাল পরিপুষ্ট সুদর্শন মুখমণ্ডল। মুখে দীর্ঘ ঘন দাড়ি। গায়ে সবুজ রঙের চোগা, যা পর্দার-ই ন্যায় তারকাখচিত। আলোয় ঝলমল করছে তারকাগুলো। তেমনি চমক বিরাজ করছে লোকটির দু'চোখেও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে প্রভাব বিরাজ করছে লোকটির, যাতে জনতা বিমুগ্ধ, বিমোহিত। পাশাপাশি বাজছে মিউজিক, আরো নানারকম গুনগুন শব্দ। মানুষ পূর্ব থেকেই তার অনুরক্ত। এখন বিস্ময়কর এক পরিবেশে তিনি তাদের চোখের সামনে উপস্থিত। এতক্ষণ জনতা উপবিষ্ট ছিল মাথানত করে। এখন তারা আরো অবনত আরো ভক্তিবিগলিত।

তিনি পর্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'বাহু উপরে মেলে ধরলেন এবং বললেন–

'তোমাদের উপর খোদার রহমত নাযিল হোক, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, শোনবার জন্য কান দিয়েছেন, বুঝবার জন্য মেধা দিয়েছেন ও কথা বলার জন্য জবান দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরই ন্যায় কিছু মানুষ– যাদের চোখ তোমাদেরই

ন্যায়, জবানও তোমাদেরই ন্যায়– তোমাদেরকে গোলামে পরিণত করে খোদার নেয়ামত ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এখন তোমাদের অবস্থা হল, তোমাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না, তোমাদের কান আছে সত্য, কিন্তু তোমরা সত্য কথা শুনতে পাচ্ছ না। তোমাদের বিবেক আছে ঠিক, কিন্তু তা মিথ্যা ও অলীক বোধ-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তোমরা কথা বলতে পার ঠিক, কিন্তু সেই লোকদের বিরুদ্ধে তোমরা একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পার না, যারা তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তারা তোমাদেরকে, তোমাদের উট-ঘোড়া ও তোমাদের যুবক সন্তানদেরকে ক্রয় করে নিয়েছে। তারা তোমাদের যুবক পুত্রদের দিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করাচ্ছে, যেমনি মানুষ লড়াই করায় দু'টি কুকুর দিয়ে। তারা তোমাদের উট ও ঘোড়াগুলোকে তীর-বর্শা দ্বারা ঝাঝরা করিয়ে মেরে ফেলছে। তোমাদের সন্তানদেরকে খুন করিয়ে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করছে। আমি সেই চোখ, যা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমি সেই মস্তিষ্ক, যা বিশ্বমানবতার কল্যাণ নিয়ে ভাবে এবং আমি সেই জবান, যা মানুষকে খোদার বাণী শোনায়। আমি খোদার জবান।'

'আপনি কি অক্ষয় যে, আপনি কোনদিনি মৃত্যুবরণ করবেন না?'– সভার মধ্য থেকে একটি আওয়াজ ভেসে উঠে। সব মানুষ নীরব, নিস্তব্ধ। কেউ কেউ ভয়ও পেয়ে গেছে, লোকটার এতবড় দুঃসাহস যে, তার কথার মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল? এই অপরাধে সকলের উপর গজব নেমে আসবে না তো!

'তুমি পরীক্ষা করে দেখে নাও'– তিনি বললেন-'আমার বুকে তীর নিক্ষেপ কর।'

লোকটির কণ্ঠে ও বলার ভঙ্গীতে যাদুর ক্রিয়া। তিনি আবার বললেন, এখানে যদি কোন তীরান্দাজ থাক, তাহলে আমার বুকে তীর চালাও। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে মজলিসে। তিনি ক্ষুব্ধ ও উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কারো কাছে তীর-কামান থাকলে আমার সামনে চলে আস।'

চারজন তীরান্দাজ- যারা আশপাশের কোন মহল্লার অধিবাসী নয়– ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। তারা ভয়ে জড়সড় যেন। তিনি বললেন, গুণে গুণে ত্রিশ কদম এগিয়ে এসে তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাও।' তারা তা-ই করে। তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়।

'ধনুকে তীর সংযোজন কর।'

চারজন তূনীর থেকে তীর নিয়ে যার যার ধনুকে সংযোজন করে।

'আমার হৃদপিন্ডকে নিশানা বানাও।'

তারা ধনুক তাক করে নিশানা ঠিক করে।

'আমি মরে যাব, সে কথা না ভেবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীর ছোঁড়।'

তীরান্দাজগণ ধনুক সরিয়ে নেয়। তারা ভাবে, লোকটি মরে যাবে।

'আমার হৃদপিন্ডকে নিশানা বানিয়ে তীর ছোঁড়।' তিনি গর্জে উঠে বললেন- 'অন্যথায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখানেই অঙ্গার হয়ে যাবে।'

তীরান্দাজগণ ভয় পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ধনুক উপরে তুলে নিশানা তাক করে। জনতা নিথর, নিস্তব্ধ, যেন এখানে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে অদৃশ্য কিছু মানুষের গুনগুন শব্দ কানে আসছে। একসঙ্গে চারটি ধনুক থেকে শা করে চারটি তীর বেরিয়ে যায়। তীরগুলো সব তার ঠিক বুকের মাঝখানটায় গিয়ে বিদ্ধ হয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাহু দু'টো উপরে তোলা, ঠিক আগের মতো। ঠোঁটে তার মুচকি হাসির রেখা।

'চারজন খঞ্জরধারী এগিয়ে আস'– তিনি বললেন–'তীরান্দাজরা চলে যাও।'

বিস্ময়াভিভূত তীরান্দাজগণ মাথা নিচু করে ফিরে যায়। অন্য চারজন লোক একদিক থেকে এগিয়ে আসে। তিনি বললেন, খঞ্জর হাতে নিয়ে আমার থেকে পনের কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও। তারা তা-ই করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নিশানায় খঞ্জর নিক্ষেপ করতে জান?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, জানি।'

তিনি বললেন, 'চারজন একসঙ্গে আমার বুকে খঞ্জর নিক্ষেপ কর।'

চার খঞ্জরধারী পূর্ণ শক্তিতে তার গায়ে খঞ্জর নিক্ষেপ করে। সবক'টি খঞ্জর তার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তিনি পূর্ববৎ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। চারটি খঞ্জরের আগা তার বুকে বিদ্ধ। তিনি হাসছেন। ভীড়ের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠে, 'শাবাশ...। মৃত্যুর ফেরেশতা তার হাতে।'

'আমি অক্ষয় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে, জবাব পেয়েছ?' বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি।

এক বেদুইন দৌড়ে আসে এবং তার পায়ে সেজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তিনি ঝুকে হাতে ধরে তাকে তুলে দেন এবং বললেন, 'খোদা তোমার উপর রহম করুন।'

'তাহলে তো তুমি মৃতকেও জীবিত করতে পার'– এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলল– 'আল্লাহ আমাকে একটি পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন। ছেলেটা মারা গেছে। আমি শুনেছি আপনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন। আমি বহুদূর থেকে পুত্রের লাশ বহন করে নিয়ে এসেছি। আমি বুড়ো মানুষটার উপর আপনি দয়া করুন, ছেলেটাকে জিন্দা করে দিন।' বৃদ্ধ হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

চারজন লোক কাফন প্যাঁচান একটি লাশ নিয়ে এগিয়ে আসে। লাশটি তার

সম্মুখে রাখা হয়। তিনি বললেন, 'একটি বাতি আন। লাশটি তুলে সবাইকে দেখিয়ে নিয়ে আস, যেন কেউ বলতে না পারে যে, ছেলেটি জীবিতই ছিল।'

লাশটি বহন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আনা হল। তার মুখমণ্ডলের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এক ব্যক্তি বাতি ধরে সবাইকে লাশের মুখমণ্ডল দেখায়। চেহারাটা মৃত মানুষেরই ন্যায় ফ্যাকাশে। চোখ দু'টো আধাখোলা। মুখখানা সামান্য হা করা। জনতাকে দেখানোর পর লাশটি নিয়ে আবার তার সম্মুখে রাখা হল। বাজনার লয় পাল্টে গেছে এবং আগের চেয়েও হৃদয়কাড়া হয়ে উঠেছে। তিনি দু'বাহু আকাশপানে উচিয়ে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'জীবন ও মৃত্যু তোমারই হাতে। আমি তোমার পুত্রের পুত্র। তুমি তোমার পুত্রকে ক্রুশ থেকে রক্ষা করেছ এবং আমাকে ক্রুশের মর্যাদা দান করেছ। তোমার পুত্র ও তার ক্রুশ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি এই হতভাগ্য বৃদ্ধের পুত্রকে জিন্দা করে দিতে পারি।' তারপর লাশের উপরে শূন্যে এমনভাবে হাত ঘুরাতে শুরু করেন, যেন হাত দু'টি তার কাঁপছে। কাফনের কাপড়টা ফড় ফড় শব্দ করতে শুরু করে। তিনি শূন্যে আরো বেগে হাত ঘুরাতে থাকেন এবং কাফনও আরো শব্দ করে ফড় ফড় করে উঠে। দর্শকদের অনেকে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। মহিলাদের কেউ কেউ হাউমাউ করে চীৎকার জুড়ে দেয়। দৃশ্যটা এ কারণেও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে, মৃতকে জীবনদানকারী লোকটির বুকে চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে।

কাফনের ভেতরে নড়াচড়া অনুভূত হয়। লাশ উঠে বসে পড়ে। দু'হাত কাফনের ভেতর থেকে বের করে আনে। নিজ হাতে মুখমণ্ডল থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে ফেলে এবং চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠে, 'আমি কি পবিত্র জগতে পৌঁছে গেছি?'

'না' জীবিতকারী তাকে ঠেস দিয়ে তুলে দাঁড় করান– 'তুমি সে জগতেই আছ, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছিলে। যাও, পিতার সঙ্গে বুক মিলাও।'

পিতা দৌড়ে গিয়ে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে। অস্থিরচিত্তে পুত্রকে চুম্বন করে আদর দেয়। আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে জীবনদানকারীর পায়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। জনতা আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরস্পর ফিসফিস করতে শুরু করে। জলজ্যান্ত কাফনে মোড়ানো একটি মৃতদেহ এখন তাদের চোখের সামনে হাঁটছে। মরা মানুষ জীবিত হয়ে গেছে!

'কিন্তু আমি আর কাউকে জিন্দা করব না'– তিনি বললেন-'জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আমি যে খোদার দূত হয়ে এসেছি, তোমাদেরকে শুধু সে কথাটুকু বুঝাবার জন্য এইমাত্র আমি খোদার নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছি যে, আমাকে সামান্য সময়ের জন্য এমন শক্তিদান করুন, যাতে আমি মৃতকে

জীবিত করতে পারি। খোদা আমাকে সেই শক্তি দিয়েছেন।

'আপনি কি যুদ্ধে নিহত সৈনিকেও জীবিত করতে পারেন?' সভার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

'না'– তিনি জবাব দেন- 'যারা যুদ্ধ করে মারা যায়, খোদা তাদের প্রতি এতবেশী অসন্তুষ্ট হন যে, তাকে আর তিনি দ্বিতীয় জীবন দান করেন না। পরজগতে তাকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করেন। খোদা মানবজাতিকে কাউকে খুন করার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, যেভাবে তোমাকে একজন পিতা জন্ম দিয়েছেন, তেমনি তুমিও অন্যকে জন্ম দিবে। এ জন্যই তোমাদেরকে ঘরে চারটি করে বউ রাখতে বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের কাজ একটাই– সন্তান জন্ম দেয়া এবং সেই সন্তান যখন বড় হবে, তার মাধ্যমেও সন্তান জন্ম দেয়ান। এ-ই তো এবাদত।

❁ ❁ ❁

তিনি যখন একের পর এক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন, ঠিক তখন টিলার পেছনে সে জায়গাটিতে লুকিয়ে আছে দু'জন লোক, যেখানে রংবেরঙের তাঁবু খাটান রয়েছে। একটি তাঁবুর মধ্য থেকে কতগুলো মেয়ের কথা ও হাসাহাসির শব্দ কানে আসছে। লোক দু'জন হলেন সাদিয়ার গ্রামের মসজিদের ইমাম ও তার শিষ্য মাহমুদ বিন আহমদ। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এখানেই কোথাও আছে। মাহমুদ ধর্মজ্ঞানে পরিপক্ক নয়। খোদার এই দূতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করার যোগ্যতা তার নেই। ইমাম বলেছিলেন, কোন মানুষ মৃতকে জীবিত করতে পারে না। রহস্যময় এই লোকটি জনতাকে কি সব প্রদর্শন করছে, সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ-ই নেই। তিনি বরং কৌশল অবলম্বন করেছেন যে, মানুষ তার কারামত দর্শনে নিমগ্ন থাকুক, আর এই সুযোগে আমি তার ভেদ-রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাই।

ইমাম ও মাহমুদ সাদিয়াকে খুঁজে ফিরছে। তাঁবুগুলোর জায়গাটা অন্ধকার। কেবল তিনটি তাঁবুতে আলো জ্বলছে। তিনটির সবক'টির পর্দা ভিতর-বাহির উভয় দিক থেকে আটকানো। পাহারার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। দু'তিনজন লোক দূরে একস্থানে বসে কথা বলছে। তারা প্রহরী। দেখে ফেললে বিপদ আছে। টিলার অপরদিক থেকে তার কথা বলার আওয়াজ আসছে এবং বাজনা-মিউজিক-এরও শব্দ ভেসে আসছে। তবে এই বাজনার উৎস কোথায় বুঝা যাচ্ছে না।

ইমাম ও মাহমুদ আলোময় একটি তাঁবুর নিকটে গিয়ে কান পেতে মেয়েদের কথা শোনার চেষ্টা করে। মেয়েদের কথাবার্তা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। এক নারীকণ্ঠ বলছে, 'ম্যাজিক এখানেও সফল হচ্ছে।'

আরেকজন বলল, 'বড় মূর্খ সম্প্রদায়।'

'মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার এই একটাই পন্থা যে, তাদেরকে ম্যাজিক দেখিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বানিয়ে দাও'– আরেক নারীর কণ্ঠ।

'জানি না ও কি অবস্থায় আছে।'

'কে?'

'নতুন চিড়িয়া'– এক মেয়ে বলল–'তোমাদের স্বীকার করতেই হবে, ওটা আমাদের সকলের চেয়ে রূপসী।'

'মেয়েটা দিনভর কেঁদেই চলেছে'– একজন বলল।

'আজ রাতেই তার কান্না থেমে যাবে'– এক মেয়ে বলল– 'ওকে খোদার পুত্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

মেয়েদের অট্টহাসি শোনা যায়। একজন বলল, 'খোদা কি স্মরণ করবেন যে, আমরা তাকে কেমন পুত্র দিয়েছি। বড় কামেল মানুষ।'

মেয়েরা পরস্পর অশ্লীল কথোপকথন শুরু করে। ইমাম ও মাহমুদ বুঝে ফেলেছেন, 'নতুন চিড়িয়া' সাদিয়া ছাড়া কেউ নয়। তারা সর্বোতভাবে নিশ্চিত হন যে, এসব কর্মকাণ্ড ম্যাজিক-যাদু বৈ নয়। পশ্চাৎপদ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য এ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইমাম মাহমুদের কানে কানে বললেন, 'এই মেয়েগুলোর অশ্লীল কথা-বার্তা ও মদের গন্ধই প্রমাণ করে এরা কারা এবং কী করছে...। আমরা ক্লু পেয়ে গেছি বলা যায়।'

ইমাম ও মাহমুদ বড় তাঁবুর নিকট চলে যান। তাঁবুটি একটি টিলা ঘেঁষে তৈরি করা। টিলা ও তাঁবুর পেছন দরজার মাঝখানের ব্যবধান এক-আধ গজের বেশী নয়। তাঁবুর সন্নিকটে গিয়ে তারা উঁকি দিয়ে তাকায়। তাঁবুর পর্দা মধ্যখানে রশি দিয়ে বাঁধা। ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকানোর জন্য এক স্থানে এক চোখ পরিমাণ ফাঁকা। ইমাম ও মাহমুদ এই ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে তাকান। ভিতরে লম্বা একটি পালংক পাতানো।

পালংকে জাজিম বিছানো। তার উপর অতি আকর্ষণীয় চাদর। দু'ধারে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। একধারে মদের সোরাহী ও গ্লাস রাখা। পালংকের উপর সাদিয়া বসা। ভিতরের সাজ-সজ্জা ও শান-শওকত প্রমাণ করে, এটি-ই এই কাফেলার নেতার তাঁবু। সাদিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন নারী ও একজন পুরুষ। সাদিয়াকে বধূসাজে সাজাচ্ছে তারা।

'আজ সারাটা দিন-ই তুমি কেঁদে কাটালে'– সাদিয়াকে উদ্দেশ করে মহিলা বলল- 'তবে একটু পর-ই তোমার মনে হাসি ফুটে যাবে এবং তুমি নিজেকে চিনতে-ই পারবে না। তুমি বড় ভাগ্যবতী মেয়ে যে, যে মহান ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এসেছেন, তিনি তোমাকে পছন্দ

করেছেন। তিনি শুধু তোমার জন্য এ এলাকায় এসেছেন। বিশ দিনের দূরত্ব থেকে গায়েবী চোখে তিনি তোমায় দেখেছিলেন। স্বয়ং খোদা তাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে এসেছেন। ইনি যদি না আসতেন, তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কোন অসহায় বেদুইনের কাছে বিয়ে দিয়ে দিতেন কিংবা কারো কাছে বিক্রি করে ফেলতেন।'

মহিলার কথাগুলো সাদিয়ার উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করতে শুরু করে। সাদিয়া নীরবে শুনছে। চরম উত্তেজনা এসে গেছে মাহমুদের। ইমাম তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। তিনি দেখতে চান যে, সাদিয়াকে কিসের জন্য সাজানো হচ্ছে।

খানিক পর টিলার অপর দিক থেকে ঘোষণা হয়, 'তিনি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর এবং যার হাতে আমাদের সকলের জীবন ও মৃত্যু, যার চোখ গায়েব দর্শনে সক্ষম, এখন তিনি রাতের অন্ধকার ভেদ করে আকাশে চলে যাচ্ছেন। তোমরা কেউ তাঁবু এলাকার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং টিলার উপরে উঠবে না। কেউ সেদিকে যাওয়ার বা দেখার চেষ্টা করলে, সে চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। আগামী রাত তিনি তোমাদের প্রত্যেকের আকুতি শুনবেন।

ইমাম ও মাহমুদ সেখানে-ই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁবুর ভিতর পুরুষ ও মহিলা সাদিয়াকে সাবধান করিয়ে দেয় যে, তিনি আসছেন। খবরদার কোন প্রকার বে-আদবী যেন না হয়।

- 'তিনি' এসে পড়েছেন। সম্মুখ দিক থেকে পর্দা তুলে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। বুকে তার চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। দেখে ইমাম ও মাহমুদ অবাক্ হয়ে যান। সাদিয়া ভয়ে আৎকে উঠে। অস্ফুট একটা চীৎকার বেরিয়ে যায় তার মুখ থেকে। 'তিনি' মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ভয় পেয় না বেটী! এই মোজেজা খোদা আমাকে দিয়েছেন যে, তীর-খঞ্জর আমাকে মারতে পারেনা।' তিনি সাদিয়ার গা ঘেঁষে বসে পড়েন।

'এই ভেল্কি আমি একবার কায়রোতে দেখেছিলাম'- মাহমুদের কানে কানে ইমাম বললেন- 'আমি জানি, তীর- খঞ্জর কোথায় গেঁথে আছে।' তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁবুর পর্দাটা ভিতর থেকে রশি দ্বারা বেঁধে দেন।

আর অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। চোখা-চোখি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ইমাম ও মাহমুদ। বে-পরোয়া হয়ে উঠেন তারা। বাইরে থেকে পর্দাটা খুলে ফেলেন। শা করে ঢুকে পড়েন ভিতরে। কারো পায়ের আওয়াজ শুনে 'তিনি' পিছনে ঘুরে তাকান। অমনি তারা ঝাপটে ধরেন লোকটাকে। মাহমুদ সাদিয়াকে ইংগিত করে বলে, পালংকের উপর থেকে চাদরটা তুলে এর গায়ের উপর ছুঁড়ে দাও। হতভম্ব সাদিয়া তা-ই করে। লোকটার দেহ্ বেশ শক্তিশালী মনে হল। ইমাম ও মাহমুদ তাকে চাদর পেঁচিয়ে শক্তভাবে আটকে ফেলেন।

বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া হল। ইমামের নির্দেশে সাদিয়া তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে যায়। মাহমুদ চাদর পেচানো বন্দীটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ধরা পড়ার ভয় প্রতি পায়ে। তারা সতর্কপদে বন্দী ও অপহৃতা সাদিয়াকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। রাতের আঁধার তাদের বেশ সহযোগিতা করে।

অনেক পথ ঘুরে তারা গ্রামে পৌঁছে। চলে যায় সোজা মসজিদে। ইমামের হুজরায় নিয়ে ভেল্কিবাজকে কাঁধ থেকে নামানো হয়। বন্ধন খুলে দেয়া হয়। তার বুকে তীর ও খঞ্জর গেঁথে আছে। সাদিয়াকেও তারা হুজরায় রাখে। আশংকা আছে, ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে ভেল্কিবাজের দলের লোকেরা এসে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের একথা ভাববারও পরিবেশ নেই যে, তাদের 'খোদার পুত্র' কোথায়। জনসমাবেশের পর এখন তারা মদ নারী নিয়ে ব্যস্ত। তারা ভাবতেও পারছে না, তাদের মনিব নতুন চিড়িয়াসহ অপহরণ হতে পারে।

ইমাম ও মাহমুদ ধৃত ভেল্কিবাজকে পরিধানের চোগা খুলতে বলেন। সে প্রথমে তীর ও খঞ্জর টেনে বের করে। তারপর চোগা খুলে। ভিতরের পোষাকও খোলানো হয়। পোষাকের নীচে গায়ে নরম কাঠ বাঁধা। কাঠের উপরে চামড়া জড়ানো। তার বুকটা সম্পূর্ণ কাঠ দ্বারা ঢাকা। চামড়া জড়ানো এই কাঠে-ই বিদ্ধ হয়েছিল তীর ও খঞ্জরগুলো। সে ইমাম ও মাহমুদকে বলল, 'কি চাও বল– সোনা-রূপা, উট যা চাও, যত চাও দেব; আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তুমি ছাড়া পাবে না।' ইমাম বললেন।

ইমাম মাহমুদকে বললেন, 'নিকটবর্তী চৌকিটা কোথায় তা তোমার নিশ্চয় জানা আছে। সেখানকার সব সৈনিকদের নিয়ে আস।'

মাহমুদ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। হুজরা থেকে বের হয়। ইমামও উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে মাহমুদকে কানে কানে বলেন, আগে এখানকার সহকর্মীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মাহমুদ ইমামের ঘোড়ার জিনে বসে-ই সাওয়ার হয়ে রওনা দেয়। ইমামের এ এলাকার গোয়েন্দাদ্বয়কে যথাস্থানে পেয়ে যায়। তাদেরকে এক্ষুণি মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে দেখা করতে বলে চৌকি অভিমুখে ছুটে চলে। ঘন্টা দেড়েকের পথ।

মাহমুদ ছুটে চলেছে। কিন্তু তার মনে সংশয়। চৌকির কমান্ডারকে চিনে সে। লোকটা নীতিহারা। খৃষ্টান ও সুদানীরা ঘুষ দিয়ে তাকে দলে ভিড়িয়ে রেখেছে। মাহমুদ সে রিপোর্টও কায়রো পাঠিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাহমুদ প্রায় নিশ্চিত যে, কমান্ডার তার বাহিনীকে দিবে না কিংবা টালবাহানা করে কালক্ষেপন করবে, যাতে শত্রু হাত

থেকে ছুটে যেতে পারে। তা-ই যদি হয়, তাহলে কী করবে ভাবছে মাহমুদ। অথচ, রাত পোহাবার আগেই বাহিনী নিয়ে গ্রামে পৌছতে হবে তাকে। সৈন্য না পেলে ইমাম ও তার গোয়েন্দাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কারণ, ধৃত দাগাবাজের হাতে অনেক লোক আছে। তার সাধারণ ভক্ত-মুরীদরাও অনেকে তার জন্য নিবেদিত।

ইমামের কাছে খঞ্জর আছে। তার গোয়েন্দারাও এসে গেছে। তাদের কাছেও খঞ্জর আছে। তারা ভেল্কিবাজকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখে। লোকটি মুক্তির জন্য এত মূল্যের অফার দিয়ে যাচ্ছে যে, ইমাম ও তার গোয়েন্দারা কখনো তা স্বপ্নেও দেখেনি। ইমাম তাকে বললেন, 'আমি এখন মসজিদে বসা আছি। এটি সেই আল্লাহর ঘর, যিনি তোমাকে সত্য দ্বীনসহ আকাশ থেকে নামিয়েছেন। আর এই বুঝি তোমার সত্য দ্বীন? দেখ দোস্ত! আমি কায়রো সরকারের একজন কর্মকর্তা। যত লোভ-ই দেখাও, আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। আমি ঈমান বিক্রি করতে পারি না।

মাহমুদ বিন আহমদ চৌকিতে গিয়ে পৌছে। কমান্ডারের তাঁবু তার চেনা। তাঁবুতে আলো জ্বলছে। ঘোড়ার পদশব্দ শুনে কমান্ডার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ইনি কে! কমান্ডারকে মাহমুদ চিনতে পারছে না। মাহমুদ নিজের পরিচয় দেয়। কমান্ডার তাকে তাঁবুতে নিয়ে যায়। কমান্ডার জানালেন, গতকাল সন্ধায় পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন বাহিনী এসেছে। এই রদবদল হয়েছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশে। এরা সুলতান আইউবীর সঙ্গে ময়দান থেকে আসা বাহিনী।

মাহমুদ কমান্ডারকে জানায়, আমরা বিরাট এক শিকার পাকড়াও করেছি এবং তার পুরো গ্যাং ধরার জন্য এক্ষুণি চৌকির সব সৈন্য প্রয়োজন। রাতারাতি-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলতে হবে।

বাহিনীর সেনাসংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তৈরি হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের কাছে আছে বর্শা, তরবারী, তীর ও তীরান্দাজ। মাত্র আট-দশজন সিপাহীকে চৌকিতে রেখে দেয়া হয়। এরা এসেছে কার্ক অবরোধ অভিযান থেকে। অটুট চেতনার অধিকারী এরা।

কমান্ডার দ্রুত ঘোড়া ছুটান। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাহমুদ। গন্তব্যের নিকটে পৌছে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়া হয়, যাতে অপরাধীরা টের না পায়। তবে অপরাধীরা টের পাওয়ার মত অবস্থায় ছিলও না। মদ ও নিদ্রা তাদেরকে অজ্ঞান করে রেখেছে।

কমান্ডার মাহমুদের দিক-নির্দেশনায় এলাকাটা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেন এবং অভিযান ভোর নাগাদ মুলতবী রাখেন। মাহমুদ ইমামকে সংবাদ জানিয়ে দেয় যে, বাহিনী যথাসময়ে এসে গেছে। সাদিয়া ইমামের হুজরায়-ই অবস্থান করছে। ইমাম একজন দূত পাঠিয়ে সাদিয়ার পিতাকেও ডেকে আনেন।

'তাকে' এক নজর দেখার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্ত-মুরীদ-দর্শনার্থীরা রাতের কারামত দর্শনের পর খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়েছে। তাদের 'পবিত্র মানুষ' তাদেরকে বলেছিল, আগামী রাত আমি তোমাদের আর্জি শুনব। সকালের আলো ফোটার আগেই তারা জেগে ওঠে। আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ঘোড়া দেখতে পায় তারা। ঘোড়াগুলোর আরোহীরা সৈনিক বলে মনে হল তাদের কাছে। বিষয়টা তারা কিছু-ই বুঝে উঠতে পারল না। তাদের জানা নেই যে, মৃত প্রাণীকে জীবনদানের ক্ষমতাওয়ালা মানুষটি মসজিদের হুজরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে।

বাহিনীর কমান্ডার দামেস্ক-এর অধিবাসী। নাম রুশদ ইবনে মুসলিম। সরকারের সাধারণ একজন কর্মচারী। কিন্তু সীমান্ত চৌকিতে এসে তিনি তার সিপাহীদের উদ্দেশে যে ভাষণ প্রদান করেন, তাতে তার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। তিনি বললেন-

'গোটা দেশ শুধু তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমায়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সব সময়-ই তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যদিও তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তাকে আমার চোখে দেখ। আমরা সকলেই এক একজন সালাহুদ্দীন আইউবী। এখানে কেউ যদি পুরাতন বাহিনীর সিপাহীদের ন্যায় ঈমান বিক্রি কর, তাহলে আমি হাত-পা বেঁধে তাকে মরুভূমিতে ফেলে আসব। তার শাস্তির নির্দেশ আমি কায়রো থেকে নেব না। আমি আল্লাহ্ থেকে নির্দেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।'

ভোর হল। রুশদ ইবনে মুসলিম দেখলেন, তাঁবুগুলোতে কোন নড়াচড়া নেই। তার মানে ওদের জাগতে এখনো দেরী। তিনি জনতাকে বললেন, তোমরা একটু সরে গিয়ে বস; কিন্তু চলে যেও না, অপেক্ষা কর। তোমাদের কাংখিত পবিত্র মানুষটিকে অতি কাছে থেকেই তোমরা দেখতে পাবে।

জনতাকে সরিয়ে দিয়ে কমান্ডার তিন-চারজন অশ্বারোহী সিপাহীকে বিভিন্ন টিলার উপর দাঁড় করিয়ে দেন, যাতে অপরাধীদের কেউ পালাতে না পারে। অবশিষ্ট সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে থেকে ভেতরে ঢুকে পড়। কেউ প্রতিরোধ করলে তাকে হত্যা করে ফেল। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। অবশ্য পালাবার সুযোগ নেই এখানে।

কমান্ডার খোলা তরবারী হাতে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করেন। দেখলেন, একটি অর্ধনগ্ন মেয়ে ও দু'জন পুরুষ ঘুমিয়ে আছে। তরবারীর আগার খোঁচা দিয়ে তিনি তাদের জাগাবার চেষ্টা করেন। তারা জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো গালাগাল শুরু করে দেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এবার কমান্ডারের তরবারীর আগা তাদের চামড়া ছেদ করে যায়। তিনজনই বিড় বিড় করে ওঠে। তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য তাঁবুগুলোতেও যেসব নারী ও পুরুষদের পাওয়া গেল, সকলের একই অবস্থা। একটি তাঁবুতে পাওয়া গেল অনেকগুলো সারিন্দা-হারমোনিয়াম।

ধৃত আসামীদের সবাইকে একস্থানে জড়ো করে পাহারা বসিয়ে দেয়া হল। তাদের উট ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব জব্দ করা হল। ইমাম মসজিদের হুজরা থেকে বড় আসামীকে নিয়ে আসেন। তার দু'হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। রাতে যেস্থানে সে 'মোজেজা' দেখিয়েছিল, তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। পিছনটায় এখনও পর্দা ঝুলছে। তার সাঙ্গপাঙ্গদের তার সম্মুখে বসিয়ে দেয়া হল। তাদেরও প্রত্যেকের হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। উদ্ধারকৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো সামনে রাখা হল। ইমাম জনতাকে এগিয়ে আসতে বললেন। জনতা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। ইমাম বললেন, 'তোমরা লোকটাকে বল, যদি তুমি খোদার দূত বা খোদার পুত্র হয়ে থাক, তাহলে তোমার হাতের বন্ধন খুলে ফেল। এ নাকি মরা মানুষ জীবিত করতে পারে। আমি এর দলের একজনকে খুন করব। তোমরা একে বল, যেন এ তাকে আমার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে কিংবা মারা গেলে জীবিত করে নেয়।' বলেই ইমাম তার দলের একজনকে ধরে আনেন এবং কমান্ডারের হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হন। লোকটি চীৎকার করে বলে উঠে, 'আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ লোকটি আমাকে জীবিত করতে পারবে না। এ বড় পাপী মানুষ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে খুন করবেন না।'

জনতার সংশয় এখনো কাটেনি। ইমাম লোকটার চোগা এবং অন্যান্য কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। নিয়ে এসেছেন তার দেহ থেকে খুলে নেয়া নরম কাঠ এবং চামড়াও। ইমাম নিজে কাপড়গুলো পরিধান করেন। কাউকে না দেখিয়ে চামড়া মোড়ানো নরম কাঠটাও বুকে বেঁধে নেন। তারপর চোগা পরিধান করেন। তিনি কমান্ডারকে বললেন, আপনার চারজন তীরান্দাজকে আমার সামনে আসতে বলুন। তারা আসে। ইমাম তাদেরকে বললেন, আমার থেকে ত্রিশ কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও। আমার বুকটাকে নিশানা বানিয়ে তীর ছোঁড়।'

তীরান্দাজরা রুশদ ইবনে মুসলিমের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায়।

রাতে মাহমুদ কমান্ডারকে তীর-খঞ্জরের কাহিনী বিস্তারিত শুনিয়েছিল। কমান্ডার তার তীরান্দাজদের নির্দেশ দেন, তীর চালাও। তারা নিশানা ঠিক করে তীর ছোঁড়ে। চারটি তীর ইমামের বুকের ঠিক মাঝখানটায় এসে গেঁথে যায়। ইমাম বললেন, এবার চারজন এগিয়ে এসে আমার বুকে চারটি খঞ্জরের আঘাত হান। চারজন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইমামের বুকে খঞ্জরের আঘাত হানে। খঞ্জর ইমামের বুকে গিয়ে আটকে যায়।

ইমাম তীরান্দাজদের বললেন, আরো একটি করে তীর ধনুকে সংযোজন করে নাও। তিনি দাগাবাজ 'পবিত্র' মানুষটিকে সামনে এনে দাঁড় করান। জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে বললেন, 'এ লোকটি নিজেকে 'অক্ষয়' বলে দাবি করে। আমি তোমাদেরকে দেখাব, লোকটি আসলে কী।' তিনি তীরান্দাজদের বললেন, এর হৃদপিন্ডকে নিশানা বানিয়ে তীর নিক্ষেপ কর।'

চারটি ধনুক উপরে উঠে প্রস্তুত হয়ে যায়। লোকটি দৌড়ে ইমামের পেছনে চলে আসে। মৃত্যুর ভয়ে লোকটি থর থর করে কাঁপছে আর ইমামের নিকট জীবন ভিক্ষা চাচ্ছে। ইমাম তাকে বললেন, সামনে আস এবং জনতাকে বল যে, তোমরা খৃস্টানদের নিয়োজিত সন্ত্রাসী ও দাগাবাজ। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি জনতার দিকে মুখ করে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করল, আমি অক্ষয় নই। আমি তোমাদের-ই ন্যায় মানুষ। তোমাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য খৃস্টানরা আমাকে নিয়োজিত করেছে। তারা আমাকে বেতন দেয়।

'আর শামউনের কন্যা সাদিয়াকে এ ব্যক্তিই অপহরণ করিয়েছিল'– জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম বললেন– 'আমরা ওকে উদ্ধার করেছি।'

ইমাম চোগাটা খুলে ফেলেন। ভেতরের কাপড়ও খুলেন। দেহ থেকে কাঠটা আলাদা করে রুশদ ইবনে মুসলিমের একজন সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন, এটিকে উপস্থিত জনতার প্রত্যেককে দেখিয়ে আন। সিপাহী কাঠটা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখিয়ে আনে। ইমাম কাঠটা উঁচিয়ে ধরে জনতার উদ্দেশে বললেন, তীর আর খঞ্জর এই কাঠে বিদ্ধ হত।

জনতার সামনে সব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। ইমাম বললেন, এবার যাও, ঘুরে-ফিরে ওদের ভণ্ডামীর সাজ-সরঞ্জাম কোথায় কি আছে দেখ। মানুষ হুড়মুড় করে ছুটে যায়।

ঝুলন্ত পর্দার পেছনে একটি গুহা তৈরি করা হয়েছিল। রাতে ওখানে বসেই বাদকরা বাজনা বাজাত। মানুষ তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। সবগুলো তাঁবুতে মদের উৎকট গন্ধ। সব জায়গা ঘুরে-ফিরে দেখার পর জনতাকে আবার এ স্থানে বসিয়ে ইমাম ভণ্ডটার ভণ্ডামীর বিস্তারিত বিবরণ দেন। ইমাম তথ্য বের করে নিয়েছেন যে, রাতে যে ছেলেটিকে 'জীবিত' করা হয়েছিল, সে

তাদেরই লোক। এখন রশি দিয়ে বাঁধা কয়েদীদের একজন সে। তাকে জনতার সম্মুখে নিয়ে আসা হল। দেখান হল আরো এক ব্যক্তিকে, যে রাতে বৃদ্ধ'র ভান ধরে লাশের পিতা সেজেছিল। যে চারজন তীরান্দাজ রাতে তীর চালিয়েছিল, তাদেরকেও সামনে নিয়ে আসা হল। তারাও সেই দলেরই মানুষ। এবার ইমাম জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন–

'মুসলমানগণ! মনোযোগ সহকারে শোন! এরা সবাই ক্রুশের পূজারী। তোমাদের ঈমান ধ্বংস করতে এসেছে। তোমরা জান যে, কোন মানুষ মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহও মরে যাওয়া মানুষকে জীবিত করেন না। কারণ, আল্লাহ নিয়ম ও আইন অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি একক; তার কোন শরীক নেই। তার কোন সন্তান নেই। ক্রুশের পূজারী এই লোকগুলো ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। মিথ্যার পূজারী এসব মানুষ তোমাদের ঈমান, ঈমানী চেতনা ও তোমাদের তরবারীকে ভয় করে। এরা ময়দানে তোমাদের মোকাবেলা করার সাহস রাখে না। এ কারণে এসব আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করে তোমাদের অন্তরে সন্দেহ ও কু-মন্ত্রণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, যাতে তোমরা ইসলামের হেফাজতের জন্য ক্রুশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে না পার। এই মিসরেই ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। মহান আল্লাহ সেই খোদায়ী দাবীদারকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। আমার বন্ধুগণ! তোমরা নিজেদের মর্যাদা বুঝ। দুশমনকে ভালভাবে চিনে নাও।'

উপস্থিত জনতা– যাদের সকলেই মুসলমান– অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। লোকগুলো অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ। ফলে সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ফেলা তাদের স্বভাব। ভক্তিতেও সীমালংঘন, বিরোধেও সীমালংঘন। তারা একজন পাপিষ্ঠ ভণ্ডের ভেল্কিবাজি দেখে তাকে 'খোদার পুত্র' বলে বরণ করে নিয়েছিল। আর পরে তার বিপক্ষে বক্তব্য শুনে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধ্বনি তুলে তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইমাম আসামীদেরকে কায়রো পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে তাদেরকে জীবিত বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কমান্ডার রুশদ ইবনে মুসলিম যে কোন প্রকারে হোক জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তা করতে গেলে এই সহজ-সরল নিরীহ মানুষগুলো মারা যাবে। তা না করে বরং তাদের হাতেই ঐ পাপিষ্ঠদের জীবনের অবসান ঘটুক। তারা বুঝুক, যে লোকটি খোদার দূত ও পুত্র হওয়ার দাবি করল, সে একটা পাপিষ্ঠ মানুষ– যাকে যে কোন মানুষ হত্যা করতে পারে।

ইমাম, রুশদ ইবনে মুসলিম ও মাহমুদ একদিকে সরে যান। কমান্ডার একটি টিলার উপরে উঠে তার সিপাহীদের ডেকে বললেন, 'তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই থাক; ওদেরকে বাধা দিও না।'

কিছুক্ষণ পরের দৃশ্য। ঘটনাস্থলে ইমাম, মাহমুদ, কমানডার রুশদ ইবনে মুসলিম ছাড়া আর কেউ নেই। রাতে যেখানে ভেল্কি দেখানো হয়েছিল, সেখানে ভেল্কিবাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লাশগুলো পড়ে আছে। জনতার রোষানল থেকে মেয়েরাও রেহাই পায়নি। খুন হয়েছে তারাও। ক্ষতবিক্ষত লাশগুলো পড়ে আছে। একটিও চেনার উপায় নেই। উত্তেজিত জনতা তাঁবু, পর্দা ও অন্যান্য সব সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে গেছে। অপরাধী চক্রের উটগুলোও জনতা নিয়ে গেছে। লাপাত্তা হয়ে গেছে রুশদ ইবনে মুসলিমের ন'টি ঘোড়াও। মানুষ বুঝতে পারেনি যে, এগুলো তাদেরই সৈন্যদের ঘোড়া। সব মিলে মনে হচ্ছিল যে, হঠাৎ একটি ঝড় এসে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

'আমার কায়রো যেতে হবে'- ইমাম কমান্ডার ও মাহমুদকে বললেন- 'ঘটনাটি সরকারকে অবহিত করতে হবে।'

❁ ❁ ❁

দিন কয়েকের মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেসব আইন জারি করলেন ও যেসব পদক্ষেপ হাতে নিলেন, তা ছিল বৈপ্লবিক- এতই বৈপ্লবিক যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল ও ভক্তদের পর্যন্ত চমকে দিল। তিনি সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসের সন্দেহভাজন তালিকাভুক্তদের বাড়ী-ঘরে তল্লাশি চালান। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমান্ডের বেশ ক'জন পদস্থ কর্মকর্তাও ছিল। তল্লাশিতে তাদের ঘরে প্রচুর পরিমাণ হিরা-জহরত, মূল্যবান সহায়-সামগ্রী ও ভিনদেশী অতিশয় রূপসী নারী উদ্ধার হয়। কারো কারো ঘরে এমন কতিপয় চাকর পাওয়া যায়, যারা মূলত সুদানের অভিজ্ঞ গুপ্তচর। তাছাড়া অভিযোগের পক্ষে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান আইউবী পদমর্যাদা নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেককে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এদের সঙ্গে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আচরণ করবে। সুলতান আইউবীর এই পদক্ষেপের ফলে তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের বেশক'টি পদ শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

সুলতান আইউবী আঘাত হানলেন সেসব লোকদের উপর, যারা ইসলামের স্বঘোষিত ইজারাদার সেজে বসেছিল। উপদেষ্টাগণ সুলতান আইউবীকে পরামর্শ দেন যে, ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সাধারণ মানুষ মসজিদের ইমামদের ভক্ত। আপনার এই অভিযানে জনসমর্থন আপনার বিপক্ষে চলে যাবে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে ক'জন এমন

আছে, যারা ইসলামের মর্ম বুঝে? মানুষ তো তাদের ভক্ত হয়েছে এই জন্য যে, তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে নিরীহ জনসাধারণ তাদের অনুরক্ত হোক। আমি জানি এই ইমামরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নিজেদের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য জনসাধারণকে ইসলামের সঠিক বুঝ ও আসল চেতনা থেকে অজ্ঞই রাখে। জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় হল মসজিদ। মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরে বসে মানুষের কানে যা-ই দেয়া হয়, তা-ই মর্মমূলে পৌঁছে যায়। এ হল মসজিদের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ক্রিয়া। কিন্তু আমাদের দেশে মসজিদের অপব্যবহার হচ্ছে। মসজিদে বসে একজন ইমাম পীর-মুরশিদ সাজছে। এখনই যদি আমি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমলদার আলেমদের নিয়োজিত না করি, তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ইমাম ও পীর-মুরশিদদের পূজা করতে শুরু করবে। এই বে-এলেম ও বে-আমল আলেমরা নিজেদেরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দূত বানিয়ে নেবে এবং ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

যাইনুদ্দীন আলী বিন নাজা আল-ওয়ায়েজ একজন বিজ্ঞ চিন্তাশীল ও আমলদার আলেম। সুলতান আইউবী পরামর্শ নেয়ার জন্য তাঁকে ডেকে আনলেন। যাইনুদ্দীন বিন আলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুপ্তচরবৃত্তির একটি ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একবার তিনি খৃস্টানদের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বহু কুচক্রীকে ধরিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম এবং ধর্ম বিষয়ে যেসব অপতৎপরতা চলছিল, সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি এই বলে সুলতান আইউবীর মনোবল বাড়িয়ে দেন যে, আপনি যদি আজ ধর্মকে অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে কাল জাতি আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার জন্য আগে নামধারী ধর্মগুরুদের অনুমতি নেয়া আবশ্যক মনে করবে আর আপনিও সেই রীতি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। আর এতদিনে খৃস্টানরা মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় কুসংস্কার ও অনৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েই ফেলেছে।

বিজ্ঞ আলেম যাইনুদ্দীন বিন আলীর সমর্থন পেয়ে সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ফরমান জারি করলেন যে, যাইনুদ্দীন বিন আলী বিন নাজা আল-ওয়ায়েজের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল মসজিদের ইমামদের ইলম, আমল ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত পরিচালিত হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ইমাম নিয়োগ করা হবে। ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে সুলতান আইউবী যে ক'টি শর্ত আরোপ করলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল, ইমাম বিজ্ঞ আলিম হওয়ার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। সুলতান আইউবী জিহাদ, দর্শন ও সামরিক চেতনাকে ধর্ম ও মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে পৃথক করতে রাজি নন।

তিনি দেশে এমন সব খেলাধুলা ও বিনোদনের উপকরণ ও পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করেন, যাতে জুয়াবাজি ও চরিত্রহীনতার সংমিশ্রণ রয়েছে। তার নির্দেশে আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ বিনোদনের বিভিন্ন আখড়ায় হানা দিয়ে নানারকম উলঙ্গ ছবি ইত্যাদি আপত্তিকর জিনিস উদ্ধার করে। গ্রেফতার করে অনেক কুচক্রীকে। তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শত্রুর পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে আজীবনের জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। তার পরিবর্তে সুলতান আইউবী বিনোদনের জন্য তরবারী চালনা, ঘোড়সওয়ারী, অস্ত্র ছাড়া লড়াই ও কুস্তি ইত্যাকার খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিদ্যালয় ও মসজিদে জ্ঞান প্রতিযোগিতার রেওয়াজ চালু করেন।

সুলতান আইউবী সীমান্ত বাহিনীগুলোর প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি অবগত আছেন যে, শহর-নগর ও রাজধানী থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দ্রুত শিকার হয়ে পড়ে এবং তারাই সর্বপ্রথম দুশমনের আক্রমণের শিকার হয়। তাদের মানসিক ও দৈহিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলতান আইউবী বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেন। সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে তিনি যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা ও কঠোর নীতিমালা প্রদান করেন। বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়োগ করেছেন বেছে বেছে ঈমানী চেতনা, বিচক্ষণতা ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে। রুশদ ইবনে মুসলিমও সেসব কমান্ডারদেরই একজন, যিনি যেইমাত্র মাহমুদের একটু ইঙ্গিত পেলেন যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ আসামী ধরা পড়েছে, অমনি বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন। কমান্ডার যদি আগের জন হত, তাহলে মাহমুদ গিয়ে তাকে খৃস্টান ও সুদানীদের পরিবেষ্টিত মদ-নারীতে মত্ত পেত আর টালবাহানা করে সময় নষ্ট করে কুচক্রীদের পালাবার সুযোগ করে দিত।

কমান্ডার রুশদ ইবনে মুসলিম, মাহমুদ ইবনে আহমদ ও ইমাম– যাঁর নাম ইউসুফ ইবনে আজর– এ মুহূর্তে সুলতান আইউবীর কক্ষে উপবিষ্ট। তারা সুলতানকে নিহত ভেল্কিবাজের কাহিনী শোনাচ্ছেন। আলী বিন সুফিয়ানও বৈঠকে উপস্থিত। সুলতান আইউবী সীমাহীন আনন্দিত যে, এতবড় একটি সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিহত করা গেল। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'সবেমাত্র আক্রমণ প্রতিহত করা শুরু হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দূর করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমি তথ্য পেয়েছি যে, সীমান্ত এলাকাগুলো থেকে সেনাবাহিনীতে ভর্তির লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা সুদানীদের বন্ধু এবং মিসর সরকারের বিরোধী হয়ে গেছে। তাদের জিহাদী জযবা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও

গবাদিপশু আমাদেরকে দেয় না– এসব তারা সরবরাহ করে সুদানীদের। সেসব এলাকার মসজিদ এখন বিরান। মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দাগাবাজ ও ভেল্কিবাজ পীরদের পূজা করতে শুরু করেছে। তাদের মনমানসিকতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মতান্ত্রিক অভিযান শুরু করা আবশ্যক। আলোচ্য ভেল্কিবাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের যদি হত্যা না করা হত, তাহলে তাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে জনতার মাঝে প্রদর্শন করে কাজ হাসিল করা যেত।'

সুলতান আইউবী তার বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় সীমান্ত এলাকাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। এবার সেদিকে আরো বেশি দৃষ্টি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার জন্য এ মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা বেশি জরুরী তকিউদ্দীন ও তার বাহিনীকে সুদান থেকে বের করিয়ে আনা। কায়রো পৌঁছেই তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাতে এক তিলও ঘুমান না তিনি। তিনি নিজে সুদানের ময়দানে যেতে পারছেন না। আভ্যন্তরীণ ঘোলাটে পরিস্থিতি তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। তিনি কায়রো ফিরে এসেই তকিউদ্দীনকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য দূত প্রেরণ করেন যে, আমি মিসর এসে গেছি।

দূত ফিরে এসেছে। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, তকিউদ্দীনের এ পর্যন্ত বহু সৈন্য মারা গেছে এবং কিছু সৈন্য দুশমনের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে। দূত জানায়, তকিউদ্দীন তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দুশমন তাদের ধাওয়া করে ফিরছে। তকিউদ্দীন জবাবী আক্রমণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। আপাতত তার কয়েক প্লাটুন সৈন্য প্রয়োজন, যাদের সহযোগিতায় তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি কমান্ডো ইউনিট এবং কয়েক প্লাটুন অভিজ্ঞ সৈনিক সুদান পাঠিয়ে দেন। সুদান পৌঁছে তারা অভিযান শুরু করে। তকিউদ্দীনকে দুশমনের ধাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করে বেরে করে আনাই তাদের লক্ষ্য। তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কমান্ডো ইউনিটগুলো দুশমনকে অস্থির করে তোলে। কাঙ্খিত সময়ের আগেই তারা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

তকিউদ্দীন সুদান আক্রমণে যারপরনাই ব্যর্থ হয়। সাফল্য শুধু এতটুকু অর্জিত হয় যে, তকিউদ্দীন, তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালার ও অবশিষ্ট সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে তকিউদ্দীন টের পেলেন যে, তিনি তাঁর বাহিনীর অর্ধেক সুদানে খুইয়ে এসেছেন।

❁ ❁ ❁

ওদিকে কার্ক জ্বলছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর কারিগররা প্রয়োজন অনুপাতে দূরপাল্লার মিনজানিক তৈরি করে নিয়েছে। এসব মিনজানিক দ্বারা পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভেতরের কয়েকটি টার্গেট ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রসদের ডিপো। আগুনের প্রথম গোলাটি দুর্গের সেইদিক থেকে নিক্ষেপ করা হয়, যেদিক থেকে রসদের ডিপো খানিকটা কাছে। সৌভাগ্যবশত গোলা নিশানায় গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আগুনের লেলিহান শিখা জঙ্গী বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা দূরপাল্লার তীর-কামানও তৈরি করে নিয়েছে। অতিশয় শক্তিশালী সিপাহীরা এগুলো ব্যবহার করছে। কিন্তু আট-দশটি তীর নিক্ষেপ করার পর তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সুলতান জঙ্গী আরো একটি দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বেশ ক'জন শক্তিশালী সিপাহী বেছে নেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা দুর্গের ফটকের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং ফটক ভাঙ্গতে শুরু কর। ফটক ভাঙ্গার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাদের সরবরাহ করা হয়।

জঙ্গীর এই জানবাজ বাহিনী ফটকের দিকে ছুটে যায়। উপর থেকে খৃস্টানরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করে। কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। জখম হয় ক'জন। সুলতান জঙ্গী দূরপাল্লার তীরান্দাজদের তথায় সমবেত করেন। সাধারণ তীরান্দাজদের একটি দলকেও ডেকে নেন। সবাইকে বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে প্রাচীরের উপর অবস্থানরত খৃস্টান সেনাদের উপর তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুসলিম তীরান্দাজরা শাঁ শাঁ করে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। জানবাজদের আরেকটি দল ফটকের দিকে ছুটে যায়। জঙ্গীর সৈন্যদের তীর ছোঁড়া এবার মুষলধারার বৃষ্টির রূপ ধারণ করে। প্রাচীরের উপর ডাক-চিৎকার শোনা যায়। খানিক পর প্রাচীরের উপর কতগুলো ড্রাম দেখা যায়। সেগুলো জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারে ভরা। তারা ড্রামগুলো বাইরের দিকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ড্রাম ঠেলে বাইরের দিকে দেয়ার জন্য যেইমাত্র একজন মাথা জাগায়, অমনি সে মুজাহিদদের তীরের নিশানায় পরিণত হয়। ফলে দু'একটি ড্রাম বাইরে এসে পড়লেও অন্য সবগুলো প্রাচীরের উপরই উপুড় হয়ে যায়। প্রাচীরের উপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আগুন নিক্ষেপকারীরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরতে শুরু করে।

সুলতান জঙ্গীর একজন কমান্ডার জঙ্গীর আক্রমণের এই পন্থা দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গের পেছন ফটকের দিকে ছুটে যায় এবং সেখানকার কমান্ডারকে বিষয়টি অবহিত করে। দু'কমান্ডার মিলে পেছন ফটকেও একই পদ্ধতির

হামলা পরীক্ষা করতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে মুজাহিদরা কিছুটা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের এ অভিযানও সফল হয়। মুসলিম তীরান্দাজরা খৃস্টান সেনাদেরকে উপর থেকে আগুন নিক্ষেপ করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। সুলতান জঙ্গীও দু'কমান্ডারের এ অভিযান সম্পর্কে অবহিত হন।

সুলতান জঙ্গী এবার মিনজানিক দ্বারা দুর্গের ভেতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনী কার্ক দুর্গের উভয় ফটকের দুঃসাহসী আক্রমণ অভিযান দেখে কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ দুর্গের সামনে চলে যায়, অপর ভাগ পেছনের ফটকের দিকে। উভয় পয়েন্টে প্রাচীরের উপর এত অধিক তীরবর্ষণ করা হয় যে, উপরের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কার্ক দুর্গের সামনের ও পেছনের উভয় ফটক ভেঙ্গে ফেলা হয়। সুলতান জঙ্গীর বাহিনী দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে। শহরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। নিরীহ মানুষগুলো ছুটাছুটি শুরু করে দেয়। এই সুযোগে খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দুর্গ থেকে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যা নাগাদ খৃস্টান বাহিনী অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয়। সুলতান জঙ্গী বন্দী মুসলমানদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। খৃস্টান সম্রাটদের শহরময় অনুসন্ধান করা হয়; কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

কার্কের দুর্ভেদ্য দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে। বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। এ ঘটনা ১১৭৩ সালের শেষ তিন মাসের।

ফেরাউনের গুপ্তধন

ফিলিস্তীনে খৃস্টানদের কনফারেন্স চলছে। যে কোন জয়, যে কোন পরাজয়, পিছুহটা কিংবা সফল অগ্রযাত্রার পর বৈঠকে মিলিত হওয়া তাদের নিয়ম। বসে তারা মতবিনিময় করে, মদপান করে ও নারী নিয়ে আমোদ করে। তাদের বিশ্বাস, মদ আর নারী ছাড়া যুদ্ধজয় করা যায় না। তারা নিজেদের মেয়েদেরকে মুসলমানদের এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলিম শাসকদের চরিত্র হননের জন্য লেলিয়ে দিচ্ছে আর নিজেরা অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে মুসলমান মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের বিনোদন উপকরণে পরিণত করছে।

গোয়েন্দারা তাদেরকে রিপোর্ট প্রদান করল যে, সালাহুদ্দীন আইউবী বলে থাকেন, খৃস্টানরা হল নারী ব্যাপারী আর মুসলমান হচ্ছে নারীর সম্ভ্রমের মোহাফেজ। শুনে খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। একজন উপহাস করে বলল, লোকটা এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না যে, ক্রুশের পুত্ররা যেমন সৈনিক হয়ে ধর্মের কাজে তাদের দেহকে ব্যবহার করছে, তেমনি মেয়েরাও মুসলমানদেরকে বেকার করে তোলার জন্য নিজেদের দেহকে ব্যবহার করছে! আরেকজন বলল, সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো টের পায়নি যে, তার জাতির অসংখ্য ছোট ছোট শাসক-কেল্লাদার ও সালারকে আমাদের এক একটি মেয়ে, সোনার এক একটি থলে এমনভাবে ঘায়েল করে রেখেছে যে, সেই পরাজয়ে তারা গর্ববোধ করছে এবং সুখ অনুভব করছে। এমতাবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের থেকে ইসলামের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করবে?

এ হল খৃস্টানদের প্রথম দিকের কনফারেন্সগুলোর বক্তব্যের সারাংশ। কিন্তু ১১৭৩ সালের শেষদিকে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান সম্রাট ও নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন, তখন তাদের উপর অন্যরকম ভাব বিরাজ করছিল। এবার তারা সুলতান আইউবীকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছেন না। কারো মুখে হাসি নেই। কারো এ কথাও স্মরণ নেই যে, মদ-নারী ছাড়া তাদের বৈঠক চলে না। কার্ক থেকে তারা বড় লজ্জাজনক অবস্থায় পেছনে সরে এসেছে। তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন কার্ক-এর কেল্লাদার রেজনাল্ডও। রেজনাল্ড একজন বিখ্যাত সমরবিদ। সুলতান আইউবীর বাহিনীর সঙ্গে তিনি বারকয়েক সংঘর্ষে লিপ্তও

হয়েছিলেন। এ বৈঠকে উপস্থিত আছে রেমান্ডও, যিনি কার্ক অবরোধের সময় সুলতান আইউবীর বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছিলেন। রেমান্ড ও রেজনাল্ড দু'জন মিলে এমন পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, যা নিয়ে তারা বেজায় উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ বহাল রাখতে সক্ষম হন এবং রেমান্ডের অবরোধ এমনভাবে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন যে, এবার তার বাহিনীই উল্টো সুলতান আইউবীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের সব রসদ-পাতি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সৈন্যরা আহত উট-ঘোড়াগুলো যবাই করে খেতে শুরু করে। তার অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য আইউবীর হাতে মারা পড়ে। কিছু বন্দী হয় এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।

রেজনাল্ড-এর ভাগ্য ভাল যে, নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী যখন কার্ক দুর্গে ঢুকে পড়ে, তখন ভেতরের ভীত-সন্ত্রস্ত জনতার হৈ-হুল্লোড় ও ছুটাছুটির ফাঁকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় আজ এই কনফারেন্সে তিনি অংশ নিতে পারতেন না।

আজকের এই বৈঠকে খৃস্টানদের সেই যুদ্ধবাজ সরদারদের বিপুলসংখ্যক উপস্থিত আছেন, যাদেরকে বলা হয় 'নাইট'। এটি একটি উপাধি, যা রাজার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আক্রার পাদ্রীও, যিনি ক্রুশের প্রধান মুহাফিজের মর্যাদায় ভূষিত। তাছাড়া উপস্থিত আছেন গে-অফ লুজিনান, তার ভাই আমারলক ও মুসলমানদের প্রধান শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস। নাইট ও অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গে এ কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন খৃস্টানদের সম্মিলিত ইন্টেলিজেন্স প্রধান হরমুন ও তার দু'-তিনজন সহযোগী। প্রথম প্রথম সবাই চুপচাপ বসে থাকেন, যেন তারা কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। অবশেষে ফিলিপ অগাস্টাস প্রথম মুখ খুলেন। তিনি 'ক্রুশের প্রধান মুহাফিজ'-কে সভাপতি ঘোষণা করে তাকে উদ্বোধনী ভাষণ দেয়ার অনুরোধ জানান।

'আমার সেই লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে লজ্জা লাগছে, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে জীবিত ও সহীহ্ সালামত এসে পৌঁছেছে'– আক্রার পাদ্রী বললেন– 'আমি যীশুখৃষ্টের কাছে লজ্জিত। ক্রুশ দেখলে আমার চোখ লজ্জায় অবনত হয়ে আসে। তোমরা কি সবাই ক্রুশে হাত রেখে অঙ্গীকার করনি যে, জীবন দিয়ে হলেও তোমরা তার দুশমনকে নির্মূল করবে! তোমরা কি এই শপথ নাওনি যে, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবন, সম্পদ ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না? কিন্তু তোমরা ক'জন এমন আছ, যাদের গায়ে সামান্য একটু আচড়ও লেগেছে? একজনও নেই! তোমরা শোবক দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। এবার

ফেলে এসেছ কার্ক। আমি জানি, যারা ময়দানে জয়লাভ করে, তারা মাঝে-মধ্যে পরাজিতও হয়। দু'টি জয়ের পর একটি পরাজয় কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমাদের পরপর দু'টি পরাজয়, দু'টি পিছুটান প্রমাণ করছে যে, ক্রুশ ইউরোপেই বন্দী হয়ে গেছে এবং এমন একটি সময়ও আসন্ন, যখন ইউরোপের গীর্জাগুলোতে মুসলমানদের আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হবে।'

'এমনটা কক্ষনো হবে না'- ফিলিপ অগাস্টাস বললেন- 'ক্রুশের মহান মুহাফিজ! এমনটা হবে না কখনো। আমাদের এই পরাজয়ের পেছনে কিছু কারণ ছিল। আমরা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখেছি এবং আপনার উপস্থিতিতে এখনও বিষদ পর্যালোচনা হবে।'

'সম্ভবত তোমরা ভেবে দেখনি যে, মুসলমানদের গন্তব্য এখন বাইতুল মোকাদ্দাস'- ক্রুশের মহান মুহাফিজ বললেন- 'তোমরা কি জান না, সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার শপথ নিয়েছিল? তোমাদের কি জানা নেই যে, বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা, যার স্বার্থে তারা আপন সন্তানদের পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে?'

'আমরা মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দারীর বীজ বপন করেছি'- ফিলিপ অগাস্টাস বললেন- 'আমরা মুসলমানদের মধ্যে এত গাদ্দার তৈরি করেছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গীকে বাইতুল মোকাদ্দাসের পথে বিভ্রান্ত করে পিপাসায় মেরে ফেলবে।'

'তাহলে সেই মুসলমানরা কারা, যারা তোমাদের হাত থেকে এত শক্ত দু'টি কেল্লা কেড়ে নিল?'- ক্রুশের মুহাফিজ বললেন- 'তোমরা এ কথাটা ভুলে যেও না যে, মুসলমান একটি কঠিন জাতি। মুসলমান গাদ্দারীর পথ অবলম্বন করলে আপন ভাইয়ের গলায়ও ছুরি চালাতে পারে। কিন্তু সেই 'গাদ্দার' মুসলমানেরই মধ্যে যখন জাতীয় চেতনা জেগে উঠে, তখন নিজের গলা কাটিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে। মুসলমান গাদ্দারও যদি হয়ে যায়, তোমরা তাদের উপর ভরসা রেখ না। বেশী দূর যেতে হবে না, কেবল নিকট অতীতের দশটি বছরের ঘটনাবলীতে চোখ বুলাও। হিসাব করে দেখ, গাদ্দার মুসলমানরা তোমাদেরকে কতটুকু ভূখণ্ড দিয়েছে? মিসরে পা রাখার মত সাহস তোমাদের এখনো হয়েছে কি? আজ মুসলমান ফিলিস্তীনে বসে আছে। কাল তোমাদের বুকে এসে বসবে। মনে রেখ আমার বন্ধুগণ! সালাহুদ্দীন আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গী যদি তোমাদের থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস কেড়ে নিতে সক্ষম হয়, তাহলে ইউরোপকেও তোমরা ধরে রাখতে পারবে না। তবে সমস্যা ফিলিস্তীন- ইউরোপের নয়, সমস্যা পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড নিয়ে নয়- আসল সমস্যা হল ক্রুশ ও ইসলামের। এটি দু'টি ধর্ম ও দু'টি আদর্শের লড়াই। এ

দু'টির যে কোন একটির পতন হতেই হবে। কিন্তু তোমরা কি ক্রুশের পতন মেনে নেবে?'

'না, পবিত্র পিতা! এমন কখনো হবে না'– সভার পারিষদবর্গের মধ্যে জোশ সৃষ্টি হয়ে যায়– 'এত নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই মহান পিতা!'

'তাহলে তোমরা সেই কারণগুলো খুঁজে বের কর, যার ফলে তোমাদের একের পর এক পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে'– ক্রুশের মুহাফিজ বললেন– 'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন উপদেশ দিতে পারি না। আমি তো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সৈনিক, আমি কালীসার মুহাফিজ। আমি কালীসার কুমারীদের শপথ করে বলছি, তোমরা দশজন কট্টর মুসলমানকে আমার সামনে নিয়ে আস, আমি তাদেরকে ক্রুশের পূজারী বানিয়ে ফেলব। তোমরা একটু ভেবে দেখ, তোমাদের এত বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্রতম একটি বাহিনীর মোকাবেলা কেন করতে পারছে না? তোমাদের পাঁচশ' আরোহী সৈনিককে একশ' পদাতিক মুসলিম সৈনিক কিভাবে পরাস্ত করে? কারণ একটাই– মুসলমান লড়াই করে ধর্মীয় চেতনা নিয়ে। তারা যখন তোমাদের মোকাবেলায় আসে, আসে বিজয় কিংবা মৃত্যুর শপথ নিয়ে। আমি শুনেছি, তাদের কমান্ডাররা তোমাদের পেছনে চলে যায় এবং অতর্কিত হামলা করে তোমাদের কোমর গুড়িয়ে দিয়ে তোমাদের তীর খেয়ে চালনীর ন্যায় ঝাঝরা হয়ে যায় কিংবা নিরাপদে কেটে পড়ে। ভেবে দেখ, দশ-বারজন মুসলমান দলবদ্ধ হয়ে কিভাবে তোমাদের হাজার হাজার সৈন্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে? এ আর কিছু নয়– ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা মনে করে, খোদা তাদের সঙ্গে আছেন, আছেন খোদার রাসূলও। এমন দুঃসাহসী অভিযানে তারা নির্দেশনা তাদের কমান্ডার থেকে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে কুরআন থেকে। আমি অতি মনোযোগ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, কুরআন তাকে 'জিহাদ' বলে। জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এমনকি ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব নামাযের চেয়েও বেশী। কাজেই তোমরাও যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না।'

আক্রার পাদ্রী তার পরাজিত শাসকমণ্ডলী ও কমান্ডারদের মধ্যে নবপ্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এবং বললেন, তোমরা নিজেরা বসে পর্যালোচনা কর যে, এসব পরাজয়ের কারণগুলো কী, এর দায়-দায়িত্ব কার কার উপর বর্তায় এবং কিভাবে এই পরাজয়গুলোকে বিজয়ে পরিণত করা যায়। নিজেদের সর্বশক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি নিবদ্ধ কর। মনে রেখ, সালাহুদ্দীন আউবী ফেরেশতা নয়– তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। তার শক্তি শুধু একটাই যে,

সে একজন পাকা ঈমানদার।'

পাদ্রী বৈঠক ত্যাগ করে চলে যান।

পাদ্রীর চলে যাওয়ার পর সভাসদদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাকবিতণ্ডার পর তারা কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটি সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা আর জবাবী আক্রমণ করব না; বরং সুলতান আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান করব। তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক দিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে রাখা হবে। এভাবে তাদের রসদ সরবরাহের পথ দীর্ঘ ও অনিরাপদ হয়ে পড়বে।

আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ইউনানী, লাতিনী ও ফ্রিংকীদেরকে অতিশীঘ্র প্রস্তুত করা হবে, যাতে তারা সমুদ্রের তীরে মিসরের উত্তর-পশ্চিমের এতটুকু এলাকা দখল করে নেবে, যাকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং ফিলিস্তীনের প্রতিরক্ষা ও মিসর আক্রমণে কাজে লাগান যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়, তাহল ইসলামী ভূখণ্ডে মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কার্যক্রম তীব্রতর করে তুলতে হবে।

মিসরের সীমান্ত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার ও ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত খৃস্টানদের যে মিশনটি সাফল্যের দোড়গোড়ায় উপনীত হওয়ার পর নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে, গোয়েন্দা মারফত সে সংবাদ কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। গোয়েন্দারা খৃস্টান কর্মকর্তাদের কাছে এ সংবাদও পৌঁছায় যে, আমাদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেসব মুসলমানদেরকে দলে ভিড়িয়েছিল, তারাই তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

বৈঠকে এ তথ্যও পরিবেশন করা হয় যে, অধিকৃত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের জীবনধারাকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরা তাদেরকে শান্তিতে-নিরাপদে পালাতেও দিচ্ছি না। আমরা পলায়নপর কাফেলার পথরোধ করে তাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছি এবং মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে আসছি।

বৈঠকে এ পদক্ষেপটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলা হয় যে, মুসলিম নিধনের এটি একটি উত্তম পন্থা।

বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টবাদের প্রচার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বিরাট অংকের বাজেট। এ-কাজ পূর্ব থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে এবং অর্থও দেদারছে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। একটি সমস্যা হল, যথাস্থানে অর্থ প্রেরণ করতে হচ্ছে উটের মাধ্যমে। বেশ ক'বার এমনও হয়েছে যে, অর্থ ও

স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই উট মিসরের সীমান্ত প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা দস্যুদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে এমন একটি পন্থা বের করে নেয়া দরকার যে, অর্থ-কড়ি, সোনা-দানা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু সেখান থেকেই হস্তগত করা যায়, যেখানে এগুলো ব্যয় করতে হবে। দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ে মাথাও ঘামান হচ্ছে। খৃষ্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান হরমুন সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানেরই ন্যায় অস্বাভাবিক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আগেই ভেবে ঠিক করে রেখেছেন যে, মিসরের ভূমি নিজের মধ্যে এত অধিক সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা গোটা পৃথিবীকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু সেসব ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করা আকাশের তারকা হাতে নেয়ার সমান। এসব ধন-ভান্ডার ফেরাউনদের সমাধিস্থলে পুঁতে রাখা আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোন ফেরাউন মৃত্যুবরণ করত,তখন তার সঙ্গে তার রাজকীয় সব ধন-সম্পদ, সোনা-দানা, হিরা-জহরত পুঁতে রাখা হত। মিসর থেকে ফেরাউনদের এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথাই ভাবছেন হরমুন।

ফেরাউনদের দাফন করার জন্য মাটির নীচে বিশাল পরিসরের একটি মহল নির্মাণ করা হত। ফেরাউনরা নিজেরাই নিজেদের জীবদ্দশায় এই মহল তৈরি করে রেখে যেত। তার জন্য তারা এমন একটি স্থান বেছে নিত, যেখানে পৌঁছা কারো পক্ষে যেন সম্ভব না হয়। মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাকে তথায় দাফন করে সমাধিস্থলটি এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হত যে, নির্মাণকারী কারিগররা ছাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব হত না যে, এটি কিভাবে খোলা যাবে। দাফন কাজ সমাপ্ত করার পর মৃত ফেরাউনের স্বজনরা মহল নির্মাতা কারিগরদের মেরে ফেলত।

ফেরাউনদের বিশ্বাস ছিল, তারা খোদা। আরেক বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরও তাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বহাল থাকবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা পাহাড় কেটে এবং পাহাড়ের নীচে মাটি খনন করে প্রাসাদোপম হলঘর ও অন্যান্য কক্ষ তৈরি করিয়ে তাতে বিপুল পরিমাণ হিরা-জহরত ও সোনা-রূপা গচ্ছিত রাখত। তাছাড়া ভেতরে লাশের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ী, ঘোড়া, গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাসহ নৌকা রেখে দিত। সেবার জন্য দাস-দাসী এবং সুন্দরী নারীও সঙ্গে দেয়া হত। সব মিলে অবস্থা এই দাঁড়াত যে, মারা গেল একজন মানুষ, আর তার সঙ্গে দাফন করা হল বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ও অসংখ্য মানুষ। সবশেষে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে সমাধির মুখ বন্ধ করে দেয়া হত, যেখানে প্রবেশ করা দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেরাউনী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটার পর যখনই যে রাজা মিসরের শাসন

ক্ষমতায় আসীন হন, সবাই ফেরাউনদের সমাধিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে ফেরাউনদের সমাধিসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাদের কেউ কেউ সমাধির ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে আসতে পারেনি; কোথায় হারিয়ে গেছে, তা আর কারো জানা সম্ভব হয়নি। দু'একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসলেও তারা আপাদমস্তক অন্যদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, ফেরাউনরা খোদা ছিল না বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরও তাদের কাছে এমন শক্তি রয়ে গেছে, যার বলে তারা সমাধিতে গমনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকে। মানুষের কাছে এ বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হল, যখনই যে বাদশা যে কোন ফেরাউনের সমাধিতে হাত দিয়েছে, তার রাজত্বে পতন এসেছে। অনেকে আবার একই কারণে ফেরাউনদেরকে অপয়া বলেও মনে করে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যুগেরও পূর্বে খৃস্টানদের জানা ছিল, মিসর গুপ্তধনের দেশ। খৃস্টানরা যে ক'টি কারণে মিসর দখল করতে চাইছিল, এটিও তার একটি কারণ। দীর্ঘ সংঘাত-লড়াইয়ের পর খৃস্টানদের কাছে যখন সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে মিসরের দখল নেয়া কঠিন মনে হল, তখন তারা ভাবতে শুরু করল যে, মিসরীয়দের কারো দ্বারা-ই এসব গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান করতে হবে এবং সেই অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে কাজে লাগাতে হবে।

খৃস্টানরা যেভাবে হোক জানতে পারল যে, মিসর সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে এমন কিছু তথ্য ও নকশা রয়েছে, যাতে কিছু কিছু সমাধির দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। কিন্তু সেসব কাগজ উদ্ধার করা তো আর সহজ ব্যাপার নয়। খৃস্টানরা শুধু এ তথ্য নেয়ার জন্য মিসরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ গুপ্তচর পাঠায় যে, কাগজগুলো কোথায় আছে এবং কিভাবে গায়েব করা যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীলদের হাত করা সম্ভব ছিল না। সুলতান আইউবী যে সময়ে কার্ক ও শোবকের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং যে ঘোলাটে পরিস্থিতিতে তার অনুপস্থিতিতে মিসর ষড়যন্ত্রের উর্বর ভূমি ও বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভের রূপ ধারণ করেছিল, সেই সুযোগে খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন যে, সুলতান আইউবীর সেনাবাহিনীর পদস্থ এক কমান্ডার আহমার দরবেশকে হাত করে নেন। আহমার ছিলেন সুদানী। তার বিরুদ্ধে গাদ্দারীর কোন অভিযোগ ছিল না। সুলতান আইউবীর পরম আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। তিনি সুলতান আইউবীর কমান্ডে যুদ্ধও করেছেন। সেনাবাহিনীতে বেশ সুনাম ছিল তার। পরে জানা গেল যে, এক খৃস্টান মেয়ে

আহমারের মস্তিষ্কে সুদানপ্রেম ও সুলতান আউইবীর বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। এসথিনা নাম্মী এই মেয়েটি আহমারকে মিসরের সীমান্ত অঞ্চলের কিছু এলাকার শাসনক্ষমতা দেয়ার প্রলোভনও দেখিয়েছিল। লোকটি ছিল মুসলমান, কিন্তু খৃস্টানরা তার মাথায় এ দর্শন ঢুকিয়ে দেয় যে, তুমি আগে সুদানী, পরে মুসলমান।

নূরুদ্দীন জঙ্গী যখন কার্ক দুর্গ জয় করে নেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরে গাদ্দারদের মূলোৎপাটনে ব্যস্ত, ততক্ষণে আহমার দরবেশ কয়েকজন খৃস্টান গুপ্তচরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। তিনি কারো মনে এমন কোন সন্দেহ পর্যন্ত জাগ্রত হতে দেননি যে, তিনি দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত তিনি সকলের কাছে এতই বিশ্বস্ত যে, অনায়াসে তিনি পুরনো দলিল-দস্তাবেজ পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখান থেকে তিনি খৃস্টানদের কাঙ্ক্ষিত কাগজপত্রগুলো চুরি করে নিয়ে আসেন।

আহমার দরবেশ যা চুরি করে আনল, সেগুলো মূলত কাগজ নয়- কাগজ ও কাপড়ের মাঝামাঝি একটা কিছু। তাতে স্পষ্ট ভাষায় কিছু লেখা নেই, আছে কতগুলো আঁকিবুঁকি দাগ ও কিছু নকশা-নমুনা। লেখাজোখা কিছু থাকলেও তা সেই ফেরাউনী আমলের ভাষা, যা বুঝবার উপায় নেই।

আহমার দরবেশ কাগজগুলো খৃস্টানদের হাতে তুলে দেন। তারা অনেক চিন্তা-গবেষণা করে, তা থেকে যা উদ্ধার করে তার মর্ম হল, কায়রো থেকে প্রায় আঠার ক্রোশ দূরে একটি পরিত্যক্ত পাহাড়ী অঞ্চল অবস্থিত। যার ভেতরে সম্ভবত হিংস্র প্রাণীও অনুপ্রবেশ করে না। তার-ই অভ্যন্তরে এক স্থানে কোন এক ফেরাউনের সমাধি।

তথ্যটি কতটুকু সঠিক, তা কেউ জানে না। তবু ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে না আহমার। এটা যে ফেরাউনের সমাধি, তার নাম র‍্যামন্স দ্বিতীয়। তার সমাধি অনুসন্ধান ও খনন করার জন্য খৃস্টানরা কায়রোতে ক'জন চতুর, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রেরণ করে। মারকুনী তাদের দলনেতা। ইতালীর অধিবাসী মারকুনী একজন অভিজ্ঞ পর্যটক ও পর্বত বিশেষজ্ঞ। আহমারের নির্দেশনায় তারা এমন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যে, তাদের আসল রূপ ধরার উপায় নেই কারো। তাদের দু'জন এখন আহমারের গৃহভৃত্য। আহমারের সহযোগিতায় এরা ফেরাউনদের সমাধি খনন করে মহামূল্য সম্পদ, হিরা-জহরত উদ্ধার করবে। তারপর খৃস্টানরা সেই সম্পদ ব্যবহার করবে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে, ফেদায়ীদের পেছনে ব্যয় করে সুলতান আইউবীকে খুন করাবে। বিনিময়ে যখন মিসর খৃস্টান কিংবা সুদানীদের দখলে আসবে, তখন খৃস্টানরা আহমারকে কোন এক এলাকার

গবর্নর বানাবে। এতকিছুর বিনিময়ে এই হবে আহমারের পুরস্কার। আহমার এ দায়িত্বও বরণ করে নিয়েছে যে, এই গুপ্তধন অনুসন্ধানকালীন যদি সুলতান আইউবী খৃস্টান কিংবা সুদানীদের উপর আক্রমণ করে বসেন, তাহলে তিনি তার বাহিনীকে আইউবীর যুদ্ধ পরিকল্পনার বিপক্ষে ব্যবহার করবেন।

মিসর থেকে ফেরাউনী গুপ্তধন উদ্ধার করে খৃস্টানদের হাতে তুলে দেয়াই এখন আহমারের একমাত্র মিশন। লোকটির দেল-দেমাগ সম্পূর্ণরূপে খৃস্টানদের কব্জায়। অভিযানের যে দু'সদস্য ভৃত্যবেশে তার ঘরে অবস্থান করছিল, মারকুনীর নেতৃত্বে তাদেরকে সমাধি অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন তিনি। জায়গার নকশাটাও সঙ্গে দিয়ে দেন। অপর এক গোয়েন্দার মাধ্যমে হরমুনের নিকট সংবাদ পৌঁছান যে, গুপ্তধন অনুসন্ধানের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। হরমুন কনফারেন্সে খৃস্টান সম্রাট প্রমুখদের অবহিত করেন যে, এ সমাধির সন্ধান যদি পেয়েই যাই, তাহলে তা থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার হবে, তা দ্বারা মিসরীয়দের হাতেই মিসরের মূল উপড়ে ফেলা যাবে। হরমুনের মুখে সম্ভাব্য সাফল্যের আনন্দের দ্যোতি।

১১৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন। কায়রো থেকে আঠার ক্রোশ দূরে একস্থানে তিনটি উট দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি উটের পিঠে একজন করে আরোহী। প্রত্যেকের মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢাকা। একজন চোগার পকেট থেকে চওড়া একটি কাগজ বের করে। খুলে গভীর দৃষ্টিতে দেখে সঙ্গীদের বলে, ঠিক আছে, জায়গা এটাই। তিনজনই উটের পিঠে বসা। তার ইশারা পেয়ে উট তিনটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

সম্মুখে দেয়ালের মত খাড়া দু'টি টিলা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে সরু রাস্তা, যেখান দিয়ে একটি উট চলতে পারে। এক সারিতে উট তিনটি ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরের পর্বতগুলো আকারে এমন, যেন ছাদবিহীন বিশাল এক প্রাসাদ। বালির অন্তহীন সমুদ্রে এ পার্বত্য এলাকাটি তিন-চার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাইরে এখানে-ওখানে অনেকগুলো টিলা ও চত্বর। পেছনে শক্ত মাটির পাহাড়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার অনেক আগেই এখানে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কেউ কখনো এ ভূতুড়ে পার্বত্য এলাকার ভেতরে প্রবেশ করার সাহস করেনি। করবেই বা কেন, এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার প্রয়োজনই তো কারো হচ্ছে না। মরুভূমির মুসাফিরদের প্রয়োজন পড়ে শুধু পানির। কিন্তু এমন শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে পানি পাওয়া যাবে ভুলেও তো ভাবে না কেউ।

এলাকাটি মানুষের কোন গমন পথের পার্শ্বেও নয়। মাইলের পর মাইল

দূর থেকে চোখে দেখা যায় শুধু। এলাকা সম্পর্কে জনসমাজে অনেক ভীতিকর কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। মানুষ বলাবলি করে, এটি নাকি শয়তানের আড্ডাখানা। আল্লাহ যখন শয়তানকে আকাশ থেকে জমিনে নামিয়ে দেন, তখন শয়তান এখানেই অবতরণ করেছিল। সামরিক দিক থেকেও এলাকাটির কোন গুরুত্ব নেই। সে কারণে সৈন্যরাও কখনো এ এলাকার ভেতরে প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

মিসরের এ ভয়ংকর ভূখণ্ডের ইতিহাসে এ তিনজন মানুষই বোধ হয় প্রথম, যারা এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করল। এর ভেতরে তাদের ঢুকতে হবেই। কারণ, পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ও নকশা এ স্থানকেই চিহ্নিত করছে। সন্দেহে ফেলে দিল শুধু নকশার একটি রেখা। রেখাটা একটি নদীর। কিন্তু এখানে কখনো কোন নদী ছিল না। চিহ্নিত স্থানে এখন চোখে পড়ছে অনেকখানি লম্বা একটি নিম্নাঞ্চল, যার প্রস্থ বার কি চৌদ্দ হাত। ভেতরের বালির আকার-আকৃতি প্রমাণ করছে, শত শত বছর আগে এ পথে পানি প্রবাহিত হত। এই নিম্নাঞ্চলের পরিধি নিকটে কোথাও গিয়ে থেমে যাওয়ার পরিবর্তে চলে গেছে নীল দরিয়া অভিমুখে। উষ্ট্রচালকরা নিশ্চিত যে, তারা যে জায়গার অনুসন্ধান করছে, এটিই সে জায়গা।

অভিযানের দলনেতা মারকুনী ও তার দু'সঙ্গী সবাই খৃস্টান। তারা সুলতান আইউবীর এক কমান্ডার আহমার দরবেশ– এর দিক-নির্দেশনায় ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়-এর সমাধির অনুসন্ধানে এসেছে। নকশা অনুযায়ী সঠিক জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে তারা। এবার ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে নকশার তথ্য কতটুকু সঠিক।

মারকুনী স্বাভাবিক কণ্ঠে তার সঙ্গীদের বলল, নিজেকে খোদা দাবিদার ফেরাউন নিজের শেষ বিশ্রামাগার এ জাহান্নামে বানাতে এসেছে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আহমার ও হরমুন আমাদেরকে অনর্থক এক পরীক্ষায় ফেলে দিলেন!

মারকুনী কঠিনপ্রাণ মানুষ। হিম্মত হারাবার মত লোক নয়। সকলের সামনে এগিয়ে চলছে সে। পেছনে সঙ্গীরা। অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে তারা। এলাকার রূপ-আকৃতি একস্থানে একরকম। মাটির রং কোথাও গাঢ় বাদামী, কোথাও খয়েরী, কোথাও বা লাল। স্থানে স্থানে বালির উঁচু উঁচু ঢিবি। কোথাও মাটির খাড়া টিলা। ঢালু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বালি গড়িয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে।

আরো অনেকখানি এগিয়ে যায় মারকুনী। সামনে আর পথ নেই। মারকুনী ডানে-বাঁয়ে তাকায়। একদিকে একটি টিলা চোখে পড়ে তার। টিলার মধ্যখানে এমনভাবে ফাটা, যেন ভূমিকম্পে ফেটে ফোকর হয়ে গেছে। মারকুনী সেই

ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখতে পায়, একটি গলিপথ চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। উটের চলা কঠিন হবে মনে হয়। তবু মারকুনী তার উটটি ঢুকিয়ে দেয় সরু গলির ভেতর। পেছনে পেছনে ঢুকে পড় অন্য দু'জন সঙ্গীও। দু'পার্শ্বের টিলার দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলতে শুরু করে উটগুলো। আরোহীরা পা বাইরে রাখতে পারছে না। তাই তুলে রেখে দিয়েছে উটের উপর। উটগুলোর পেটের ঘষায় টিলার দেয়ালের মাটি খসে নীচে পড়ছে। পথটা ক্রমেই উঠে গেছে উপরদিকে। মারকুনী এগিয়ে চলছে সঙ্গীদের নিয়ে। উটের পায়ের আঘাতে দু'পার্শ্বের টিলা দু'টো কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি টিলা দু'টো ভেঙ্গে পড়ে দু'দিক থেকে চাপা দিয়ে পিষে ফেলবে তিনটি উট ও তাদের চালকদের।

সামনে অগ্রসর হয়ে উপরদিকে তাকায় মারকুনী। দূর উপরে টিলার উভয় চূড়া পরস্পর মিশে গেছে। সম্মুখে আবছা অন্ধকার। কিন্তু দূরে একস্থানে আলোর মত চোখে পড়ে, যাতে মারকুনীর মনে আশা জাগে, ও পর্যন্তই গলি শেষ; তারপর প্রশস্ত জায়গা।

সরু গলিপথটি এখন যেন একটি সুড়ঙ্গ। উটের পায়ের আওয়াজ ভীতিকর এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে তাতে। মারকুনী সামনের দিকে এগিয়ে চলে। রাস্তা এখানে একটিই; ফলে পথ ভোলার আশংকা নেই। সামনে যে আলো পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর সুড়ঙ্গপথ শেষ হয়ে আসছে।

মারকুনী সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা। দাঁড়িয়ে যায় তিনটি উট। মারকুনী চারদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নতুন জায়গাটি দেখে নেয় এক নজর। এখানে চতুর্দিকে পুরাতন একটি দুর্গের সুউচ্চ অনেকগুলো প্রাচীর চোখে পড়ল। দুর্গটি মানুষের নির্মিত নয়- প্রাকৃতিক। এলাকাটি মূলত পাহাড়ী। পাহাড়গুলো তিন-চারশ' গজ পর্যন্ত ঢালু। কোনটি অনেক উঁচু, কোনটি নিচু। গোলাকার এই জায়গাটা চারদিক থেকেই বন্ধ বলে মনে হল। মারকুনী উটগুলো একস্থানে বসিয়ে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করল। বালি-মাটির পাহাড়। হাঁটতে হচ্ছে পা টিপে টিপে। পা ফস্‌কে পড়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল।

এলাকায় কোন রাস্তা পাওয়া গেল না। একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পায়ে হাঁটা যায়, এমন একটি ফাঁকা জায়গা। সে পথ ধরেই হাঁটছে মারকুনী ও তার সঙ্গীরা। এলাকার মাটি ও টিলা প্রমাণ করছে, শত শত বছর যাবত এখানে কোন মানুষের পা পড়েনি।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মারকুনী ও তার সঙ্গীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে। ডানদিকের পাহাড়ের কোলঘেঁষে পা টিপে টিপে হাঁটার চেষ্টা করছে অভিযাত্রী দল। বাঁ-দিকের এলাকাটি নীচের দিকে চলে গেছে অনেক দূর

পর্যন্ত। এটি সুবিশাল ও গভীর এক গর্ত। এখান থেকে নীচে পতিত হওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। গর্তের অপর পাড়েও উঁচু উঁচু পাহাড়।

'তুমি কি বিশ্বাস কর যে, র‍্যামন্স ফেরাউনের জানাযা এ-পথে অতিক্রম করেছিল?' মারকুনীকে জিজ্ঞেস করল তার এক সঙ্গী।

'আহমার দরবেশ তো এ পথের কথাই বলেছেন'– মারকুনী বলল– 'আমি নকশাটা যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে বুঝা যায়, আমাদের রাস্তা এটিই। র‍্যামন্সের মৃতদেহ অতিক্রম করেছিল অন্য পথে। সে পথটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেটি ছিল একটি গোপন পথ, যা শত শত বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে পথটি খুঁজে বের করতে পারলে আমরা র‍্যামন্স-এর সমাধি পেয়ে যাব।'

'যদি বেঁচে থাকি, তবেই তো!'

'হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারি না'– মারকুনী বলল–'তবে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সমাধি পর্যন্ত যদি পৌঁছতে পারে, তাহলে তোমাদের দু'জনকে লাল করে দেব।'

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথ এখন খানিকটা চওড়া। পার্শ্বের গর্তের পরিধিও শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে এমন দু'টি পাহাড়, যার পাদদেশ একটির সঙ্গে অপরটি মিলিত। এ দু'পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে তারা ঢুকে পড়ে। সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর এখন সামনে আর পথ নেই। পাহাড় দু'টি এখানে এসে মিলে গেছে। তারা বাঁ-দিকে উপরে ওঠে যায়। শ' খানেক গজ উপরে ওঠার পর সরু একটি গলি চোখে পড়ে। গলিটি সেখান থেকে বেয়ে গেছে নীচের দিকে। চারদিকের পাহাড়ী পরিবেশ অত্যন্ত ভীতিকর মনে হল। তারা সরু গলিপথ বেয়ে নীচের দিকে নেমে যায়।

কয়েকটি বাঁক ঘুরে আরা নীচে নেমে আসে। সম্মুখে বিশাল-বিস্তৃত সুগভীর এক খাদ। এত গভীর যে, খাদের তলদেশ দেখা যায় না। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সে এক ভীতিকর পরিবেশ। গলিপথ অতিক্রম করে বাইরে বের হয়ে এ দৃশ্য দেখেই কয়েক পা পিছিয়ে আসে মারকুনী ও তার সঙ্গীরা।

এখানকার আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। মাটির সঙ্গে কি যেন এক ধাতু মিশ্রিত, যার তাপেই গরমটা এত অসহ্যকর। পাহাড়ের পাদদেশে বালুকারাশি চিকচিক করছে। সূর্যতাপ এত প্রখর যে, বালি থেকে ধুঁয়ার মত উঠছে।

খাদের এক পার্শ্বে আপনা-আপনি গড়ে উঠা একটি দেয়াল চোখে পড়ল। এটি মূলত মাটি ও বালির টিলা, যা দেখতে দেয়ালের মত। টিলার উপরটা যতটুকু চওড়া, নীচটাও ঠিক ততটুকু। পুরু আধা হাতের বেশী হবে না। উপরটা কোথাও গোলাকার, যার উপর দিয়ে অতিক্রম করা অত্যন্ত

বিপজ্জনক। তবে মারকুনীকে খাদ পার হতে হলে এই দেয়াল বেয়েই হতে হবে, যা পোলসেরাত অতিক্রম করার নামান্তর। দেয়ালটার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ গজেরও বেশী হবে। মারকুনীর এক সঙ্গী বলল, 'আমার মতে এর উপর দিয়ে অতিক্রম না করে তুমি আত্মহত্যার অন্য কোন ভাল পথ বেছে নাও।'

'গুপ্তধনের ভাণ্ডার রাস্তায় পড়ে থাকে না'— মারকুনী বলল— 'আমাদেরকে এ পথেই অতিক্রম করতে হবে।'

'আর ফস্‌কে নীচে জাহান্নামের আগুনে পড়তে হবে।' বলল অপর সঙ্গী।

'আমরা কি ক্রুশে হাত রেখে শপথ করিনি যে, ক্রুশের মর্যাদা ও ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব?' মারকুনী বলল— 'আমাদের সহকর্মীরা কি যুদ্ধের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করছে না? আমি কাপুরুষের ন্যায় ফিরে গিয়ে আহমার দরবেশকে বুঝ দিতে পারি যে, শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেখানকার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে নদী ছিল, এখন সেখানে পাহাড় আর নকশার যেখানে পাহাড় দেখান হয়েছে, সেখানে এখন কিছুই নেই; কালের বিবর্তনে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কাপুরুষ সাজতে পারব না, আমি মিথ্যা বলব না। তোমাদের মত আমার মনেও ভয় ধরে গেছে। আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তোমরা আমার মনের ভীতি বৃদ্ধি কর না বন্ধুরা। তোমরা যদি আমার সঙ্গ না দাও, তাহলে তা ক্রুশের সঙ্গে প্রতারণা বলে গণ্য হবে এবং তার শাস্তি হবে বেদনাদায়ক। আমি তোমাদের আগে আগে হাঁটব। কোথাও পা ফস্‌কে পড়ার আশংকা দেখা দিলে বসে পড়বে; ঘোড়ার পিঠে যেভাবে বস, ঠিক সেভাবে। তারপর বসে বসেই সামনে অগ্রসর হতে থাকবে।'

হঠাৎ গরম বাতাসের ঝাপটা তীব্র হতে শুরু করে। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে বালুকারাশি উড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো নারীর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। তারা শুনতে পাচ্ছে যে, দু'-তিনজন নারী একযোগে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করছে। মারকুনীর সঙ্গীরা ঘাবড়ে যায়। মারকুনী কান খাড়া করে বিষয়টা অনুধাবন করার চেষ্টা করে। এক সঙ্গী বলল, 'এই জাহান্নামে কোন মানুষ জীবিত থাকতে পারে না; এরা মানুষ নয়- প্রেতাত্মা।'

'এসব কিছুই নয়'— মারকুনী বলল— 'প্রেতাত্মাও নয়, জীবন্ত নারীও নয়। এটা বাতাসের শব্দ। এ এলাকায় কোন কোন টিলায় লম্বা লম্বা ছিদ্রপথ আছে, যা উভয় দিক থেকে খোলা। কোন কোন টিলা এমন যে, সেগুলোর গা ঘেঁষে যখন বাতাসের ঝাপটা অতিক্রম করে, তখন এ ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়, যা তোমরা এ মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছ। এতে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

তবু মারকুনীর সঙ্গীদের ভয় কাটছে না। মারকুনীর ব্যাখ্যায় তারা আশ্বস্ত

হতে পারছে না যে, এ কান্নার শব্দ কোন জ্বিন-ভূত বা প্রেতাত্মার নয়। মারকুনীর ব্যাখ্যা তারা মেনে নিতে পারল না।

বাতাসের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উড়ন্ত বালুকারাশি মেঘের মতো ছেয়ে গেছে। ফলে এখন আর বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রথমে মারকুনী দেয়ালের উপর পা রাখে। জায়গাটা এত কাঁচা যে, বালি মাটিতে মারকুনীর পা ধসে যায়। মারকুনী আরেক পা তুলে সম্মুখে অগ্রসর হয়। তাকায় নীচের দিকে। খাদের গভীরতা দেখে দুঃসাহসী অভিযাত্রী মারকুনীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে। খাদের তলা দেখা যায় না। মনে হচ্ছে এর কোন তলা-ই নেই।

মারকুনী কয়েক পা এগিয়ে যায়। এখানে ডানে-বাঁয়ে কোন টিলা নেই। মারকুনী হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন। কান্নার শব্দ আরো উচ্চ হয়ে যায়।

মারকুনী তার সঙ্গীদের বলল, 'পা টিপে টিপে সাবধানে এগিয়ে আস। নীচের দিকে একদম তাকাবে না। এই ভেবে অগ্রসর হও, যেন তোমরা সমতল ভূমিতে হাঁটছ।'

মারকুনীর সঙ্গীদ্বয় পূর্ব থেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত। পা কাঁপছে, হাঁটু থর থর করছে। কাঁপছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তবু দেয়ালের উপর উঠে তারা কয়েক পা অগ্রসর হয়। প্রবলবেগে বয়ে যাওয়া বাতাস তাদের পা উপড়ে ফেলে। গা দুলতে শুরু করে। মারকুনী তাদের সাহস যোগাচ্ছে আর ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

দেয়ালের মধ্যখানে পৌছে যায় মারকুনী। সামনে দেয়ালের কিছু অংশ ভাঙ্গা এবং নীচু। প্রস্থ এত কম যে, দাঁড়িয়ে হাঁটা সম্ভব নয়। মারকুনী বসে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠে বসার মত করে দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে অবস্থায়ই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। দেয়ালের প্রস্থ ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ ও গোল হয়ে চলেছে। মারকুনী খুব সাবধানে অগ্রসর হতে থাকে। পেছনে তার সঙ্গীদ্বয়ও এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক সঙ্গীর ভীতিপ্রদ আর্তচীৎকার ভেসে আসে– 'মারকুনী, আমাকে ধর।'

কিন্তু ধরার জন্য তার কাছে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটি একদিকে কাৎ হয়ে যায় এবং কোন অবলম্বন না থাকার কারণে পড়ে যায়। তার চীৎকারের শব্দ শুনছে মারকুনী ও তার অপর সঙ্গী। শব্দটা ক্রমান্বয়ে দূরে চলে যায়। তারপর ধপাস করে ভারী কোন বস্তু পড়ে গেলে যেরূপ শব্দ হয়, তেমন একটা আওয়াজ শোনা যায় এবং চীৎকারের শব্দ থেমে যায়। সঙ্গীর পরিণতি বুঝতে বাকী নেই মারকুনীর। মারকুনী নীচের দিকে তাকায়। জাহান্নামসম অতল খাদে পড়ে যাওয়া সঙ্গীর আর্তচীৎকারের ধ্বনি ভয়ানক এই বিরান ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনো।

'আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ মারকুনী'– অপর সঙ্গী বলল। কণ্ঠস্বর থর থর করে কাঁপছে তার– 'আমি এমন করে মরতে চাই না।'

মারকুনী তার সঙ্গীকে সাহস যোগায়। নিজে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। দেয়াল এখন উপরের দিকে উঠছে। মারকুনী বসে বসেই এগিয়ে চলছে। নারী কণ্ঠের সেই ক্রন্দন শব্দ এখনো কানে আসছে যথারীতি। পড়েযাওয়া সঙ্গীর চীৎকারধ্বনিও প্রতিধ্বনির ন্যায় ঘুরে ফিরছে।

এখন দেয়ালটা কিছু চওড়া। মারকুনী মোড় ঘুরিয়ে সঙ্গীর হাত ধরে। ধীরে ধীরে দেয়াল বেয়ে দু'জন উঠে যায় উপরে। দেয়াল খানিকটা পুরু হওয়ার কারণে কিছুটা অনায়াসে এগুতে পারার কথা। কিন্তু বাতাসের গতি এতই তীব্র যে, ভারসাম্য রক্ষা করে চলা দুষ্কর। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এক সময় দেয়াল পার হয়ে তারা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মারকুনী। পাশাপাশি সঙ্গীর নির্মম মৃত্যুতে তার বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠে। স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সঙ্গী হারানোর বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

সম্মুখে দু'টি টিলার মধ্যখান দিয়ে একটি সংকীর্ণ পথ। একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে মারকুনী। মারকুনীর সঙ্গী তাকে জিজ্ঞেস করে, 'জেফ্রে কি মরেই গেল? কোনভাবে কি তাকে উদ্ধার করা কিংবা এক নজর দেখা যায় না? আমরা কি লোকটাকে এভাবে রেখেই ফিরে যাব?'

সঙ্গীর প্রতি তাকায় মারকুনী। তার চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'না' সূচক মাথা নাড়ে। মারকুনীর চোখে পানি এসে গেছে। কিছু না বলে অপর সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। তারপর ধীরপায়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে।

এটিও একটি গলিপথ। মারকুনী যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে, পথটা ততই প্রশস্ত হচ্ছে। মারকুনী সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের সৌভাগ্য যে, যেদিকেই যাই পথ পেয়ে যাই। তাও একটিমাত্র পথ। পথ একাধিক হলে ধাঁধাঁয় পড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।'

গলি শেষ হয়ে গেছে। শেষ প্রান্তের রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। সামনে পাহাড়ের চড়াই। এখনও তীব্র বাতাস বইছে। এই ভয়ানক এলাকায় কতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, সে হিসাব নেই মারকুনীর। সে এতটুকুই জানে যে, জগত থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্রুশের নামে দেওয়ানা হতে চলেছে মারকুনী। ফেরাউনের সমাধি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে এতটুকুই জানে যে, সেখান থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের ক্রয় করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

সন্ত্রস্ত সঙ্গীকে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলে মারকুনী। এখন তারা যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, বাতাস সেদিক থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে। পাহাড়ের চড়াই সরে গেছে ডানে-বাঁয়ে। সামনে সুবিস্তৃত নীল আকাশ চোখে পড়ছে। মারকুনী চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় মারকুনী। নাক টেনে বাতাস শুকে সঙ্গীকে বলে, 'তুমিও শুকে দেখ, বাতাসের ঘ্রাণে পাহাড়ী এলাকার ঘ্রাণ না?'

'তোমার মাথাটা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে'– মারকুনীর সঙ্গী বলল- 'পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ের ঘ্রাণ থাকবে না তো থাকবে কী? তুমি বোধ হয় ভাবছ, তুমি এখন ইতালীতেই আছ। তোমার নাকে সম্ভবত তোমার বাড়ির ঘ্রাণ আসছে।'

সঙ্গীর খোঁচামারা কথায় মারকুনীর কোন ভাবান্তর ঘটল না। চেহারায় তার অন্য প্রতিক্রিয়া। বাতাস শুকে শুকে কি যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে সে। তারপর সঙ্গীকে বলল, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ যে, পাহাড়ের কাঠিন্য আমার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এখানে তো পানি থাকতে পারে না। আমি সম্ভবত কল্পনায় খেজুর, সবুজ-শ্যামলিমা ও পানির ঘ্রাণ শুকছি। এসব ঘ্রাণ তো আমার চির পরিচিত। বোধ হয় আমার ঘ্রাণশক্তি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। এই জাহান্নামে পানির চিহ্নও থাকার কথা নয়।'

'মারকুনী!'– হঠাৎ মারকুনীর সঙ্গী তার বাহু চেপে ধরে তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে– 'আমিও একটি ঘ্রাণ শুকছি– মৃত্যুর ঘ্রাণ। মনে হচ্ছে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চল বন্ধু! যেদিক থেকে এসেছি, সে-পথেই ফিরে যাই। তুমি যদি মনে কর আমি ভীরু, তাহলে তুমি আমাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে পরীক্ষা নাও, দেখবে আমি একশ' মুসলমানের গলা না কেটে মরব না।' লোকটির কণ্ঠে ভীতির ছাপ, দু'চোখে টলটলায়মান অশ্রুর ফোঁটা।

মারকুনী স্বল্পবাক মানুষ। সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমরা একশ' নয়– এক হাজার মুসলমানের গলা কাটব; তারপরও মরব না। তুমি আমার সঙ্গে থাক।'

মারকুনী সঙ্গীকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। চড়াই বেশী উঁচু নয়। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এখন আর রোদের তাপ নেই, কিরণও নেই। সারাদিনের ক্লান্তিতে পা আর এগুতে চাচ্ছে না। তারা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পা টেনে হাঁটছে। একসময় পৌঁছে যায় পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায়। ধূলিবালিতে তাদের চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে গেছে। দু'চোখ মেলে দেখে মারকুনী। সামনে ঢালু ও ছোট ছোট পাথর। একটি পাথরের উপর উঠে দাঁড়ায় সে। সঙ্গীকে ডাক দিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে। সঙ্গীকে

উদ্দেশ করে বলে, 'তোমার যদি মরুভূমি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে সামনে মরিচিকা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ, ওটা আসলেই মরুভূমি কিনা।'

সঙ্গী মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকায়। চক্ষুদয় বন্ধ করে আবার খোলে। আবার গভীরভাবে নিরীক্ষা করে তাকায়। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, ওটা মরিচিকা নয়।

দৃশ্যটা আসলেই মরিচিকা ছিল না। কতগুলো খেজুর গাছের মাথা তাদের চোখে পড়ছিল। পাতাগুলো হরিদ্রা বর্ণের। গাছগুলোর অবস্থান নিম্ন এলাকায় বলে মনে হল বেশ দূরে।

মারকুনী পাথরের উপর থেকে নেমে সম্মুখে চলে যায়। এবার মনে ভয় ধরে গেছে দুঃসাহসী খৃস্টান সেনাকমান্ডার মারকুনীর। সঙ্গী পেছনে পেছনে হাঁটছে তার। জায়গাটায় নানা বর্ণ ও নানা আকারের পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। কোনটি এমন, যেন একজন মানুষ হাঁটুতে মাথা গেড়ে বসে আছে। কোনটি বেশ বড়, কোনটি ছোট। এগুলোর ফাঁকে পথের সন্ধান করছে মারকুনী।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে আরো নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো স্পর্শ করছে যেন অস্তাচলগামী লাল সূর্যটা। নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে মারকুনীর। ভয়ের তীব্রতায় বুকটা ধড়-ফড়, দুরু দুরু করছে। পা টেনে টেনে পেছনে পেছনে হেঁটে চলে অসহায় সঙ্গী।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় মারকুনী। মোড় না ঘুরিয়েই ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে পেছন দিকে। মনে হয় মারকুনী ভয়ংকর কিছু দেখেছে। সঙ্গীও তার কাছে এসে দাঁড়ায় এবং বিস্ময়ভরা চোখে তার প্রতি তাকায়।

✿ ✿ ✿

একটি নিম্ন এলাকা দেখতে পাচ্ছে মারকুনী ও তার সঙ্গী। এলাকাটির বিস্তার এক বর্গ মাইলের কম নয়। চারপাশে মাটি ও বালির উঁচু উঁচু প্রাকৃতিক দেয়াল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামলে ঢাকা। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। অনেকগুলো খেজুর গাছ চোখে পড়ছে। বুঝা যাচ্ছে, ওখানে প্রচুর পানি আছে।

এই জাহান্নামে এমন সবুজ-শ্যামল এলাকা চোখের ভেল্কি নয় তো? না, মারকুনী যা দেখছে, সবই সত্য, বাস্তব। এই ভূখণ্ডের ঘ্রাণই একটু আগে মারকুনী অনুভব করেছিল।

তার থেকে সামান্য সামনে কতগুলো পাহাড় দেখতে পায় মারকুনী। পাহাড়গুলো মাটিরও নয়, বালিরও নয়– পাথরের। রং কালচে। হঠাৎ মারকুনী নিজে দ্রুত বসে পড়ে, টেনে সঙ্গীকেও বসিয়ে দেয়। আরো একটি বিস্ময়কর

কি যেন দেখতে পেয়েছে সে। দু'জন মানুষ নিম্নভূমিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আপাদমস্তক উলঙ্গ। এক চিলতে সুতাও নেই পরনে। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। বেশ সুদর্শন। লোকগুলো পুরুষ।

হঠাৎ করে একদিক থেকে বেরিয়ে আসে এক মহিলা। অন্যদিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। সেও মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিবস্ত্র। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত। আকার-গঠনে এদের কাউকেই কাফ্রি বা জংলী বলে মনে হয় না।

'এরা প্রেতাত্মা'– মারকুনীর সঙ্গী বলল- 'এরা মানুষ নয় মারকুনী! সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চল, পেছনের দিকে পালিয়ে যাই। রাতে এরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। তুমি বিশ্বাস কর মারকুনী! আর কিছু সময় এখানে কাটালে আমরা জীবিত ফিরে যেতে পারব না! চল, পেছন দিকে ফিরে যাই।'

মারকুনীরও ধারণা, এরা মানুষ নয়, অন্য কিছু হবে। তবু সঙ্গীকে বুঝাতে চেষ্টা করছে, এরা মানুষই; তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ। মারকুনী নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে, আসলে এরা কি? মানুষই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এরা কারা? এমন উলঙ্গ কেন? এরা তো বাতাসে উড়ছে না; মাটিতেই হাঁটছে। দূরে একস্থানে তিনটি শিশুকে দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটি করতে দেখতে পায় মারকুনী। শিশুগুলো এদেরই সন্তান হবে নিশ্চয়। ওদের চলাফেরা তো ঠিক মানুষেরই ন্যায়।

মারকুনী উপুড় হয়ে পেটে ভর করে সরিসৃপের ন্যায় সামনে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গীও তার পার্শ্বে গিয়ে শুয়ে পড়ে। দু'জন শুয়ে শুয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। ওখানকার দেয়ালগুলো খাড়া নয়– কিছুটা ঢালু। বালিও প্রচুর। মারকুনীর সঙ্গী বোধ হয় আরো একটু সামনে এগুবার চেষ্টা করে কিংবা কি হল কে জানে: হঠাৎ সে পড়ে যায় এবং গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পতিত হয়।

ওখান থেকে উপরে উঠে আসা অসম্ভব। মারকুনী পেছনে সরে গিয়ে এমন একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে, যেখান থেকে নীচের অবস্থা দেখা যায়। মারকুনীর সঙ্গী যে ঢালু দিয়ে নীচে পড়ে গেল, তার উচ্চতা ত্রিশ কি চল্লিশ গজের বেশী হবে না। মারকুনী দেখতে পেল, তার সঙ্গী ওঠে আসার চেষ্টা করছে। সে তার সঙ্গীকে কোন সাহায্য করতে পারছে না।

যে উলঙ্গ পুরুষ দু'জন স্বাভাবিক গতিতে এদিকে আসছিল, তারা এবার দৌড়াতে শুরু করে। দৃশ্যটা উপর থেকে দেখে ফেলে মারকুনী। কিন্তু তার সঙ্গী বিষয়টা টের পায়নি। মারকুনী তাকে ডাক দিয়ে সতর্কও করতে পারছে না। এখানে কোন মানুষ আছে, তা বুঝতে দিতে চাইছে না সে। লোক দু'জন এসে মারকুনীর সঙ্গীকে পেছন থেকে ঝাঁপটে ধরে। তার সঙ্গে খঞ্জর আছে,

আছে ছোট তরবারীও। কিন্তু অস্ত্র খুলে হাতে নেয়ার মওকা পেল না সে। লোক দু'জন তাকে টেনে নীচে নামিয়ে ফেলে। যে উলঙ্গ মহিলা দু'জন কোথাও যাচ্ছিল, ছুটে আসে তারাও। এসে পড়ে ক্রীড়ারত শিশুরাও। তারা নিজ ভাষায় কাকে যেন ডাক দেয়। কোথা থেকে ছুটে আসে দশ-বারজন মানুষ। তারাও সবাই উলঙ্গ। একজন তার বন্ধুর কোমর থেকে তরবারীটা খুলে নেয়। মাটিতে ফেলে দেয়া হয় লোকটাকে। মারকুনী উপর থেকে দেখতে পায়, লোকগুলো তরবারী দ্বারা তার সঙ্গীর ধমনী কেটে ফেলে। দর দর করে লাল টাটকা রক্ত বেরুতে শুরু করে। সবাই নাচতে শুরু করে। কি যেন গাইছে তারা। খিলখিল করে হাসছেও। এমন সময় ক্ষীণকায় এক বৃদ্ধ এসে পড়ে। তার হাতে তার দেহের উচ্চতার সমান লম্বা একটি লাঠি। তাকে দেখে সবাই একদিকে সরে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধের পরনেও কিছু নেই– উলঙ্গ। তার লাঠির মাথায় দু'টি সাপের ফণা। ফেরাউনদের বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন এটা। বৃদ্ধ মারকুনীর সঙ্গীর গায়ে হাত লাগায়। সে এখন নিথর। মারা গেছে মারকুনীর সঙ্গী। বৃদ্ধ নিজের এক হাত উপরে তুলে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলে। তার সঙ্গে উলঙ্গ মানুষগুলো– যাদের মধ্যে দু'জন নারী এবং কয়েকটি শিশু রয়েছে– সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ এখন কি যেন বলছে। সে পুনরায় উপরে হাত উঠায়। এবার সবাই সেজদা থেকে উঠে দাঁড়ায়। একজন বৃদ্ধকে ঢালুর দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, লোকটা ওদিক থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধের ইশারা পেয়ে তারা মারকুনীর সঙ্গীর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে যায়। মারকুনীর মনে ভয় জাগে, এই রহস্যময় মানুষগুলো উপরে উঠে দেখে কিনা যে, নীচে পড়ে যাওয়ার লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে মারকুনী।

সূর্য ডুবে গেছে। জীবনের মায়া ত্যাগ করেছে মারকুনী। জীবন যায় যাক, এ জায়গা এবং এই মানুষগুলোর ভেদ-রহস্য উদ্ধার করবেই সে। তরবারীটা তুলে নেয় ডান হাতে। বাঁ-হাতে খঞ্জর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দেয় একদিকে।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ধীরে ধীরে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই, শব্দ নেই। ভয়ংকর নীরবতা বিরাজ করছে এলাকায়। ডান-বাঁয়ে ও পেছনের দিকে কান রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে মারকুনী। নিম্নাঞ্চলের পাশ ঘেঁষে এগুচ্ছে সে। এবার ক্ষীণ কণ্ঠের শব্দ তার কানে আসতে শুরু করে। শব্দটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। খানিক পর সে যে আওয়াজটা শুনতে পায়, তা নাচ-গান ও শোরগোলের আওয়াজ। আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে এগিয়ে যায় মারকুনী। দেখতে পায় এক ভয়ংকর দৃশ্য।

বাঁ-দিকে আরেকটি প্রশস্ত এলাকা। কয়েকটি মশাল জ্বলছে সেখানে। গাছ-গাছালি আছে সেখানেও। অন্তত পঁচিশজন নারী-পুরুষ ও শিশু গোল হয়ে নাচছে ও গাইছে। তাদের মধ্যখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের উপর ঝুলছে হাত-পা বাঁধা একটি মানুষের লাশ। আগুনে ছেকা হচ্ছে লাশটাকে। মারকুনী বুঝতে পারে এটা তার সঙ্গীর মৃতদেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মারকুনীর। ভয়ানক এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাঠিওয়ালা বৃদ্ধ। লাশের দেহের গোশত কেটে সকলের মাঝে বন্টন করছে বৃদ্ধ।

দৃশ্যটা গভীর রেখাপাত করে মারকুনীর মনে। আর স্থির থাকতে পারল না সে। ফিরে রওনা হয় পিছন দিকে– যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। পথটা মনে আছে তার। সতর্ক পায়ে চলছে মারকুনী। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় পোলসেরাতসম সেই দেয়ালের কাছে, যার উপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল তার এক সঙ্গী। খাদের ভেতর থেকে শিয়ালের চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পায় মারকুনী। মারকুনী বুঝতে পারে, জংলী শিয়ালরা তার সঙ্গীর লাশটা ছিঁড়েকুড়ে খাচ্ছে আর চেঁচামেচি করছে। তার অপর সঙ্গীকে ভক্ষণ করছে জংলী মানুষ। বাতাসের এখন তেজ নেই। মারকুনী অন্ধকারে সাবধানে দেয়ালটা পার হয়ে ওপার চলে যায়।

রাতের এখন শেষ প্রহর। মারকুনী ও তার সঙ্গীদ্বয় যেখানে তিনটি উট রেখে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ঢুকে পড়েছিল, পৌঁছে যায় সেখানে। এবার এক মুহূর্তও দেরী করবে না সে। উটের সঙ্গে বাঁধা মশক থেকে এক ঢোক পানি পান করার বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না তার। চড়ে বসে একটি উটের পিঠে। সঙ্গে নিয়ে নেয় অপর দু'টি। হাঁটতে শুরু করে উট।

❁ ❁ ❁

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। একজন সম্ভ্রান্ত মিসরী বণিকের বেশে আহমার দরবেশের ঘরে প্রবেশ করে মারকুনী। মারকুনীকে দেখেই আহমার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি একা কেন? অন্য দু'জন কোথায়?'

জবাব না দিয়েই ধপাস করে একটি চেয়ারে বসে পড়ে মারকুনী। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক নেই তার। আহমারকে ইঙ্গিতে সামনে বসতে বলে। আহমার মারকুনীর সামনে মুখোমুখি বসে পড়ে। কিছুটা শান্ত হয়ে কথা বলতে শুরু করে মারকুনী। অভিযানের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতি পদের কাহিনী শুনিয়ে যায় আহমারকে।

মারকুনীর দু'সঙ্গীর করুণ মৃত্যুতে একবিন্দু দুঃখ প্রকাশ করলেন না আহমার। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, উলঙ্গ হিংস্র মানুষগুলো মারকুনীর এক সঙ্গীকে খেয়ে ফেলেছে, তখন তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, আচ্ছা, তুমি কি নিজ চোখে দেখেছ যে, ওদের কারো পরনেই কাপড় নেই? তুমি কি সত্যিই বৃদ্ধের লাঠির মাথায় সাপের ফণা দেখেছ? তুমি কি ভালভাবেই দেখেছ যে, তারা আমাদের লোকটির গোশত খাচ্ছে? অভূতপূর্ব কৌতূহল আহমার দরবেশের কণ্ঠে।

'আমি আপনাকে স্বপ্নের কাহিনী শোনাচ্ছি না'– শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলল মারকুনী– 'আমার মাথার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়েছিল, আমি আপনাকে তারই বিবরণ দিচ্ছি। নিজ চোখে যা যা দেখেছি, তা-ই আমি আপনাকে শোনাচ্ছি।'

'ফেরাউনও এ কথাই বলেছেন, যা তুমি শুনিয়েছ'– আহমার দরবেশ বসা থেকে উঠে মারকুনীর কাঁধে হাত রাখলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে অনেকটা চীৎকার করে বললেন– 'তুমি রহস্য উদঘাটন করে ফেলেছ মারকুনী! এরাই সেই লোক, আমি যাদের সন্ধান করছিলাম। এই গোত্রটি ষোল শতক পর্যন্ত ওখানে বসবাস করছে। এরা ভাবতেও পারেনি যে, কালের বিবর্তন তাদেরকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করবে। কাগজের লেখাগুলো তুমি পড়তে পারবে না, আমি পড়তে সক্ষম হয়েছি। তাতে লেখা আছে, 'ধনভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করবে সাপ। কিন্তু আমার সমাধির হেফাজত করবে মানুষ, যারা কয়েক শতক পর সাপ ও হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে। আমার সমাধির সীমানায় কোন মানুষ প্রবেশ করলে রক্ষীরা তাকে খেয়ে ফেলবে। কালের বিবর্তন তাদেরকে উলঙ্গ করে ফেলবে। কিন্তু আমি যেখানে আমার অন্য জগতের ঘর তৈরি করেছি, সেখানে তাদেরকে পোশাক পরান হবে। বাইরের কোন মানুষ তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। যে-ই তাকাবে, সে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'আমি তো জীবিত ফিরে এসেছি!' মারকুনী বলল।

'কারণ, তুমি নীচে যাওনি'– আহমার বললেন– 'তুমি কালো রঙের যে পাথুরে পাহাড়ের কথা বলেছ, তারই পাদদেশে কোন এক স্থানে র‍্যামসের লাশ ও ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা আছে। আর এই উলঙ্গ মানুষগুলো? এদের পূর্বপুরুষরা র‍্যামসের সময় থেকে ওখানে পাহারার দায়িত্ব পালন করছে। তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধর একের পর এক এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এভাবে পনের-ষোল শতাব্দী কেটে গেছে। আমি বলতে পারব না, ওরা কি খেয়ে জীবন বাঁচায়। বোধ হয় হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তারা মরুভূমির পথিকদের শিকার করে সিদ্ধ করে খায়। ওখানে পর্যাপ্ত পানি আছে। খেজুরেরও অভাব নেই। কাজেই ওদের বেঁচে থাকা বিস্ময়কর নয়। তারা আজও ফেরাউনকে খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসে যদি ফাটল ধরত, তাহলে তারা ওখানে থাকত না। তুমি কি তাদের কাছে কোন অস্ত্র দেখেছ?'

'না।'

'সংখ্যায় তারা কতজন হবে?'

'রাতে যখন তারা একত্রিত ছিল, তখন পঁচিশজন ছিল।'

'এমনই হবে। এর চেয়ে বেশী হওয়ার কথায় নয়।'

'আমি তাদের কাছে দু'টি উটও দেখেছি। আরো থাকতে পারে, তবে আমি দেখেছি দু'টোই।'

'তার মানে তারা বাইরেও আসে'– আহমার দরবেশ বললেন– 'বাইরে তারা অবশ্যই আসে। পথচারীদের শিকার করতে বাইরে তাদের আসতেই হয়। শোন মারকুনী, কান পেতে শোন! ওখানে নিশ্চয়ই এমন একটি সোজা পথ আছে, যে পথে তারা বাইরে আসা-যাওয়া করে। সেটি পাহাড়ের কোন একটি গোপন পথ হবে। আমি তোমাদেরকে যে পথের কথা বলেছিলাম, তা এমন কোন পথ নয়, যে পথে বারবার আসা-যাওয়া করা যায়। ওখানে অন্য আরো একটি পথ আছে, যার সন্ধান ঐ হিংস্র উলঙ্গ মানুষগুলোর নিকট থেকে নেয়া যায়। কিভাবে নেয়া যায়, আমি তার পন্থা ভেবে দেখেছি। ওখানে যথারীতি হামলা করা যেতে পারে। তার জন্য তোমার এক সঙ্গী যেখানে খাদে পড়ে গিয়ে মারা গেছে– সেখানে আরো কিছু লোককে মারতে হবে। এই ত্যাগ অত্যন্ত জরুরী। তুমি বল, পঁচিশ-ত্রিশজন লোককে– যাদের মধ্যে নারী-শিশু-বৃদ্ধও আছে– হত্যা করার জন্য এবং তাদের দু'-তিনজনকে জীবিত ধরার জন্য তোমার কত সৈন্যের প্রয়োজন? সর্বনিম্ন সংখ্যা বল। তুমি হবে সে বাহিনীর রাহবার ও সেনাপতি।'

'পরিকল্পনাটা আমি বুঝে ফেলেছি'– মারকুনী বলল– 'আমার মাথায়ও একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা ওদেরকে হত্যা করতে পারি। দু'-তিনজনকে জীবিত ধরাও সম্ভব। কিন্তু আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, তারা ওখানকার সব গোপন তথ্য আমাদেরকে দেবে। গোত্রের অন্যদেরকে মরতে দেখে তারাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তবু মুখ খুলবে না। আমি এমন এক কৌশল অবলম্বন করব যে, তাড়া খেয়ে তাদের দু'একজন বাইরের দিকে পালাতে শুরু করবে আর আমরা তাদের পিছু নেব। আমাদের রাস্তা চেনা হয়ে যাবে।'

'তুমি বড় বিচক্ষণ মারকুনী!'– আহমার দরবেশ বললেন– 'বল, কত লোকের প্রয়োজন?'

'পঞ্চাশজন'– মারকুনী জবাব দেয়– 'অধিকাংশ লোক আমার নির্বাচিত হতে হবে, আমিই তাদেরকে খুঁজে নেব। তবে কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে আমি আমার শর্তের কথা জানাতে চাই।'

'তুমি দাবি অনুপাতে পুরস্কার পাবে– যা চাইবে ঠিক তা-ই দেব।' আহমার বললেন।

'আমি গুপ্তধনের ভাগ চাই'– মারকুনী বলল– 'এমন একটি বিপজ্জনক অভিযান আমার দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয়। আমি একজন গুপ্তচর ও নাশকতা কর্মী। আমাকে ফেরাউনের গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। এটা আপনার নিজের কাজ। পুরস্কার নয়– আমি চাই উদ্ধারকৃত ধনের ভাগ, যা চাইব ঠিক তা। আপনার পরিকল্পনা সফল হলে আপনি তো একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে যাবেন; আর আমি গুপ্তচর গুপ্তচরই রয়ে যাব। কাজেই আমার সম্পদ চাই।'

'এ অভিযান কারো ব্যক্তিগত নয়'– আহমার বললেন– 'এটি মিসর, ক্রুশ ও সুদানের শাসন ক্ষমতা দখল করার খৃস্টীয় পরিকল্পনা।'

নিজ দাবিতে অনড় থাকে মারকুনী। বেকায়দায় পড়ে যান আহমার দরবেশ। আহমার জানেন র‍্যামসের সমাধি পর্যন্ত পৌঁছা মারকুনী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার দাবি মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই আহমারের। মারকুনী বলল, 'কতদিন পর্যন্ত মরুভূমিতে কাটাতে হবে তার কোন ঠিক নেই। শক্ত ও শুকনো খাবার আমি পছন্দ করি না। কাজেই, আমাকে অতিরিক্ত দু'-তিনটি উটও দিতে হবে, যা আমি সঙ্গীদের নিয়ে রান্না করে খাব। আর– আর কুদুমীকেও দিতে হবে।'

'কুদুমীকে?'– বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন আহমার– 'এমন উঁচু স্তরের ভুবনমোহিনী রূপসী গায়িকাকে দেব তোমার সঙ্গে এমন বিপজ্জনক অভিযানে! আর সেও তো যেতে রাজি হবে না!'

'অতিরিক্ত বিনিময় দিলে সে রাজি হয়ে যাবে'– মারকুনী বলল– 'আমি তার জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেব যে, মেয়েটা টেরই পাবে না, সে মরুভূমিতে আছে নাকি কোন বিপজ্জনক মিশনের সঙ্গে আছে। আমি তার মূল্য বুঝি।'

সে যুগের রীতি ছিল, কোন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সফরে গেলে প্রিয়তমা স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে ভাল না লাগলে টাকার বিনিময়ে পছন্দমত কোন নর্তকী-গায়িকা কিংবা বেশ্যা মেয়েকে নিয়ে যেত। সেনা কমান্ডাররাও যুদ্ধের সময় স্ত্রী কিংবা ভাড়াকরা সুন্দরী কোন মেয়েকে সঙ্গে রাখত। সে যুগে রূপসী যুবতী মেয়ে ছিল সোনার চেয়েও দামী। আর সে কারণেই ইহুদী-খৃস্টানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের জন্য নারীকে ব্যবহার করত। কাজেই মারকুনীর ন্যায় একজন দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক অভিযানের নায়কের একটি সুন্দরী নর্তকীকে সঙ্গে নেয়ার দাবি করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু আহমার দরবেশের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে

তার কুদুমীর মত এমন এক পরমাসুন্দরী যুবতী নতর্কীর দাবি উত্থাপন করায়, যার গমনাগমন আমীর ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট। মেয়েটা সুদানের বাসিন্দা। মুসলমান। আর অতিশয় রূপসীই নয়– তার চালচলন, ভাবভঙ্গীমায়ও ছিল অনুপম এক যাদু। বড় বড় ব্যক্তিত্বদের দেমাগ সদা খারাপ করে রাখত মেয়েটা। এই কুদুমী মারকুনীর সঙ্গে বিপজ্জনক এক অভিযানে জনমানবশূন্য ধু-ধু মরু অঞ্চলে চলে যাবে, তা কল্পনায়ও আসে না। কিন্তু মারকুনীর কুদুমীকে চা-ই চাই। শেষ পর্যন্ত আহমার দরবেশকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হল যে, ঠিক আছে, কুদুমীকে পাবে।

কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। পঞ্চাশ ব্যক্তির সন্ধানে নেমে পড়ে মারকুনী ও আহমার। কায়রোতে খৃস্টান গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসীর অভাব নেই। মারকুনী অধিকাংশ লোক তাদের থেকেই নিতে চাইছে। কারণ, তারা তার বিশ্বস্ত। আহমার দরবেশেরও একই অভিমত। একটি নাশকতাকারী গ্রুপ আছে আহমার দরবেশেরও। সুলতান আইউবীর এই সেনাপতি তলে তলে এ গ্রুপটিকে তৈরি করে রেখেছে। তারা সবাই মুসলমান। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খৃস্টানদেরই ন্যায়। আহমার দরবেশ নিজের ঈমান নীলাম করে এ লোকগুলোকেও ঈমান বিক্রেতা বানিয়ে দিয়েছে। এরা সবাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। এদের ওঠাবসা হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের সঙ্গে। এই গ্রুপের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে বাছাই করে নেয় আহমার দরবেশ।

মারকুনী নিজে কুদুমীর নিকট আহমার দরবেশের পয়গাম নিয়ে যায়। আহমার কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি একজন পদস্থ সেনা কর্মকর্তা। আর মিসরে শাসন চলছে কার্যত সেনাবাহিনীর। কুদুমী আহমারকে ভালভাবে চেনে ও শ্রদ্ধা করে। মেয়েটি অম্লান বদনে সম্মত হয়ে যায়। মারকুনী তাকে জানায়, আমরা ফেরাউনের সমাধি থেকে হিরে-জহরত উদ্ধার করতে যাচ্ছি। শুনে কুদুমী এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠে যে, সে এক্ষুণি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মারকুনী অত্যন্ত সুচতুর ও সতর্ক মানুষ। মুখের কথায় রাণী কিওপেট্রা বানিয়ে ফেলে কুদুমীকে। কুদুমী একজন নর্তকী। তার চেতনা বলতে কিছু নেই। সে চেনে শুধু নিজের রূপ-যৌবন, অর্থ আর হিরে-জহরত। নিজের রূপ-যৌবনে কখনো ভাটা পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস। মারকুনী তাকে একথা জানায়নি যে, সমাধি থেকে উদ্ধার করা গুপ্তধন কোথায় কি কাজে ব্যয় করা হবে।

পঞ্চাশজন লোক খুঁজে বের করতে পনের-বিশদিন কেটে যায়। তাদের অধিকাংশ খৃস্টান নাশকতাকারী। অন্যরা মুসলমান। তারাও খৃস্টানদের নাশকতা কর্মী।

উটে চড়ে সবাই কায়রো থেকে বেরিয়ে যায়। তবে একত্রে নয়– তারা তিন তিনজন ও চার চারজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মুসাফির ও ব্যবসায়ীর বেশ ধরে আলাদা আলাদভাবে বেরিয়ে গেছে। কুদুমীকে নিয়ে যাওয়া হয় একজন পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত বধূরূপে। মারকুনী সাজে তার স্বামী। কুদুমী ছাড়াও মারকুনীর সাথে আরো দু'জন লোক, তাদের একজন খৃস্টান অপরজন মুসলমান। মুসলমানের নাম ইসমাইল। ইসমাইল আহমারের খাস লোকদের একজন। খৃস্টানদের দালাল, ভাড়াটিয়া খুনী। সমাজে তার কোন মর্যদাা নেই কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাকে সালাম দিয়ে চলে। মারকুনীও তাকে ভালভাবেই চিনে এবং এ অভিযানের একজন বিশ্বস্ত কর্মী বলে মনে করে।

সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় রওনা হয়। আঠার ক্রোশ দূরে কোথায় গিয়ে একত্রিত হতে হবে, তা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। সকলের সঙ্গে তীর-ধনুক-তরবারী এবং রশি ও খননযন্ত্র।

সকলের আগে মারকুনী, ইসমাইল, কুদুমী ও তাদের অপর সঙ্গী গন্তব্যে পৌঁছে যায়। মারকুনী তাদেরকে পাহাড়ী এলাকার ভেতরে নিয়ে যায়।

সূর্য ডুবে গেছে। তারা তাঁবু স্থাপন করে। তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের এ রাতেই এসে পৌঁছানোর কথা। ইসমাইল কুদুমীকে চেনে; কিন্তু কুদুমী ইসমাইলকে জানে না।

❁ ❁ ❁

এক ময়দানে লড়াই করছেন নূরুদ্দীন জঙ্গী। কার্ক দুর্গ জয় করে সেখানকার এবং তার আশপাশের আরো কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করে ফেলেছেন তিনি। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে তার বাহিনী, যাতে খৃস্টানরা কোনদিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করতে চাইলে যথাসময়ে তা প্রতিহত করা যায়। বিভিন্ন পয়েন্টে খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত- সংঘর্ষও চলছে তাদের।

উদ্ধারকৃত এলাকার নিয়ন্ত্রণভার সুলতান আইউবীর বাহিনীকে বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে চাইছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। আইউবীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন তিনি। কিন্তু সুলতান আইউবী যুদ্ধে লিপ্ত অপর রণাঙ্গনে, যে রণাঙ্গন মিসরে খুলে বসেছে খৃস্টান ও তাদের মদদ পুষ্ট মুসলিম গাদ্দাররা। এ ময়দানই বেশী ভয়ংকর। তবে এমন আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার যোগ্যতা আছে সুলতান আইউবীর। মোকাবেলা করছেনও পুরোদমে। কিন্তু তৃতীয় আরো একটি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, তা এখনও জানতে পারেননি তিনি। এটি হল ফেরাউনদের সমাধি অনুসন্ধানের অভিযান।

রাতের আহারের পর হলরুমে প্রবেশ করেন সুলতান আইউবী। আলী বিন

সুফিয়ান, গিয়াস বিলবীস এবং বেশ ক'জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা কক্ষে উপস্থিত। সেদিনই নুরুদ্দীন জঙ্গীর দীর্ঘ একখানা পত্র সুলতান আইউবীর হস্তগত হয়। তিনি পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো উপস্থিত কর্মকর্তাদের পাঠ করে শোনান। সুলতান জঙ্গী লিখেছেন–

"প্রিয় সালাহুদ্দীন! আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ও নিরাপদ রাখুন। কার্ক ও তার আশপাশের এলাকাসমূহ এখন শত্রুমুক্ত। আমাদের সৈন্যরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। মাঝে মধ্যে খৃস্টান সৈন্যদের সঙ্গে তাদের ছোটখাট সংঘাতও হচ্ছে। খৃস্টানরা আমাকে নানা কৌশলে বুঝাতে চাচ্ছে যে, তারা এখনো পরাজিত হয়নি। তোমার গড়া গেরিলা বাহিনী সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তারা বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তুমি তাদের উপর যে পরিশ্রম করেছ, তারা তার মূল্য পরিশোধ করছে। তোমার গোয়েন্দারা তাদের চেয়েও সাহসী ও বুদ্ধিমান। আমি এতদূরে বসে তাদেরই চোখে দুশমনের সব তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছি.....।

সর্বশেষ তথ্য যা পেলাম, তাতে বুঝা যাচ্ছে, খৃস্টানরা আপাতত জবাবী আক্রমণ চালাবে না। তারা আমাদেরকে উৎসাহিত করছে, যেন আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। তুমি তো জান, বাইতুল মোকাদ্দাস– যা আমাদের প্রথম কেবলা, আমাদের লক্ষ্য– আমাদের থেকে কত দূরে। আমি জানি, তুমি এই দূরত্বকে ভয় পাওয়ার লোক নও। তবে দূরত্বটা যত না বেশী, তার চেয়ে বেশী পথের দুর্গমতা ও প্রতিবন্ধকতা। বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছতে হলে পথে আমাদের অনেক দুর্গ জয় করে অগ্রসর হতে হবে। তন্মধ্যে কয়েকটি দুর্গ তো অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। দূর-দূরান্তের এসব দুর্গ দ্বারা খৃস্টানরা বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করে রেখেছে। তোমার গোয়েন্দারা আমাকে আরো জানিয়েছে যে, খৃস্টানরা ইউনান, ল্যাটিন ও ইতালীয়দের নৌ-বাহিনীকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। তারা কামনা করছে যে, এ তিনটি বাহিনী একসঙ্গে মিসর আক্রমণ করে উত্তর এলাকায় সৈন্য নামিয়ে দিক। এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি তৈরি থাক। তোমাদের কাছে দূরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপণযোগ্য মিনজানিকে বেশী থাকতে হবে। আমার পরামর্শ হল, উত্তর এলাকার মাটি যদি অনুমতি দেয়, তাহলে দুশমনের নৌ-বহরকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসতে দাও, ওখানে মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই। দুশমনকে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দাও যে, তারা তোমাদের অজ্ঞাতে মিসরে ঢুকে পড়েছে। সৈন্যরা জাহাজ থেকে কূলে নেমে আসার পর অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে জাহাজগুলোকে পুড়ে ফেল এবং খৃস্টান সৈন্যদেরকে পছন্দমত কোন এক

ময়দানে নিয়ে কোণঠাসা করে ফেল...।

আমি তোমার অপারগতা সম্পর্কে বেখবর নই। তোমার দূত আমাকে সব কথাই বলেছে। তবে আমি কাবার প্রভুর শপথ করে বলতে পারি, খৃস্টানদের রাজারা সবাই যদি ঝড়ের ন্যায়ও ছুটে আসে, আল্লাহর রাসূলের উম্মতদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উম্মত রক্ত দিতে জানে, জানে মাথা দিতে। কিন্তু একদল ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার আমাদেরকে শিকল পরিয়ে রেখেছে। তুমি কায়রোতে আটকা পড়ে আছ। আমি বাগদাদ থেকে বের হতে পারছি না। নারী, মদ আর সোনার থলে আমাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে যদি শান্তি থাকত, স্বস্তি থাকত, তাহলে তুমি-আমি দু'জনে মিলে ক্রুশের মোকাবেলা করতে পারতাম। কিন্তু কাফেররা এমন ফাঁদ পেতে রেখেছে যে, মুসলমানরাও কাফের হতে চলেছে। এই কাফের মুসলমানরা এতই অন্ধ যে, বুঝতেও পারছে না, দুশমন তাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে। কার্কের মুসলমানরা যেরূপ মানবেতর জীবন-যাপন করছিল, তা আমি তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না। খৃস্টানরা তাদের উপর যে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তা শুনলে তোমার গা শিউরে উঠবে। আমি জাতির গাদ্দারদেরকে কিভাবে বুঝাব যে, দুশমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সরাসরি দুশমনি করার চেয়েও বেশী ভয়ংকর...।

তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ যে, তোমার ভাই, ভাল ভাল কর্মকর্তা ও সুযোগ্য কমান্ডারগণ তোমার হাতে নিহত হচ্ছে। শোন সালাহুদ্দীন! ওরা তোমার হাতে নিহত হচ্ছে, দুঃখের বিষয় এটা নয়। দুঃখজনক বিষয় হল, স্বজাতির কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তারা গাদ্দারীর পথ বেছে নিল! মুসলমানের হাতে মুসলমান নিহত হচ্ছে দেখে খৃস্টানরা উল্লাস করছে, এটা হল আফসোসের বিষয়। তুমি গাদ্দারদের ক্ষমা করতে পার না। গাদ্দারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমার অপেক্ষা করছি। তুমি যখন আসবে, সঙ্গে বেশীসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসবে। খৃস্টানরা তোমাদেরকে দুর্গের অভ্যন্তরে লড়াইয়ে লিপ্ত করিয়ে তোমাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে চায়। এমন যেন না হয় যে, বাইতুল মোকাদ্দাসের পথেই তোমরা সব শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তুমি যখন আসবে, মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে আসবে। সুদানীদের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। আমি জানতে পেরেছি, তোমার আর্থিক সমস্যাও আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারলে ভাল হবে। কায়রো থেকে যথাশীঘ্র বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর। তবে ভেতর ও বাইরের পরিস্থিতি দেখে-শুনে আসবে। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।"

✿ ✿ ✿

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী উপস্থিত কমান্ডার-কর্মকর্তাদেরকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বার্তাটি পাঠ করে শোনান। তিনি তাদেরকে আশার বাণী শোনান যে, সেনাবহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পল্লী এলাকাসমূহ থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। দুশমন কুসংস্কার বিস্তারের যে অভিযান শুরু করেছিল, তা সফলভাবে দমন করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে এখনো তার ক্রিয়া রয়ে গেছে। একটি আবহ উঠেছিল দেশের বিভিন্ন মসজিদ থেকে। তাও কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। খৃস্টানরা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে যেসব অলীক চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছিল, তিন-চারটি মসজিদের ইমামও মানুষের মন-মস্তিষ্কে সেই চিন্তা-চেতনা ঢুকাতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহর দূত সেজে বসেছিল। আমি এমন মানুষেরও দেখা পেয়েছি, যে বিপদে পড়ে সরাসরি আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরিবর্তে ইমামদেরকে নজরানা দিয়ে থাকে যে, ইমামরা তার জন্য দোয়া করবে। মানুষের মধ্যে এই বুঝ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ না সরাসরি আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে পারে, না আল্লাহ সরাসরি তাদের কথা শুনেন। সুলতান আইউবী বললেন, আমি সেই ইমামদেরকে অপসারণ করে সেই মসজিদগুলোতে এমন ইমাম নিয়োগ করেছি, যাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা কুরআনের অনুকূল। তারা এখন লোকদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ আলেম-বেআলেম, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সমান। তিনি সরাসরি যে কারো দোয়া শুনে থাকেন, ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি প্রদান করেন। আমি আমার জাতির মধ্যে এই শক্তি ও চেতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, যেন তারা নিজেদেরকে এবং আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা তো দেখেছ, তোমাদের দুশমন শুধু যুদ্ধের ময়দানেই লড়াই করছে না, তারা তোমাদের মন-মগজে নতুন বিশ্বাস ও চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অভিযানে ইহুদীরা সকলের আগে। ইহুদীরা এখন আর তোমাদের মুখোমুখি এসে লড়াই করবে না। তারা তোমাদের ঈমানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এ কাজে তারা শীঘ্র সফল হতে না পারলেও ব্যর্থও হবে না। এমন একটি সময় আসবে, যখন আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত এই সম্প্রদায়টি মুসলমানদেরকে দুর্বল পেয়ে এমন চাল চালবে যে, তারা লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে– তাদের খঞ্জর সালতানাতে ইসলামিয়ার হৃদপিণ্ডে আঘাত হানবে। তোমরা যদি তোমাদের ইতিহাসকে এই যিল্লতির হাত থেকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে আজই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ কর– জনগণের কাছে যাও। নিজেকে শাসক ও জনগণকে শাসিত ভাবতে ভুলে যাও। জনমনে এমন আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত কর, যেন তারা দেশ-জাতি-দ্বীনের জন্য জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবী বললেন, 'খৃস্টানদের কাছে আছে মদ আর সুন্দরী নারী। আর আমাদের আছে এ দু'য়ের মোহ। জাতির অন্তর থেকে মদ-নারী-সম্পদের এই লোভ দূর করতে হবে। তার জন্য ঈমানের পরিপক্কতা প্রয়োজন।'

'আমীরে মোহরাতাম!'– ঊর্ধ্বতন এক কমান্ডার বললেন– 'আমাদের সম্পদেরও প্রয়োজন আছে। ব্যয় নির্বাহ আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। অর্থের অভাবে অনেক কাজে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

'আমি তোমাদের এ সমস্যার সমাধান করব'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সব সময়ের জন্য তোমাদেরকে একটি সত্য মেনে নিতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে সম্পদ, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব অতীতেও ছিল, এখনও আছে। এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) তার জীবনের প্রথম যুদ্ধটিতে লড়েছিলেন মাত্র তিনশ' তেরজন প্রায় নিরস্ত্র সৈন্য নিয়ে। সে যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য ছিল এক হাজার। তারা সবাই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। পরবর্তীতে যখন সেখানে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে, এ অনুপাতেই হয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের কাছে মোটের উপর সম্পদের অভাব কখনো ছিল না। কিন্তু সে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে ছিল গুটিকতক লোকের হাতে। এখনও আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা। ছোট ছোট যেসব প্রদেশের মালিক মুসলমান, তাদের কাছে বিপুল সম্পদের স্তূপ পড়ে আছে।'

'সম্পদের স্তূপ এ অঞ্চলেও পড়ে আছে সালারে আজম!'– গিয়াস বিলবীস বললেন– 'আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা একটি নতুন অভিযান শুরু করতে পারি। আপনি জানেন যে, মিসর গুপ্তধনের জায়গা। অতীতে এখানে যখন যে ফেরাউনই মারা গেছে, নিজের সম্পদ-ধনভাণ্ডার সঙ্গে করে মাটির নীচে নিয়ে গেছে। ঐ সকল সম্পদ কার ছিল? ছিল গরীব মানুষগুলোর, যাদেরকে অভুক্ত রেখে তাদের থেকে সেজদা আদায় করা হত। সে যুগের মানুষ ফেরাউনদেরকে খোদা বলে মান্য করত শুধু এ কারণে যে, তাদের পেটে খাবার ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। তাদের ভাগ্য ছিল ফেরাউনদের হাতে। তাদের জীবন-মৃত্যু দু-ই ফেরাউনরা নিজ হাতে তুলে নিয়েছিল। মানুষদের দ্বারা মাটি খুঁড়ে পাহাড় কেটে ফেরাউনরা পাতালে তাদের সমাধি তৈরি করেছিল, যা ছিল ঠিক প্রাসাদের ন্যায়। মানুষের ধনভাণ্ডারকে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মহামান্য সুলতান যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা ফেরাউনদের সেই সমাধির অনুসন্ধান শুরু করে দেই এবং ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যবহার করি।

'উনি ঠিকই বলেছেন আমীরে মোহতারাম।'– গিয়াস বিলবীসের পক্ষে মজলিস থেকে একাধিক আওয়াজ উঠে।

'আমরা এর আগে বিষয়টা কখনো ভেবে দেখেনি।' বললেন একজন।

'এই অভিযানে আমরা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে পারি।' বললেন আরেকজন।

'জনসাধারণের মধ্য থেকে নতুন একটি বাহিনী গঠন করে এ অভিযান শুরু করা যায়।' বললেন আরেকজন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ কাজে বেতন দিয়ে অসামরিক লোকদের ব্যবহার করা যেতে পারে।' সমর্থন জানায় অন্যজন।

একরকম শোরগোল পড়ে যায় মজলিসে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু বলছেন। চুপচাপ বসে আছেন শুধু একজন– সুলতান আইউবী। দীর্ঘক্ষণ পর সভাসদগণ টের পান যে, তাদের আমীর ও সেনাপতি কথা বলছেন না। হঠাৎ নীরবতা ছেয়ে যায় মজলিসে। এখন কেউ-ই কথা বলছেন না, নিস্তব্ধ বসে আছেন সবাই। সুলতান আইউবী সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন। বললেন–

'আমি গিয়াস বিলবীসের এই প্রস্তাব অনুমোদন করি না।'

সবাই নিশ্চুপ–নিস্তব্ধ। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে হলময়। সুলতান আইউবীর কথার উপর কথা বলবে এমন সাহস কারো নেই। সুলতান বললেন–

'আমি চাই না, আমার মৃত্যুর পর ইতিহাস বলুক সালাহুদ্দীন আইউবী কবর-চোর ছিল, কবর-ডাকাত ছিল। ইতিহাস আমাকে অপদস্থ করলে তা তোমাদের জন্যও অপমান বলে গণ্য হবে। ভবিষ্যৎ বংশধর বলবে সালাহুদ্দীন আইউবীর মন্ত্রী-উপদেষ্টাগণও কবর-চোর ছিল। ইতিহাসের এমন তথ্য খৃষ্টানদের জন্য এক উপাদেয় খোরাকে পরিণত হবে। তারা তোমাদের কুরবানী ও ইসলামী চেতনাকে ডাকাতী ও দস্যুতা আখ্যা দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের-ই বংশধরের মাঝে অপমানিত করবে। আর তাতে শুধু তোমরা-ই নও, আমাদের ইতিহাসও কলংকিত হয়ে পড়বে।'

'গোস্তাখী মাফ করুন আমীরে মোহতারাম!'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন–'অতীতে অল্প ক'দিনের জন্য মিসর খৃষ্টানদের কব্জায় এসেছিল। ক্ষমতা পেয়ে তারা সর্বপ্রথম এখানকার গুপ্তভাণ্ডারসমূহ অন্বেষণ শুরু করেছিল। কায়রো উপকণ্ঠে আমরা যে পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদগুলো থেকে খৃষ্টান সন্ত্রাসী ও ফেদায়ীদের একটি চক্রকে গ্রেফতার করেছিলাম, সেটিও কোন এক ফেরাউনের সমাধি ছিল। খৃষ্টানরা সেখান থেকে সব ধনভাণ্ডার নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টানদের শাসনক্ষমতা বেশীদিন টিকে থাকেনি। না হলে তারা মিসরের সব গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে যেত। মাননীয় গিয়াস বিলবীস ঠিকই বলেছেন যে, এই ধনভাণ্ডারের যদি কোন মালিক থেকে থাকে, তাহলে

সে আর যে হোক ফেরাউন নয়। এসব সম্পদের মালিক ছিল দেশের জনগণ। আমি আপনাকে এ পরামর্শ দেয়ার সাহস করি যে, এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হোক।'

'আর আমি তোমাকে জ্ঞাত করতে চাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এসব ধনভাণ্ডার যখন তোমাদের হাতে আসবে, তখন তোমরাও ফেরাউন হয়ে যাবে। মানুষকে এত দুঃসাহস কে দিল যে, মানুষ নিজেকে খোদা দাবি করবে? সম্পদ আর সম্পদের মোহ-ই তো! মানুষকে মানুষের সামনে সেজদা করতে কিসে বাধ্য করল? দারিদ্র্য আর ক্ষুধা-ই তো! তোমরা খৃস্টানদের কথা বললে যে, তারা ফেরাউনের একটি সমাধি লুট করেছে। শোন, যখন প্রথম ফেরাউনের মরদেহ তার সমুদয় সম্পদসহ মাটিচাপা দেয়া হয়, তখন থেকে কবর-চুরির সূচনা হয়। মানুষ হিংস্র হায়েনার ন্যায় প্রথম ফেরাউনের কবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজেদের দ্বীন-ঈমান ত্যাগ করে মানুষ গুপ্তধনের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর একের পর এক ফেরাউন মৃত্যুবরণ করতে থাকে আর কবর-চুরি নিয়মিত একটি পেশার ন্যায় চলতে থাকে। তারপর এই কবরচুরির প্রবণতা রোধ করার জন্য প্রত্যেক ফেরাউন নিজের জীবদ্দশায় মৃত্যু-পরবর্তী সমাধির জন্য এমন দুর্গম জায়গা ঠিক করে যেতে শুরু করে, যেখানে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব না হয় এবং মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তরা সেই সমাধি এমনভাবে বন্ধ করে রাখতে শুরু করে, যেন কেউ তা খুলতে না পারে। তারপর একসময় যখন ফেরাউনদের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন মিসরের শাসনক্ষমতা যখন যার হাতে আসে, তখনই সে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আমি জানি, ফেরাউনদের অনেক সমাধি এমনও আছে, সেগুলো কোথায় আছে কেউ জানে না। সেগুলো মূলত পাতালপ্রাসাদ। মিসরের শাসকবর্গ ও হানাদাররা কেয়ামত পর্যন্ত এসব সমাধি খুঁজতে থাকবে...।

জানো, ঐ শাসকদের পতন কেন ঘটেছে? তার একমাত্র কারণ, তাদের দৃষ্টি ঐ ধনভাণ্ডারের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। তারা প্রজাদের এই বুঝ দিয়েছিল যে, সম্পদ আছে তো সম্মান আছে। হাতে অর্থ নেই, তাহলে তোমাদের এবং তোমাদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের মালিকও তারা, যাদের দৌলত আছে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা সালাহুদ্দীন আইনবীকে সেই সারিতে দাঁড় করিও না। আমি জাতিকে এ বুঝ দিতে চাই যে, আসল সম্পদ হল জাতীয় মর্যাদা আর ঈমান। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমি নিজে এবং তোমরা যারা সরকারের স্তম্ভ, অন্তর থেকে সম্পদের মোহ দূর করতে পারবে।'

'আমরা তো এই ধনভাণ্ডার অন্বেষণ ব্যক্তিগত স্বার্থে করতে চাই না'– এক

কমান্ডার বললেন– 'আমরা জাতীয় স্বার্থে এ অভিযানে হাত দিতে চাই।'

'আমি জানি, আমার এই অস্বীকৃতি তোমাদের কারো পছন্দ নয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমার কথা বুঝতে হলে তোমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্যসব চিন্তা দূর করে ফেলতে হবে। আমার বিবেক আমাকে বলছে যে, যে সম্পদ বাহির থেকে আসে– হোক তা জাতীয় প্রয়োজনে– তা শাসকদের ঈমান নড়বড়ে করে দেয়। এ হল সম্পদের অভিশাপ। আমার বুঝ হল, আমার নিকট যদি ঘোড়া ক্রয় করার জন্য অর্থ না থাকে, তাহলে আমি বাহিনীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাইতুল মোকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছব, তবু ঘোড়া কেনার জন্য কবর খুঁড়ে লাশের গায়ের অলংকার চুরি করে বিক্রি করতে পারব না। আমার লক্ষ্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে খৃস্টানদের থেকে উদ্ধার করা; ঘোড়া ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা নয়। তোমরা যখন গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করবে, তখন জনসাধারণের মধ্যে অনেকে যেখানে সেখানে কবর-চুরি করতে শুরু করবে। মিসরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে। আর যখন ঐসব গুপ্তধন তোমাদের হাতে চলে আসবে, তখন তোমরা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত না হলেও পরস্পরের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে অর্থের প্রাচুর্য মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা নষ্ট করে দেয়। বান্দার হক আদায় করার উৎসাহ নিঃশেষ করে দেয়। এই ধনৈশ্বর্যই মানুষকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। আজ সেই 'খোদারা' কোথায়? তারা তো আকাশে উঠে যায়নি, মাটির নীচেই দাফন হয়ে আছে। আমার বন্ধুগণ! আমি নতুন একটি অপরাধের বীজ বপন করতে চাই না। তোমরা এই ধনভাণ্ডারের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। আরে, তোমাদের মধ্যে এই যে গাদ্দার তৈরি হয়ে আছে, তা তো এই সম্পদের-ই লীলা। তোমরা দু'জন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর তো আরো চারজন তৈরি হয়ে যায়। তোমরা নিজ হাতে উপার্জিত-উৎপাদিত সম্পদ দ্বারা জীবন নির্বাহ করার চেষ্টা কর। তোমরা মুসলমান। নিজেদের ভাগ্য কাফেরদের হাতে তুলে দিও না। অন্যথায় সবাই গাদ্দার হয়ে যাবে। ফেরাউনরা মারা গেছে। ঐ মৃত দেহগুলোকে মাটির নীচেই চাপা পড়ে থাকতে দাও।'

'আপনার অনুমোদন ছাড়া আমরা এ জাতীয় কোন অভিযান শুরু করব না।' বললেন একজন।

'গিয়াস!'– সুলতান আইউবী গিয়াস বিলবীসের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'আজ হঠাৎ করে এই গুপ্তধনের কথা তোমার মাথায় আসল কিভাবে? আমি মিসর আসলাম চার বছর হয়ে গেল। এর আগে কোনদিন তো তুমি এমন প্রস্তাব পেশ করনি?'

'ইতিপূর্বে এই চিন্তা কখনো আমার মাথায় আসেওনি আমীর

মোহতারাম!'– গিয়াস বিলবীস বললেন– 'মাস দু'য়েক আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের কেরানী আমাকে বলল, পুরাতন কাগজপত্র থেকে কিছু কাগজ হারিয়ে গেছে। আমি সেই কাগজগুলোর ধরণ ও গুরুত্ব জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কাগজগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, খুঁজে বের করতে হবে। তাতে ছিল কিছু নকশা ও ফেরাউনদের আমলের কিছু লেখা-জোখা। অনেক পুরাতন ও ছেঁড়াফাড়া ছিল কাগজগুলো। কেরানী যখন ফেরাউনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করল, তখন আমার মনে খেয়াল চাপল যে, সেসব লেখা ও নকশাগুলোতে ফেরাউনদের গোপন সমাধি সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে। যে ফাইল থেকে কাগজগুলো গুম হয়েছিল, আমি তা দেখেছি। আমি বিষয়টিকে এই বলে গুরুত্ব দেইনি যে, ওসব লেখা-জোখা এ যুগে কে আর বুঝবে।'

'তোমার এ ধারণা সঠিক নয় গিয়াস!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'মিসরে এমন অনেক লোক আছে, যারা এসব লেখা, নকশা ও ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতে সক্ষম। এসব কাগজ ও নকশা চুরি হওয়া বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এই চুরি গ্রন্থাগারের কোন লোভী কর্মকর্তা করে থাকবে। এ কাগজগুলোর প্রতি আমার কোন কৌতূহল নেই– আমার দৃষ্টি চোরের প্রতি। লোকটি তোমাদেরই বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কিনা কে জানে। চোরটিকে খুঁজে বের করতে হবে। আলী! বিলম্ব না করে অভিযান শুরু কর।'

'আমার মনে হচ্ছে, কাগজগুলোর কিছু না কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি মোহতারাম গিয়াস বিলবীসের সঙ্গে কথা বলেছি। বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের সংবাদদাতা ও গোয়েন্দারা আমাদেরকে শহরে একটি রহস্যময় তৎপরতার সংবাদ দিয়ে আসছে। কুদুমী নাম্মী এক নর্তকী আছে। বিশেষ মহলে মেয়েটি সকলের কাছে পরিচিত, যাকে বিত্তশালীদের পানশালার প্রদীপ বলা চলে। আজ পাঁচদিন যাবত মেয়েটি নিখোঁজ রয়েছে। একটি নর্তকীর শহর থেকে উধাও হয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নয়। কিন্তু কুদুমীকে আমি বিশেষ নজরে রেখেছি। আমি গোয়েন্দা মারফত জানতে পেরেছি যে, মেয়েটির কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ও সন্দেহভাজন দু'জন লোক যাওয়া-আসা করত। হঠাৎ একদিন তার ঘর থেকে বোরকা পরিহিত একজন মহিলাকে বের হয়ে যেতে দেখা গেছে। মহিলা অপরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ, কুদুমীই নিজের বেশ বদল করে বেরিয়ে গেছে। আমার আরেক দল গোয়েন্দা কিছু লোককে সন্দেহজনক অবস্থায় দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। আমার সন্দেহ, এসব তৎপরতা হারিয়ে যাওয়া কাগজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে, এরা খৃস্টান সন্ত্রাসী চক্রই হবে। তবে আসল ঘটনা যাই হোক, আমি এসব তৎপরতার রহস্য

উদ্‌ঘাটন করে ছাড়ব।'

'হ্যাঁ, তুমি অনুসন্ধান শুরু করে দাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর ঐসব গুপ্তধনের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেল। আমি জানি, জাতির কল্যাণ সাধন এবং খৃস্টানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ লড়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি কারো নিকট সাহায্য চাইব না। মোহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গী আমাকে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। আমি তার এ সাহায্য গ্রহণ করব না। আর্থিক সাহায্য মায়ের পেটের ভাইও যদি করে, তবু তা মানবিক উৎকর্ষ, শ্রম ও দ্বীনদারীর জন্য ক্ষতিকর। তারপরও মানুষ গুপ্তধনের সন্ধানে দিশেহারার মত ঘুরে ফিরছে। শোন আলী! মিসরের মাটি বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। পরিশ্রম কর; এ মাটিতেই সোনা ফলবে। দেশের জনগণকে বুঝাও, তাদের প্রতি সরকারের কর্তব্য কি। তাহলে তারা নিজেদেরকে প্রজা ভাবা ছেড়ে দেবে। তাদেরও কি কি কর্তব্য আছে, তাও তাদেরকে অবহিত কর। দেশের জনগণ যদি কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে, তাহলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। তোমরা যে ভূখণ্ডের সংরক্ষণে রক্ত ঝরাবে না, যে দেশের মর্যাদার জন্য ঘাম ঝরাবে না; সে ভূখণ্ড সে দেশ তোমাদের পাওনা আদায় করবে না। তারপর দেশের শাসকগোষ্ঠী বিদেশের ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধানে নেমে পড়বে আর জনগণ বিভক্ত-বিশৃঙ্খল হয়ে কাফেরদের গোলামে পরিণত হবে।'

❁ ❁ ❁

মিসরের গবর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে ধনভাণ্ডারে হাত দেয়া অপছন্দ করছেন, সেসব যে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় রক্ষিত, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তারই এক জেনারেলের প্রেরিত পঞ্চাশ ব্যক্তির বাহিনী। মারকুনী, ইসমাইল, কুদুমী এবং অপর এক খৃস্টান পৌঁছে গেছে সন্ধ্যায়। তাদের অন্য সঙ্গীরা– যাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রেরণ করা হয়েছিল গন্তব্যে পৌঁছতে শুরু করেছে সে রাতেই। মধ্যরাত পর্যন্ত পৌঁছে যায় পঞ্চাশজনের সব ক'জন।

জায়গাটা এমন যে, এর পাশ দিয়ে কোন পথিক কখনো পথ অতিক্রম করেনি। অত্যন্ত ভয়ানক জায়গা। সীমান্ত থেকে দূরে হওয়ার কারণে এখানে কখনো কোন সীমান্ত বাহিনীর নজরও পড়েনি।

মারকুনী রাতারাতি সবাইকে ভেতরে পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখে না ফেলে। সে সঙ্গীদের বলে দেয়, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা ঘুমাতে পার; ঘুম থেকে উঠে এখান থেকে পায়ে হেঁটে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। নিজে কুদুমীকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে।

একটি পাহাড়ের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়ে সকলে। পরদিন সকালে যখন তারা জাগ্রত হয়, তখন ভোরের রক্তিম সূর্য টিলার উপরে উঠে গেছে। এই

অভিযানে সঙ্গে সরঞ্জাম, যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি কি কি সঙ্গে নিতে হবে, মারকুনী আগেই তা বলে দিয়েছিল। সরঞ্জামাদির মধ্যে আছে শক্ত ও মোটা রশি, কোদাল ও বেলচা ইত্যাদি। অস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক ও তরবারী। পথের দুর্গমতা সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করা হয়েছে। মারকুনীর এক সঙ্গী যে দেয়াল অতিক্রম করতে গিয়ে নীচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল, সেই দেয়াল সম্পর্কেও ধারণা দিয়ে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ইত্যাদি সব বিষয়ে কাফেলার প্রত্যেককে পূর্ব ধারণা দিয়ে রেখেছে মারকুনী। এখান থেকে উটে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। যেতে হবে পায়ে হেঁটে। তাই উটগুলো বেঁধে রেখে দেখাশোনার জন্য মাত্র এক ব্যক্তিকে রেখে দেয়া হয়েছে। কুদুমীকেও এপথে নেয়া যাবে না। মারকুনীর আশা, খুঁজলে অন্য কোন নিরাপদ পথ পাওয়া যাবে, যে পথে কুদুমীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে সে। কুদুমীর হেফাজতের জন্যও একজন লোকের প্রয়োজন। এ-কাজের জন্য কেবল ইসমাইলই উপযুক্ত ব্যক্তি।

মারকুনী ইসমাইলকে বলল, 'তুমি কুদুমীকে নিয়ে এখানেই থাক। তবে মনে রাখবে, কুদুমীর মর্যাদার তুলনায় তুমি কিছুই নও। তুমি তার আরাম ও হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবে। আমি শিগগির ফিরে আসব। এসে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাব।'

মারকুনী দলবল নিয়ে রওনা হয়ে যায়। এ-পথ তার চেনা। নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে মারকুনী। দলের অন্যরা যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, ততই ভয় চেপে বসছে তাদের মনে। পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে তারা সবাই সম্যক অবহিত। কিন্তু এমন এলাকা, এ ধরনের পাহাড় তারা আগে কখনো দেখেনি। যে জায়গাটায় নারী কণ্ঠের কান্নার শব্দ শোনা যায়, সেখানে পৌঁছে হঠাৎ সবাই হতচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করে। তারা নিশ্চিত, কতগুলো নারী একযোগে কান্নাকাটি করছে। ভয়ে গা ছম ছম করে ওঠে সকলের। সর্বাঙ্গ কাটা দিয়ে উঠে তাদের। কিন্তু এ অভিযানের জন্য তাদেরকে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার শক্তি এতই বেশী যে, এই ভীতিকর অবস্থা তার কাছে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা তো খৃস্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। মারকুনী তাদের অফিসার। তারা পুরস্কারের লোভ ও হুকুমের চাপে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। কান্নার শব্দ শুনে তারা যখন হঠাৎ চমকে উঠে, তখন মারকুনী তাদের বলে, এগুলো নারী বা প্রেতাত্মা কিছুই নয়—এটা বাতাসের শব্দ। তারপরও তাদের ভয় কাটেনি। পরস্পর চোখাচোখি করে সাহসের ভান দেখিয়ে এগুতে থাকে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কাফেলা সেই প্রশস্ত ও সুগভীর খাদের নিকট পৌঁছে

গেছে, মারকুনী যেটি একবার অতিক্রম করেছিল। প্রাকৃতিক সরু দেয়াল বেয়ে এখন তাদের এ খাদ পার হতে হবে। দলের সদস্যদের নিয়ে মারকুনী সমস্যায় পড়ে যায়। দেয়ালে পা রাখতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। মারকুনী সকলের সামনে। দেয়ালে পা রেখে এগুতে শুরু করে সে। তার দেখাদেখি এক এক করে অন্যরাও দেয়ালে উঠে যায়। এক পা দু'পা করে অগ্রসর হতে শুরু করে তারা। সূর্য ডুবে গেছে। আলো না থাকায় খাদের গভীরতা কারো চোখে পড়ছে না। মারকুনীর সঙ্গীদের জন্য এটা ভালই হল।

মারকুনী দেয়াল অতিক্রম করে ওপার পৌঁছে গেছে। হঠাৎ এমন একটি আর্তচীৎকার তার কানে আসে, যা ধীরে ধীরে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। খানিক পর ভেসে আসে আরো একটি ভয়ংকর চীৎকার শব্দ। এটিও নীচের দিকে চলে গিয়ে হাল্কা ধপাস্ শব্দের সঙ্গে নীরব হয়ে যায়। এরূপ পাঁচটি চিৎকার ধ্বনি শুনতে পায় মারকুনী।

মারকুনীর কাফেলার সদস্যরা দেয়াল অতিক্রম করে ওপার গিয়ে সমবেত হয়। গুনে দেখা গেল, পাঁচজন কম। মারকুনী জানায়, সামনে আর বড় কোন সমস্যা নেই। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর একটু অগ্রসর হলে সোজা পথ পেয়ে যাব।

গভীর রাত। মারকুনী তার সঙ্গীদের নিয়ে সে স্থানে পৌঁছে যায়, যার নীচে বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ড। মারকুনী সবাইকে সেখান থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে রাখে। দু'ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে অন্যদের বলে, সঙ্গে যা আছে খেয়ে শুয়ে পড়। আমি সময়মত তোমাদেরকে জাগিয়ে দেব।

সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে স্থান পর্যবেক্ষণে নেমে পড়ে মারকুনী। নীচে কবরের নীরবতা। ঘোর অন্ধকার। কোথাও এক ফোঁটা আলোও চোখে পড়ছে না। আর সামনে অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছে মারকুনী। রাত পোহাবার আগে আক্রমণ চালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় সে। ফিরে যায় ঘুমন্ত সঙ্গীদের নিকট।

✿ ✿ ✿

কুদুমী ও ইসমাইল রয়ে গেছে পিছনে। এমন নিরিবিলি পরিবেশ ভাল লাগে না কুদুমীর। কোলাহলপূর্ণ মদ আর নাচ-গানের আসরের হৈ-হুল্লোড় তার প্রিয়। কিন্তু মারকুনী তাকে এই ভয়ংকর নির্জন এলাকায় নিয়ে এল এবং এই একটি মানুষের সঙ্গে এখানে রেখে গেল!

ইসমাইল কুদুমীকে জানে। কুদুমী ইসমাইলকে চিনে না। ইসমাইল অপরাধ জগতের মানুষ। তবে তার দৈহিক গঠন ও আলাপ-ব্যবহারে কুদুমীর কাছে তাকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হল। ইসমাইলের কাছে ঘেঁষতে চায় কুদুমী। কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না ইসমাইল।

সন্ধ্যার পর ইসমাইল ভুনা গোশত গরম করে কুদুমীকে খেতে দেয়। মদের গ্লাস সামনে রেখে বলে, খেয়ে শুয়ে পড়। প্রয়োজন হলে আমাকে আমার তাঁবু থেকে ডেকে নিও।

ইসমাইল কুদুমীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। কুদুমী খাবার খায়, মদ পান করে। ইসমাইলের পরামর্শ মোতাবেক এখন তার শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু একা একা ভাল লাগছে না তার। মনটা ছটফট করছে। নিজের রূপ-লাবণ্যে গর্ব আছে কুদুমীর। ইসমাইল তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এমন একটা আশাও মনে মনে পোষণ করে কুদুমী। কিন্তু ইসমাইল সম্পূর্ণ উদাসীন। রূপসী কুদুমীকে নিয়ে কোন ভাবনাই যেন নেই তার।

কুদুমীর চোখে ঘুম আসছে না। নিজের তাঁবু থেকে বের হয় সে। চলে যায় ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল এখনো সজাগ। কুদুমীর আগমন টের পেয়ে বাতি জ্বালায় সে। জিজ্ঞেস করে কেন এসেছ? কুদুমী বলল, একা একা ভাল লাগছে না, তাই এলাম। বলতে বলতে ইসমাইলের কাছে ঘেঁষে বসে পড়ে মেয়েটি। জিজ্ঞেস করে–

'তুমি বোধ হয় মুসলমান?'

'ধর্ম নিয়ে তোমার কৌতূহল কিসের?'– ইসমাইল জবাব দেয়– 'তোমার সব সম্পর্ক তো মানুষের সাথে। মানুষের জন্যই তোমার জীবন, তোমার মরণ! নামটা আমার ইসলামী– ইসমাইল। কিন্তু আমার কোন ধর্ম নেই।'

'এ্যাঁ!'– মুখে মুচকি হাসি টেনে বিস্ময়ের সাথে কুদুমী বলল– 'তুমি ইসমাইল! আহমার দরবেশের খাস লোক।'

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় ইসমাইল।

মারকুনী সম্পর্কে কথা তোলে কুদুমী। বলে, 'লোকটা নিজের নাম বলেছে সোলায়মান সেকান্দার। কিন্তু তাকে মুসলমান বলে মনে হয় না!'

'লোকটা মিসরী নয়'– ইসমাইল বলল– 'সুদানীও নয়। নামও তার সোলায়মান সেকান্দার নয়।'

'তাহলে তিনি কে?'– কুদুমী জিজ্ঞেস করে– 'তার আসল নাম কি?'

'তার আসল নাম আমি জানি; কিন্তু তোমাকে বলতে পারব না'– ইসমাইল বলল– 'এই ভেদ লুকিয়ে রাখার জন্য আমি তার নিকট থেকে বিনিময় পেয়ে থাকি। তার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল না থাকাই উচিত যে, সে কে। তুমি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য এখানে এসেছ। এটা তোমার পেশা। সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগও দেবে বলে ওয়াদা করেছে নিশ্চয়।'

'সে তো আমার প্রাপ্য'– কুদুমী বলল- 'তিনি আমাকে যে বিনিময় দিয়েছেন,

এই ভয়ংকর বিয়াবানে আসার বিনিময় হিসেবে তা নিতান্তই কম। তোমার ধারণাই সঠিক যে, আমি গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ার ওয়াদা নিয়েই এসেছি।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগ দেবে?'– ইসমাইল জিজ্ঞেস করে– 'তোমার কি বিশ্বাস হয়, সে তার সেই কাঙ্খিত গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে, তুমি যার ভাগ নিতে এসেছ?'

'আমি এতই দামী মেয়ে যে, মানুষ আমাকে ধন-ভাণ্ডারের বিনিময়েও কিনতে প্রস্তুত'– গর্বের সুরে কুদুমী বলল– 'এই লোকটি তো আমার উপযুক্ত মূল্য আদায়ই করতে পারবে না। আমি আমীরজাদা আর শাহজাদাদের গোলাম বানিয়ে রাখি।'

'কয়দিন?'– ইসমাইল মুচকি হেসে বলল– 'বড়জোর আর দু'বছর। তারপর তোমার দাম এতই কমে যাবে যে, তুমি অলিগলিতে পাগলের ন্যায় ছুটতে থাকবে, কেউ তোমাকে জিজ্ঞেসও করবে না। যাদের কাছে ধনভাণ্ডার আছে, তারা আরেক কুদুমীকে জোগাড় করে নেবে। কাজেই এত গর্ব কর না কুদুমী।'

'কেন করব না?' –কুদুমী বলল– 'এই লোকটি– যিনি নিজের নাম সোলায়মান সেকান্দর বলে জানিয়েছেন– আমার রূপের জাদুতে এমনভাবে ফেঁসে গেছেন যে, আমাকে একাধিকবার কসম খেয়ে বলেছেন, তিনি শুধু আমারই জন্য গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাবেন। সেখানে সমুদ্রের পাড়ে আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। তারপর আমি আর নর্তকী থাকব না। কেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?'

'সন্দেহ নয়– আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমার কাছে মস্তবড় মিথ্যে বলেছে'– ইসমাইল বলল– 'আমি তো এসেছি এটা আমার চাকুরী। আহ্মার দরবেশের নির্দেশ আমাকে মান্য করতে হয়। তিনি আমাকে বললেন, যাও, আমি এসেছি। এটা আমার পেশা। আমি ভাড়াটিয়া, পাপী। বিনিময় পেয়ে আমি খুনও করতে পারি। কিন্তু আমি মিথ্যে বলতে পারি না। অপরাধ করতে গিয়ে আমি কখনো ধরা পড়িনি। আহ্মার দরবেশ আমকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমার মধ্যে আরেকটি গুণ কিংবা দোষও বলতে পার আছে যে, আমি নারীকে শ্রদ্ধা করি। কেন করি তা জানি না। একজন নারী ভদ্র হোক কিংবা বেশ্যা হোক, আমি তাকে সম্মান করি। আমি নারীকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমাকে আমি ধোঁকার মধ্যে রাখব না। আমি তোমাকে একথা বলে দেয়া আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি যে, এ ধনভাণ্ডার তোমার মহল নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্ধার করা হচ্ছে না। এই ধন ব্যবহৃত হবে মিসরের মূলোৎপাটনের কাজে। তারপর মিসরে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে এই ধনভাণ্ডার মিসরের

বাইরে চলে যাবে। আমি জানি, মিসর নিয়ে তোমার কোন কৌতূহল নেই। নেই আমারও। আমরা দু'জনই পেশাদার। পাপ করা আমাদের পেশা। আমার তোমাকে শুধু দু'টি কথা বলার ছিল, বলেছি। শোন, আবারও বলছি, প্রথম কথা- তোমার রূপ-যৌবন আর বেশি দিন টিকবে না। দ্বিতীয় কথা- এই লোকটি তোমাকে সঙ্গে করে এনেছে ফুর্তি করার জন্য। তার দৃষ্টিতে তুমি একটি বেশ্যা। সদয় হয়ে সে দু'একটি হীরক খণ্ড তোমার হাতে গুঁজে দিলেও দিতে পারে, তার বেশী নয়। সে যদি কারো জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেও, সে হবে অন্য কোন ষোড়শী কন্যা- তুমি নও। তোমার চেহারায় আমি চুলের ন্যায় সরু দু'টি রেখা দেখতে পাচ্ছি, যা আজ ভালই লাগছে। কিন্তু ক'দিন পর রেখা দু'টো গভীর হয়ে তোমাকে মূল্যহীন করে ফেলবে।'

ইসমাইলের ঠোঁটে মুচকি হাসি। বলার ধরনটা এমন যে, তাতে না আছে তিরস্কার না আছে প্রতারণার আভাস। আছে হৃদ্যতা ও বাস্তবতা, যা কুদুমী এর আগে কখনো শুনেনি। কুদুমীর ধারণা, বরং আশা ছিল, ইসমাইল তাকে কাছে টেনে নেবে। প্রেম নিবেনদন করবে। কিন্তু ইসমাইল তাকে সেই চোখে দেখলই না। বরং উল্টো তাকে এই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করল যে, এই পাপের জগতে সে দু'দিনের মেহমান মাত্র। কুদুমী বরাবরই নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। নিজেকে তার ক্লিওপেট্রা মনে করত সে। কিন্তু আজ ইসমাইল তাকে এমন এক ধারণা দিল, যাকে সে ফেলতে পারছে না। ইসমাইলের বলার ধরনই এমন যে, তার বক্তব্য কুদুমীর মনের গভীরে গেঁথে যায়।

রাত কেটে যাচ্ছে। তবু কুদুমীর চোখে ঘুম আসছে না। ইসমাইলের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে ভাল লাগছে তার। ইসমাইলও তাকে নিরাশ করল না। রাতের শেষ প্রহর। এবার দু'চোখের পাতা এক হয়ে আসে কুদুমীর।

বেশ বেলা হলে যখন কুদুমীর চোখ খুলল, তখন সে ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল তাঁবুর বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কুদুমী তাকে জাগিয়ে তুলে বলল, 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি- বড় বিস্ময়কর স্বপ্ন। কী দেখলাম পুরোপুরি মনে নেই। এতটুকু মনে আছে যে, কে যেন আমাকে বলছে, 'সোলায়মান সেকান্দারের ধনভাণ্ডারের চেয়ে ইসমাইলের কথাগুলোর মূল্য বেশী।' বলেই কুদুমী হেসে ওঠে- এমন হাসি, যাতে নর্তকীর কৃত্রিমতা নেই- আছে একটি নিষ্পাপ মেয়ের নির্মল সরলতা।

সূর্য এখনো উদিত হয়নি। পরিকল্পনা মোতাবেক মারকুনী তার সঙ্গীদেরকে উপযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। রাত পোহাবার পর এখন নীচের সবুজ-শ্যামল এলাকায় উলঙ্গ নারী-পুরুষের হাঁটা-চলা চোখে পড়তে

শুরু করে। মারকুনী তার এক দুঃসাহসী ও নির্ভীক সৈনিককে নীচে অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আগের অভিযানে তার এক সঙ্গী যে ঢালু গড়িয়ে নীচে পড়ে, এই রহস্যময় লোকগুলোর সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়েছিল, সেই ঢালু বেয়ে নীচে নেমে যেতে হবে তাকে। লোকটি ঢালের উপরে বসে নিজেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দেয়। গড়াগড়ি খেতে খেতে নীচের সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ে সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে যায় এবং হাঁটতে শুরু করে। তিন-চারজন মানুষখেকো লোক তাকে দেখে ফেলে। তাকে ধরার জন্য তারা ছুটে আসে। আনন্দে চিৎকার করছে তারা। তারা যখন লোকটির নিকটে চলে আসে, অমনি উপর থেকে শাঁ করে চারটি তীর ধেয়ে আসে এবং তাদের প্রত্যেকের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। ওদিক থেকে আরো দু'জন উলঙ্গ পুরুষ দৌড়ে আসে। তারাও তীরের নিশানায় পরিণত হয়। মারকুনী উপরে একটি পাথরের সঙ্গে রশি বেঁধে রেখেছিল। রশির অপর মাথা নীচের দিকে ছেড়ে দিয়ে রশি বেয়ে প্রত্যেককে নীচে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়।

রশি বেয়ে বেয়ে এক এক করে নীচে নেমে যায় মারকুনীর দলের সকলে। মারকুনী রশিটা খুলে নীচে ফেলে দেয় এবং নিজে গড়ানী খেয়ে নেমে যায়। এই ঢালু বেয়ে নীচে অবতরণ করা মারকুনীর পক্ষে ব্যাপার নয়। মারকুনীর নেতৃত্বে তরবারী উঁচিয়ে একদিকে ছুটে চলে বাহিনী। আরো কয়েকজন উলঙ্গ মানুষ সামনে পড়ে তাদের। তরবারীর আঘাতে টুকরো করে ফেলা হয় তাদেরকে। দূর থেকে দেখে পেছন দিকে পালিয়ে যায় কয়েকজন।

নীচের এই সবুজ-শ্যামল এলাকটা কয়েক ভাগে বিভক্ত। মারকুনী দেখতে পায় পলায়নপর সবগুলো মানুষ একই অংশে ঢুকে পড়েছে। সে তাদের পিছু নেয়। লোকগুলো চিৎকার করছে শুনতে পায় মারকুনী। চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে ধাওয়া করতে থাকে সে। দলের অন্যরা যাকে যেখানে পাচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে সবাইকে। পলায়নপর লোকগুলোর অনুসরণ করছে মারকুনী একা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকগুলো নজরে আসে মারকুনীর। তারা তিনজন। পালাবার পথ খুঁজছে তারা। মারকুনী ও তাদের মাঝে এখন সামান্য ব্যবধান। একদিকে একটি পাহাড় দেখতে পায় মারকুনী। পাহাড়ের পাদদেশে একস্থানে একটি গুহার মুখ। পলায়নপর লোকগুলো ঢুকে পড়ে এ-পথে। ঢুকে পড়ে মারকুনীও। মারকুনীর হাতে তরবারী।

এটি গুহা নয়– সুড়ঙ্গপথ। হতে পারে প্রাকৃতিক, কিংবা কোন ফেরাউনের তৈরি। কয়েকটি মোড় আছে সুড়ঙ্গটির। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্মুখে কথা বলার শব্দ কানে আসছে তার। মারকুনী এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একস্থানে আলো চোখে পড়ে। সেই আলোতে

তিনজন মানুষকে দৌড়াচ্ছে দেখে সে। এটি সুড়ঙ্গের অপর মুখ। লোকগুলোকে হত্যা করতে চাইছে না মারকুনী। মিশন তার সফল হতে চলেছে।

ভেতর থেকে বেরিয়ে যায় পলায়নপর লোক তিনজন। বেরিয়ে পড়ে মারকুনীও। দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় একজন। কাছে গিয়ে দেখে মারকুনী। একজন বৃদ্ধ, আগেরবার তার সঙ্গী নীচে পড়ে যাওয়ার পর যাকে দেখেছিল, সে।

সুড়ঙ্গের বাইরে বালুকাময় ও পাথুরে টিলা, বড় বড় পাথরখণ্ড। একদিকে কালো পাহাড় উপরে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। মারকুনী বৃদ্ধকে হাতে ধরে তুলে দাঁড় করায়। তাকে তার পলায়নপর সঙ্গীদ্বয়কে ফিরিয়ে আনতে বলে ইঙ্গিতে।

মারকুনীর ইঙ্গিত বুঝে ফেলে বৃদ্ধ। ডাক দেয় সঙ্গীদের। তারা দাঁড়িয়ে যায়। বৃদ্ধ তাদেরকে ফিরে আসতে বলে। তারা ফিরে আসে।

বৃদ্ধ মারকুনীর সঙ্গে মিসরী ভাষায় কথা বলে। সে বলল, 'আমি তোমার ভাষা বুঝি ও বলতে পারি। আমাকে খুন করে তুমি কিছুই পাবে না।'

মারকুনীও মিসরী ভাষা জানে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমার সঙ্গীদেরও খুন করব না। আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার পথটা দেখিয়ে দাও।'

'তুমি কি এখান থেকে বের হতে চাও?' জিজ্ঞেস করে বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ'– মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি তোমাদের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

বৃদ্ধ তার সঙ্গীদেরকে কি যেন বলল। তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ মারকুনীকে বলল, 'এদের সঙ্গে যাও, এরা তোমাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবে।'

'তুমিও সঙ্গে চল'– মারকুনী বলল– 'এরা আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ মারকুনীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দেয়। কতগুলো টিলার মধ্যদিয়ে হেঁটে তারা অপর একটি টিলার উপর উঠে যায়। তারপর আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এক খোলা ময়দানে গিয়ে উপনীত হয়। ভেতরে যাওয়া-আসার সোজাপথ পেয়ে যায় মারকুনী।

বৃদ্ধ মারকুনীকে বলল, 'তুমি এবার চলে যাও। অন্যথায় খোদার গজব তোমাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।' কিন্তু মারকুনী তো এমনিতেই চলে যেতে আসেনি। তার অভিযানের অগ্রযাত্রা শুরু হল মাত্র। এই বিজন পাহাড়ী এলাকায় যাওয়া-আসার সোজা পথ পেল মাত্র। ভয় দেখিয়ে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নেয় সে। তারপর এই বলে যে-পথে এসেছিল, সে-পথে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, আমার কিছু লোক ভেতরে আটকা পড়ে আছে, তাদেরকেও বের করে

আনতে হবে।

মারকুনীর হাতে খাপখোলা তরবারী। তার ভয়ে তিনজনই তটস্থ। তারা মারকুনীর সঙ্গে ফেরত রওনা হয়।

পথটা ভালভাবে চিনে নেয় মারকুনী। বাঁক-মোড় সব রপ্ত করে নেয়। বৃদ্ধ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে সুড়ঙ্গপথের একমুখ দিয়ে প্রবেশ করে অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধ মারকুনীকে সে স্থান দিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে মারকুনীর সঙ্গীকে ভুনা করে কেটে কেটে ভক্ষণ করা হয়েছিল। সেখানে কয়েকটি উলঙ্গ মানুষের লাশ পড়ে আছে। বেশক'টি শিশুর লাশও আছে। মারকুনীর সঙ্গীরা শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলেছে। বৃদ্ধ এই গণহত্যা বোধ হয় আগে দেখেনি। তাই অকস্মাৎ চমকে উঠে থেমে যায়। ধৈর্য সংবরণ করে মারকুনীকে জিজ্ঞেস করে, 'এই নিরপরাধ লোকগুলোকে খুন করে তোমরা কী পেয়েছ?'

'তোমরা আমার একজন সঙ্গীকে আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছিলে। সে তোমাদের কী ক্ষতি করেছিল?' প্রশ্ন করে মারকুনী।

'সে অপরাধ জগতের মানুষ ছিল'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমাদের এই পবিত্র সাম্রাজ্যে এসে সে একে নাপাক করেছিল।'

'তোমরা এখানে কেন থাক?'– মারকুনী জিজ্ঞেস করে– 'ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়-এর সমাধি কোথায়?'

'এ দু'টি প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না।' বৃদ্ধ জবাব দেয়।

ইত্যবসরে মারকুনীর সঙ্গীদের কয়েকজন এখানে এসে সমবেত হয়। মারকুনী তাদেরকে বলল, এদের মহিলাদেরকে নিয়ে আস। আক্রমণের আগেই মারকুনী সঙ্গীদের বলে রেখেছিল, কোন নারীকে হত্যা করবে না, উত্যক্তও করবে না। তাদেরকে পণ হিসেবে আটকে রাখবে।

মারকুনীর সঙ্গীরা দশ-এগারজন মহিলাকে সামনে নিয়ে আসে। তাদের দু'তিনজন বৃদ্ধা। দু'তিনজন কিশোরী। অন্যরা যুবতী। সবাই উলঙ্গ। গায়ের রং ফর্সা। বেশ সুন্দরী। মাথার চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা। সোনার তারের ন্যায় চিক চিক করছে সকলের চুল।

'আমরা যদি তোমাদের এই মেয়েগুলোকে তোমাদের চোখের সামনে অপমান করে হত্যা করি, তা কি তোমাদের কাছে ভাল লাগবে?' বৃদ্ধের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মারকুনী।

'তার আগে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেল।' বলল বৃদ্ধ।

'না, তা করব না। তোমার সামনেই এদের সম্ভ্রমহানি করে হত্যা করব।' বলল মারকুনী।

'শোন!' বৃদ্ধ বলল– 'তোমাদের মহিলারা কাপড়ে আবৃত থাকে। তাদের তোমরা পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখ। কিন্তু তারা অশ্লীলতা পরিহার করে না। তোমরা নারীর খাতিরে রাজ্য বিসর্জন দাও। তোমরা নারীকে নাচাও, তাদেরকে দিয়ে পাপ করাও। আর আমাদের মহিলারা কাপড় পরিধান করে না– উলঙ্গ থাকে। কিন্তু অশ্লীলতা করে না। আমাদের কোন পুরুষ অন্য পুরুষের স্ত্রীর প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না, যে দৃষ্টিতে তোমরা আমাদের নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছ। আমি তো তোমাদের এই কুদৃষ্টিপাতকেও সহ্য করতে পারি না। তোমরা পবিত্র খোদা র‍্যামন্স-এর ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যাও, তবু আমার কন্যাদের ইজ্জতের উপর হাত দিও না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি। তুমি আমাকে র‍্যামন্স-এর সমাধিটা দেখিয়ে দাও'– মারকুনী বলল– 'আমি তোমাদের ইজ্জতের উপর হাত দেব না।'

'দস্যুর ওয়াদা বিশ্বাস করা যায় না'– বৃদ্ধের দু'ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি– 'যাদের অন্তরে লোভ থাকে, তাদের চোখে লজ্জা থাকে না। তারা যে মুখে ওয়াদা করে, সে মুখেই তা ভঙ্গ করে। তুমি তো সেই জগতের মানুষ, যেখানে সম্পদের জন্য নারীকে বলি দেয়া হয়। আর শোন দোস্ত! তুমি মিসরী নও। আমি তোমার চোখে নীল নদের পানি নয় সমুদ্রের চমক দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার দেহ থেকে সমুদ্রের ওপারের ঘ্রাণ পাচ্ছি, মিসরের নয়।'

'আমি র‍্যামন্স-এর সমাধির সন্ধানে এসেছি'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মারকুনী বলল– 'বেশী কথা না বলে তুমি আমাকে সমাধিটা দেখিয়ে দাও।'

'তা দেখিয়ে দেব'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তার আগে আমি তোমাকে একথা অবহিত করা জরুরী মনে করছি যে, সমাধির ভেতরে গিয়ে তোমরা জীবিত বের হয়ে আসতে পারবে না।'

'কেন, তোমার সৈনিকরা কি ভেতরে লুকিয়ে আছে যে, ওরা আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে?' মারকুনী জিজ্ঞেস করে।

'না'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তোমাদেরকে হত্যা করার মত আমার কাছে কোন সৈন্য নেই। তোমার লোকেরাই তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর তোমার লাশটা ওখান থেকে কেউ তুলেও আনবে না।'

'তুমি কি গায়েব জান?'– মারকুনী জিজ্ঞেস করে– 'যে তুমি ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পার?'

'না'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমি অতীত দেখেছি। আর যে অতীতকে বিবেক ও অন্তরের চোখে দেখেছে, সে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তোমার দু'চোখে এসে বসেছে।'

মারকুনী খিলখিল করে হেসে ফেলে। বলে– 'বুড়ো! তুমি জংলী মানুষ। ওসব প্যাচাল বাদ দিয়ে বল, সমাধিটা কোথায়?'

'তোমার সামনে'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'ঐ তো উপরে। আমার সঙ্গে এস।'

মারকুনী কি যেন চিন্তা করে। তারপর সঙ্গীদের বলে, এই মেয়েগুলোকে সসম্মানে রাখ। বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প কর। ঐ লোক দু'টোর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার কর না। আমি কুদুমী ও ইসমাইলকে নিয়ে আসি।'

মারকুনী নতুন আবিষ্কৃত সোজা পথে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধের দেখান পথে বাইরে বেরিয়ে আসে মারকুনী। মিসর থেকে এসে কোন্ পথে এই ভয়ানক বিজন এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তা মনে আছে তার। কুদুমী ও ইসমাইলকে কোথায় রেখে এসেছে, তাও আন্দাজ করতে পারছে সে। বের হয়ে সেদিকে ছুটে চলে মারকুনী।

অন্তত দু'মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে যায় মারকুনী। মনে আনন্দের সীমা নেই তার। এখন সে যেখানে দাঁড়িয়ে, এখানেই ইসমাইল ও কুদুমীকে রেখে সে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু একটি দৃশ্য দেখে হঠাৎ মারকুনীর মনের আনন্দ উবে যায়। বদলে যায় চেহারার রং। কুদুমী ও ইসমাইল একই তাঁবুতে একত্রিত বসা। এ দৃশ্য সহ্য হল না মারকুনীর। প্রচণ্ড ক্ষোভ ঝরে পড়ে ইসমাইলের প্রতি। বলে, 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম, নিজের মর্যাদা রক্ষা করে থাকবে! ওর পাশে বসে তুমি কী করছ?'

'এই বিজন এলাকায় আমি একা বসে থাকব?'– কুদুমী বলল– 'ও আসেনি, আমি নিজেই ওকে ডেকে এনেছি। ওর দোষ নেই।'

'আমি তোমাকে সঙ্গে করে শুধু এবং শুধুই নিজের জন্য এনেছি'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মারকুনী বলল– 'আমি তোমাকে বিনিময় দিয়েছি। কাজেই তোমাকে আমি অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখতে চাই না, দেখতে পারি না। নিজের ঘরে শত পুরুষকে ডেকে আনতে পার; কিন্তু এখানে তুমি আমার কেনা দাসী।'

গত রাতে ইসমাইল নিষ্ঠমনে কুদুমীর হৃদয়ে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছিল, যা তার অন্তরে মারকুনীর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিরাগের জন্ম দেয়। যার ফলে কুদুমী মারকুনীকে নিজের একজন খদ্দের ভাবতে শুরু করেছে। এবার মারকুনী যখন তাকে 'ক্রীত দাসী' বলে অভিহিত করে বসল, তখন তার অন্তরে মারকুনীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল। কুদুমী ভাল ও মন্দ মানুষের পার্থক্য বুঝতে শুরু করেছে। অথচ ইসমাইল তাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে, আমি ভালমানুষ। বরং সে বলেছিল, আমি ভাড়াটিয়া অপরাধী, ভাড়াটিয়া খুনী।

কুদুমী মারকুনীকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। কারণ, সে চুক্তিবদ্ধ।

পাওনাটা বুঝে নিয়েই তবে এখানে এসেছে সে। ভবিষ্যতে গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ারও কথা আছে। অবশ্য এখন তা সংশয়পূর্ণ মারকুনী ইসমাইলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, কুদুমী তা সহ্য করতে পারে না।

ইসমাইল কোন কথা বলছে না। অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে মারকুনীর প্রতি। কিছুক্ষণ পর উঠে মারকুনীর বাহু ধরে তুলে সামান্য আড়ালে নিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আহমার দরবেশ বোধ হয় তোমাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি! তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। আমি তোমাকে ভালভাবেই জানি। তুমি আমার দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করতে এসেছ। আর আমি এত জঘন্য পাপী যে, ভাড়ায় তোমার সঙ্গ দিচ্ছি। তোমাকে আমি আমার রাজা স্বীকার করতে পারি না। আমি আমার পারিশ্রমিক কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করব আর গুপ্তধন উদ্ধার হলে তার থেকেও উপযুক্ত ভাগ নেব।'

'তুমি এসব কথা আহমার দরবেশের কাছে বল গিয়ে'– মারকুনী একজন সেনা কমান্ডারের ন্যায় বলল– 'এখানে তুমি আমার অধীন। গুপ্তধন যা উদ্ধার হবে, সব আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব।'

'শোন সুলায়মান সেকান্দার!'– ইসমাইল পূর্বের ন্যায় ক্ষীণ ও হাসিমাখা কণ্ঠে বলল– 'আমি জানি, তুমি মারকুনী- সুলায়মান সেকান্দার নও। আমি একজন পেশাদার অপরাধী। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি যে, তোমার এসব কথা আমাকে 'অপরাধী' থেকে 'মিসরী মুসলমানে' পরিণত করবে। আমি তোমাকে আরো হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, মুসলমান জাতীয় চেতনায় এতই অন্ধ যে, যদি কোন মুসলমানের লাশের মধ্যেও এই চেতনা জেগে ওঠে, তাহলে সেও উঠে দাঁড়িয়ে যায়। আমাকে তুমি অপরাধীই থাকতে দাও, তাতেই তোমার মঙ্গল।'

মারকুনী অনুভব করল, লোকটা বড় পাকা। এ মুহূর্তে তাকে শত্রুতে পরিণত করা ঠিক হবে না। ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে এবং মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে বলল, তুমি অহেতুক ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছ। আসল কথা হল, আমি চাই না যে, এই বেশ্যা মেয়েটা তোমার আমার কারো মস্তিষ্কে জেঁকে বসুক। ও বড় চতুর মেয়ে। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে সব গুপ্তধন হাতিয়ে নেয়ার বুদ্ধি আঁটছে। তুমি আমাকে শত্রু মনে কর না। আহমার দরবেশ কি তোমাকে বলেননি যে, তিনি তোমার ব্যাপারে কী ভাবছেন?'

'গুপ্তধন পেয়ে যাব আশা করা যায় কি?' জিজ্ঞেস করে ইসমাইল।

'পেয়ে গেছি'– মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি তোমাদের দু'জনকে নিতে এসেছি।'

ইসমাইল গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মারকুনীর প্রতি। তাকিয়ে আছে কুদুমীও। মনটা তার ক্ষুণ্ন স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। উট দেখাশোনা করার জন্য রেখে যাওয়া লোকটাকে ডাক দেয় মারকুনী। লোকটা ছুটে আসে। মারকুনী উটগুলোকে একটার পেছনে একটা বেঁধে নেয়ার নির্দেশ দেয় তাকে। গুটিয়ে নেয়া হয় তাঁবু দু'টোও।

ইসমাইল ও কুদুমীকে নিয়ে আসে মারকুনী। মনোরম সবুজ-শ্যামল জায়গা দেখে, বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে কুদুমী। উঁচু একটি পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি ঝিল। পাহাড়ের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি। দেখে মনটা ভরে যায় কুদুমীর।

মারকুনী গোত্রের উলঙ্গ বৃদ্ধ নেতার কাছে চলে যায়। কুদুমী ইসমাইলের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করে। হঠাৎ ছোট্ট একটি শিশুর লাশ চোখে পড়ে কুদুমীর। শিশুটি উলঙ্গ। সারা গায়ে রক্ত- যেন রক্ত দিয়ে গোসল করেছে বাচ্চাটা। ভয়ে আঁৎকে উঠে মেয়েটি। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার।

দু'জন এগিয়ে যায় আরো সামনে। এবার এক স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে দু'টি লাশ। এগুলো বয়স্ক মানুষের মৃতদেহ। উভয় লাশের গায়ে তীরবিদ্ধ। কুদুমীর ভয় আরো বেড়ে যায়। কাঁপতে শুরু করে সে।

দু'জন এগিয়ে যায় আরো সম্মুখে– যেখান দিয়ে মারকুনীর লোকেরা উপর থেকে নীচে নেমেছিল সেখানে। খোলামেলা জায়গা। এখানে পড়ে আছে আরো কয়েকটি লাশ। পাঁচ-ছয়টি শিশুর লাশ। অন্যগুলো বড়দের। সবগুলো লাশের মুখ ও চোখ খোলা। গায়ে নির্যাতনের ভয়ানক আলামত। মিসরের রূপসী কন্যা কুদুমী এমন বীভৎস দৃশ্য স্বপ্নেও দেখেনি কখনো। ছোট একটি শিশুর লাশ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠে সে।

মারকুনীর তিন-চারজন লোক চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে। কুদুমী মাথা চক্কর খেয়ে লুটিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ইসমাইল তাকে আগলে ধরে। মারকুনীর লোকদেরকে অবহিত করা হয় যে, মেয়েটি লাশ দেখে ভয় পেয়েছে। একজন পানি আনতে ছুটে যায়। কুদুমী অল্প সময়ের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই লাশগুলো কাদের? এদেরকে হত্যা করা হল কেন?'

ইসমাইলের ঘটনা জানা ছিল না। মারকুনীর এক লোক কুদুমীর প্রশ্নের জবাব দেয়। কুদুমী ইসমাইলের প্রতি তাকায়। পীতবর্ণ ধারণ করেছে তার মুখের রং। ইসমাইল বলল, 'এই লোকগুলো আমাদের চেয়ে ভাল। এরা গুপ্তধন পাহারা দিত। এরা মানুষ খেত, পোশাক পরত না ঠিক; কিন্তু আমানতদার ছিল। এরা যদি ফেরাউনের সমাধি খুঁড়ে ধনভাণ্ডার তুলে নিয়ে

যেত, তাহলে কে ঠেকাত?' আর আমরা? আমরা দস্যু, খুনী। অথচ আমরা নিজেদেরকে সভ্য দাবি করি। এসব মারকুনীর কারসাজি।'

'আমি সেই সম্পদ থেকে কিছুই নেব না, যার জন্য এই নিষ্পাপ শিশু ও নিরপরাধ লোকগুলোকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে'– কুদুমী বলল– 'এদের কাছে কোন অস্ত্র দেখতে পাচ্ছি না। এরা নিরস্ত্র ছিল।'

বৃদ্ধকে নিয়ে একটি পাথরখণ্ডের পেছনে চলে গেছে মারকুনী। বৃদ্ধ তাকে বলল, উপরে উঠে পড়; সেখানে ঐ যে বড় একটা পাথর দেখা যাচ্ছে, যদি তুমি পাথরটা সেখান থেকে সরাতে পার, তাহলে তুমি সেই জগতের দরজা দেখতে পাবে, যেখানে র‍্যামন্স-এর লাশের বাক্স ও তার ধনভাণ্ডার রাখা আছে। পাথরটা যেদিন এখানে স্থাপন করা হয়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তা নাড়ায়নি। পনেরশ' বছর যাবত এই পাথরকে কেউ স্পর্শও করতে পারেনি। আমরা পনেরশ' বছর পর্যন্ত এর রক্ষণাবেক্ষণ করছি। আমি তোমাকে র‍্যামন্স-এর মৃত্যুর কাহিনী এমনভাবে শোনাতে পারব, যেন তিনি এই গতকাল আমার চোখের সামনে মারা গেছেন। এই কাহিনী আমাকে আমার বাপ-দাদারা শুনিয়েছেন। দাদাকে শুনিয়েছেন, তার বাপ-দাদা। আমি আমার গোত্রের সব মানুষকে সেই কাহিনী শুনিয়েছি।'

'তোমার এসব কথা আমি পরে শুনব'– বলেই মারকুনী পাথরটির উপর উঠে যায়। তার চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। আর বিলম্ব সইছে না যেন তার। উপরের পাথরটা আলাদা স্থাপন করা কিংবা সেটি সরানো সম্ভব, তা তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এদিক-ওদিক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে মারকুনী। কিন্তু পাথরটা যে আলাদা, তার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নীচে নেমে আসে মারকুনী।

'আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না যে, এই পাথরটির দু'টি অংশ আছে'– বৃদ্ধ বলল– 'উপরের যে অংশটি পেছনের পাহাড়ের সঙ্গে মিলিত, সেটি পাহাড়েরই অংশ বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তব তা নয়। এটি মানুষের হাতের কৃতিত্ব। এর গাঁথুনী কুদরতী বলে মনে হলেও মূলত এটি মানুষেরই কারিগরী। র‍্যামন্স নিজের তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি করিয়েছেন। তার নীচে এবং পাহাড়ের বুকে যে জগত বিদ্যমান, তাও র‍্যামন্স তার জীবদ্দশায় তৈরি করিয়েছেন এবং বাইরের জগতের মানুষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখার জন্য এই পাথর ও তার সমাধি তৈরি করিয়ে কারীগরদের বন্দী করে রাখেন। মৃত্যুবরণ করার পর তার লাশের বাক্স এই সমাধিতে রাখা হয়। একজন জীবন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও তাতে রাখা হয়। তারপর কারিগরদের বন্দীশালা থেকে বের করে এনে তাদের দ্বারা উপরে পাথরটা স্থাপন করিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। তারপর এখানকার বিভিন্ন গুহায় বারজন লোককে বাস

করতে দেয়া হয়। তাদের মিসরের বারটি সুন্দরী নারী দেয়া হয়। তাদের দায়িত্ব এ এলাকার পাহারাদারী করা। আজ তুমি যাদেরকে হত্যা করেছ এবং এখনো যারা এখানে জীবিত আছে, তারা সবাই সেই বার দম্পতিরই বংশধর।'

'এখন বলুন, এই পাথরটা এখান থেকে সরাতে পারি কিভাবে?' জিজ্ঞেস করে মারকুনী।

'তোমার কি চোখ নেই?' বৃদ্ধ জবাব দেয়- 'তোমার কি বিবেক নেই? পাথরের ঐ চূড়াটা দেখ, তার সঙ্গে কি রশি বাঁধতে পার না? তোমার লোকদের গায়ে যদি শক্তি থাকে, তাহলে সবাই মিলে রশিটা টান। তাতে হয়ত পাথরটা নীচে নেমে আসতে পারে।'

মারকুনীর আর তর সইছে না। যত তাড়াতাড়ি সমাধির মুখটা উন্মুক্ত করে ফেলতে চাইছে। নিজের লোকদের ডাক দেয় সে। সঙ্গে নিয়ে আসা সরঞ্জামাদির মধ্যে রশিও আছে। মোটা একটা রশি হাতে নেয়। একজনকে উপরে উঠিয়ে রশির এক মাথা পাথরের চূড়ার সঙ্গে বাঁধতে বলে। তারপর রশির অন্য মাথায় ধরে নীচ থেকে টান দেয়ান জন্য সবাইকে নির্দেশ দেয়। নিজে উঠে যায় উপরে। নীচ থেকে সবাই সর্বশক্তি ব্যয় করে রশি ধরে হেইয়ো বলে টান দেয়। মারকুনী দেখতে পায়, রশির টানের সঙ্গে পাথরটা দুলছে। একবার এতটাই নড়ে উঠে যে, তার ফাঁক দিয়ে মারকুনী সমাধির ভেতরটা দেখে ফেলে। মনোবল বেড়ে যায় তার। ধ্বনি দিতে শুরু করে সে। এবার আরো জোরে টান মারে তার লোকেরা। স্থান থেকে পাথরটা অনেকটা সরে যায়। মারকুনী তার সঙ্গীদের বিশ্রাম নিতে বলে। সূর্য কালো পাহাড়ের পেছনে চলে গেছে। সঙ্গে করে মদ নিয়ে এসেছিল মারকুনী। তার নির্দেশে মদ হাজির করে একজন। মারকুনী বলল, পান কর, শক্তি সঞ্চয় করে পাথরটাকে কংকরের ন্যায় নীচে ফেলে দাও।

সবাই মদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মারকুনী ঘোষণা দেয়, 'আজ রাতে আমি তোমাদেরকে দু'টি উট রান্না করে খাওয়াব।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয় সকলের মাঝে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম দিগন্তেরও নীচে চলে গেছে সূর্য। অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার আগেই কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। সকলে রশি ধরে আরেকবার শক্তির পরীক্ষা দিতে শুরু করে।

মারকুনী উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপের কম্পমান আলোতে পাথরের উপরিভাগ সম্মুখে ঝুঁকে সরে যেতে দেখতে পায় সে। পূর্বাপেক্ষা আরো জোরে ধ্বনি তোলে সে- আনন্দ ধ্বনি। হঠাৎ ভয়ংকর এক শব্দ তুলে পাথরটা গড়িয়ে

পড়ে এবং উল্টে নীচে পড়ে যায়। মারকুনীর লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গাটা অপ্রশস্ত। তার পেছনেও বড় একটি পাথর। উপর থেকে পাথরটা এত তীব্রবেগে পড়ে যে, নীচ থেকে লোকগুলো সরবার সুযোগ পায়নি। নীচে আলোও কম। পাহাড় ও পাথরে ঘেরা এই জগতটা কয়েকটি সমস্বর চিৎকার ধ্বনিতে কেঁপে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। মারকুনী হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে আসে। একটি বাতি হাতে নিয়ে দেখে পতিত পাথরের নীচ থেকে রক্ত বইছে। কারো হাত দেখা যাচ্ছে, কারো পা, কারো মাথা। মস্তবড় পাথরটার চাপা খেয়ে থেতলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে প্রত্যেকের দেহ।

মারকুনী কারো দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পায়। ভাবে, কে যেন বেঁচে গেছে, সে-ই পালাচ্ছে। কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকায় সে। নজর পড়ে পার্শ্বে অবস্থিত পাথরটির উপর। তার উপর চারজন লোক দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকার। লোকগুলো কারা চেনা যাচ্ছে না। মারকুনী ধীরপায়ে গম্ভীর মুখে পাথরটির দিকে এগিয়ে যায়। একটি বাতি হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখে। একজন বৃদ্ধ। অপরজন ইসমাইল। তৃতীয়জন মারকুনীর অন্য এক সঙ্গী। চতুর্থজন কুদুমী। কুদুমী যেন আপাদমস্ত ভীতির মূর্তপ্রতীক। এ মুহূর্তে একটি নিশ্চল পাথর যেন মেয়েটা। অন্যরাও সবাই নীরব-নিস্তব্ধ। ঘটনার আকস্মিকতায় থ খেয়ে আছে সবাই।

সবার আগে মুখ খুলে বৃদ্ধ। বলে, 'আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম যে, আমি তোমার চোখের মধ্যে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে তোমাকে ভেদ বলে দিয়েছি। আমি জানতাম, এই ভেদ তোমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা আর মৃত্যুই আমার কর্তব্য পালন করে দেবে। যা হোক, এখন কি তুমি ফিরে যাবে?'

'না'– ক্ষীণ কণ্ঠে মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি আমার মিশন সম্পন্ন করব; এই সঙ্গীরা আমার সাহায্য করবে।' বলেই মারকুনী তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, 'মনে হচ্ছে কে যেন রক্ষা পেয়ে পালিয়েছে। কে পালাল?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কর'– বৃদ্ধ বলল– 'তোমার চারজন লোক আমার দু'ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমার লোকেরা তাদেরকে বের হওয়ার পথ দেখাবে না। তাদেরকে ভেতরেই পথ হারিয়ে মরতে হবে। ভাল হত, যদি তারা অন্যদের সঙ্গে পাথরের নীচে এসে জীবন দিত। এ মৃত্যু সহজ ছিল। যা হোক, আজ রাতের জন্য কাজ বন্ধ করে দাও; আমি সকালে তোমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাব।'

❁ ❁ ❁

মারকুনীর মনে এই দুর্ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেন

কিছুই ঘটেনি। বৃদ্ধকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খানা খাওয়ায় মারকুনী। ইসমাইল বৃদ্ধকে একটি চাঁদর প্রদান করে। বৃদ্ধ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নেয়। কুদুমীর মুখে রা নেই।

'তোমরা আমার এক সঙ্গীকে খেয়েছিলে'– বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে মারকুনী বলল– 'তার আগে কত মানুষ খেয়েছ?'

'যত পেয়েছি'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমাদের বংশধারায় নরমাংস খাওয়ার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। যে ইতিহাস আমার কানে দেয়া হয়েছে, তাতে পনেরশ' বছরের আগের একটি ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। কেউ বলেছিল, যারা খোদা র‍্যামন্স-এর সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করবে, বিজন পার্বত্য এলাকা তাদেরকে নিজের শীতল কোলে আগলে রাখবে, তারা পানি ও ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে না, তারা দুনিয়ার মোহ, সোনা-রূপা ও মদ-নারীর মোহ থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে তাদের শরীর আবৃত করার প্রয়োজন পড়বে না। তাদের অন্তরে পরস্পর ভালবাসা থাকবে। তাদের মধ্যে কোন লালসা থাকবে না। লালসাই মানুষকে খুনী, ডাকাত ও অসাধুতে পরিণত করে। মানুষ কখনো সম্পদের লালসার শিকার হয়, কখনো নারীর। লোভী মানুষের দ্বীন-ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না। লালসাই সব অনিষ্টের মূল। আমাদেরকে এই লালসার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একটি সময় আসবে, যখন র‍্যামন্স-এর রক্ষণাবেক্ষণকারীরা নরমাংস ভক্ষণ করবে। তারা এখান থেকে বাইরে বের হবে, মানুষ শিকার করে আনবে। কোন পশু পেলেও খেয়ে ফেলবে। অন্যথায় তাদের বংশধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তোমরা কি এখনো ফেরাউনদেরকে খোদা বলে বিশ্বাস কর?' কুদুমী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে।

'মানুষ বড় দুর্বল প্রাণী'– বৃদ্ধ বলল– 'তারা নিত্য খোদা বদল করে থাকে। অনেক সময় মানুষ নিজেই খোদা সেজে বসে। এ মুহূর্তে আমার খোদা তোমরা। কারণ, আমার জীবন ও আমার কন্যাদের ইজ্জত এখন তোমাদের হাতে। এই ভেদ আমি তোমাদেরকে খোদা বিশ্বাস করে ফাঁস করেছি। কেননা, আমি মৃত্যুকে ভয় করি, আমার কন্যাদের সম্ভ্রমহানিকে ভয় করি। ফেরাউনও তোমাদেরই ন্যায় সেকালের জনগণের ঘাড়ে তরবারী রেখে বলেছিল, আমি খোদা! তখন নিরীহ মানুষগুলো বাধ্য হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমিই আমাদের খোদা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য মানুষকে বাস্তব জগত থেকে বহু দূরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। মানুষের ভেতরকার মনুষ্যত্ব মরে যায়। আসল খোদা যাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' আখ্যা দিয়েছেন, তাদের দেহটাই শুধু রয়ে যায়। যার

কারণে তখন পেটের জ্বালায় পড়ে মানুষ সেই মানুষের সামনে সেজদায় অবনত হয়ে পড়ে, যে তার জঠর জ্বালা ঠাণ্ডা করে। মানুষের এই দুর্বলতাই রাজার জন্ম দিয়েছে, ডাকাত-দস্যু সৃষ্টি করেছে, মানুষকে শাসক-শাসিত ও জালিম-মজলুমে পরিণত করেছে। হিরে-জহরত মানুষকে পাপী বানিয়েছে। এই যেমন ধর, (কুদুমীকে উদ্দেশ্য করে) তুমি কে? তুমি এদের কার স্ত্রী? এদের কাকে তুমি আপন বলতে পার?' কুদুমী নর্তকী, তা জেনে ফেলেছে বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে কুদুমী। নানা কারণে পূর্ব থেকেই মনটা তার বেচাইন। এবার যোগ হল নতুন মাত্রা। বৃদ্ধের প্রশ্ন ঘামিয়ে তুলল মেয়েটিকে। তাকে কিছু বলতে না দেখে বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার সুশ্রী চেহারা আর যৌবনের কারণে নিজেকে খোদা ভাবছ। আর তোমার খদ্দেররা তোমাকে ভাবছে খোদা। তোমরা আমাকে জংলী বা হিংস্র মনে কর না। আমার কাছে কাপড় আছে, যা মাঝে-মধ্যে পরিধান করে আমি কায়রো যাই, তোমাদের সভ্য জগতটা দেখি। তারপর ফিরে এসে খুলে ফেলি। তোমাদের জগতে আমি শাহজাহাদেরকে ঘোড়া গাড়ীতে চড়ে ভ্রমণ করতে দেখি। দেখি তোমার ন্যায় শাহজাদীদের। দেখি নর্তকী-গায়িকাদের। আর দেখি তাদেরকে, যারা ওদেরকে নাচায়-গাওয়ায়। আমি ফেরাউনদের আমলের অনেক কথা শুনেছি। আর এ-যুগের ফেরাউনদেরকেও দেখছি। আমি তাদের পরিণতিও দেখেছি। দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরও পরিণতি, যা তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ না। তোমরা সম্পদের লোভে এতগুলো নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করলে! এটা তোমাদের অপরাধ, যার শাস্তি থেকে তোমরা রেহাই পাবে না, যেমনটি রক্ষা পায়নি ফেরাউনরা। আমি আগামীদিন ভোরে তোমাদেরকে সমাধির ভেতরে নিয়ে যাব। তখন তোমরা ফেরাউনের পরিণতি দেখতে পাবে। র‍্যামন্স যদি খোদা হত, তাহলে তার এই পরিণতি হত না। খোদা তো তিনি, যিনি জগতের সবকিছুকে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়– নিজে পরিণতি ভোগ করে না। পাহাড়ের তলে কংকাল হয়ে পড়ে আছে যে মানুষটি, আমি তাকে কখনো খোদা বলে স্বীকার করিনি। আমি ও আমার গোত্র তাকে পাহারা দেই না। আমরা দুনিয়ার লোভ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি বিশ্বাস স্থির করে নিয়েছি। আমরা সেই বিশ্বাসেরই রক্ষণাবেক্ষণ করছি শুধু।'

থেমে থেমে কাঁপা কণ্ঠে কথা বলছে বৃদ্ধ। তার প্রতি বিমোহিতের ন্যায় অপলক তাকিয়ে আছে কুদুমী। বৃদ্ধের বক্তব্যে কুদুমী নিজের পরিণতি দেখতে পাচ্ছে। মারকুনীর মুখে অবজ্ঞার হাসি। লোকটা মদপান করছে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'তুমি তোমার মহিলাদের নিকট চলে যাও। সকালে তাড়াতাড়ি ওঠে পড়বে। এসে আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ চলে যায়। মারকুনী কুদুমীকে বলে, 'চল, আমরা শুয়ে পড়ি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' মারকুনীকে সঙ্গ দিতে অস্বীকৃতি জানায় কুদুমী।

মারকুনী কুদুমীর প্রতি গা এলিয়ে দেয়। কুদুমী সরে যায় পেছন দিকে। মারকুনী মেয়েটিকে ধমক দেয়। ইসমাইল দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়ায়। কিছু না বলে মারকুনীর চোখে চোখ রাখে সে। মারকুনী পেছনে সরে যায়। কেটে পড়ে ধীরে ধীরে। ইসমাইলের বুকে মাথা গুঁজিয়ে শিশুর ন্যায় কাঁদতে শুরু করে কুদুমী।

❁ ❁ ❁

ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় মারকুনী। বৃদ্ধকে খোঁজ করে। পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না মহিলাদেরকেও। ডাকাডাকি করা হল, এদিকে-ওদিক ঘুরে দেখা হল। কিন্তু নেই– একজনও নেই। তবে মারকুনী তাদের তেমন প্রয়োজনও অনুভব করছে না। র‍্যামন্স-এর সমাধির মুখ তো এখন উন্মুক্ত। ভেতরে কোথায় কি আছে, বৃদ্ধ তার জানেই বা কি।

মারকুনী ইসমাইল, কুদুমী ও অপর সঙ্গীদের নিয়ে সেই পাথরের উপরের উঠে যায়, সেখানে সমাধির ভেতরে প্রবেশ করার পথ। মারকুনী ভেতরে নেমে পড়ে।

সুপ্রশস্ত এক গর্ত, যা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করে চলে গেছে একদিকে। মারকুনীর হাতে প্রদীপ। কিছুদূর গিয়ে সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের প্রান্তসীমায় কোদালের আঘাত হানে সে। আঘাত খেয়ে এমন এক শব্দের সৃষ্টি হয়, যেন পেছনের জায়গাটা ফোক্‌লা। এটি পাথরের দরজা। উপর্যুপরি আঘাত করা হয় তাতে। এক কিনারা দিয়ে ভেঙ্গে যায় দরজা। ফাঁক দিয়ে ভেতরের খোলা জায়গা চোখে পড়ে মারকুনীর। আরো পিটিয়ে দরজাটা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলা হয়। ভেতর থেকে পনের-ষোলশ' বছরের পুরনো দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধে সবাই পেছন দিকে সরে যায়। নাকে-মুখে কাপড় চেপে ধরে সবাই। কিছুক্ষণ পর আবার তারা অগ্রসর হয়। প্রদীপ হাতে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কয়েক পা সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

সিঁড়িগুলোর উপরে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে মানব-মস্তিষ্কের খুলি ও কংকাল। ঢাল-বর্শাও পড়ে আছে সেগুলোর আশপাশে। এগুলো সমাধির পাহারাদারদের হাড়-কংকাল। প্রহরার জন্য তাদেরকে জীবন্ত ভেতরে দাঁড় করিয়ে রেখেই সমাধির মুখটা এভাবে ভারী পাথর দ্বারা সীল করে দেয়া হয়েছিল।

সিঁড়িগুলো তাদেরকে অনেক নীচে এক স্থানে নিয়ে যায়। এখানে একটি

প্রশস্ত কক্ষ। এখানকার মাটি পাথুরে। অসংখ্য কারিগর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কক্ষটির দেয়াল ও ছাদ এমন নিপুণভাবে খোদাই করেছে, যেন এটি এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মডেলের প্রাসাদ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি নৌকা স্থাপন করে রাখা আছে কক্ষটির এক জায়গায়। নৌকাটির মধ্যেও পড়ে আছে অনেকগুলো হাড়গোড়-কংকাল-খুলি। এরা ছিল এই নৌকার মাঝি-মাল্লা।

কারিগরদের নিপুণ হাতে খোদাইকরা একটি অন্ধকার পথ অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যায় মারকুনী ও তার সঙ্গীদের। এই কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুসজ্জিত ঘোড়াগাড়ী। গাড়ীটির সম্মুখে আটটি ঘোড়ার বিক্ষিপ্ত কংকাল। সামনের আসনে মানব-হাড়ের স্তূপ। অন্যত্র পড়ে আছে আরো কয়েকটি মানব-কংকাল।

এই কক্ষ অতিক্রম করে আরো একটু অগ্রসর হওয়ার পর পাওয়া গেল আরো একটি কক্ষ, ঠিক যেন শীষমহল। কক্ষটির ছাদ বেশ উঁচু। কক্ষের একটি দেয়াল ঘেঁষে উপর দিকে উঠে গেছে কতক সিঁড়ি। সিঁড়ির উপর পাথর-নির্মিত একটি চেয়ার। এই চেয়ারে বসে আছে র‍্যামন্স-এর একটি মূর্তি। মূর্তিটিও পাথরের তৈরি।

সিঁড়ির উপর ইতস্তত কতগুলো মানব-কংকাল ও খুলি ছড়িয়ে আছে এখানেও। একটি খুলির সঙ্গে একটি মুক্তার হার চোখে পড়ে কুদুমীর। নীল বর্ণের একটি হীরাও আছে সঙ্গে। পার্শ্বে পড়ে আছে মহিলাদের কানে ব্যবহার্য কয়েকটি সোনার অলংকার ও কয়েকটি আংটি। অন্যান্য কংকালের গায়েও অনুরূপ নানা ধরনের অলংকার দেখতে পায় কুদুমী।

মারকুনী একটি হার তুলে হাতে নেয়। দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হিরা ও মুক্তাগুলো এখনো ঝকঝক করছে। এতটুকুও মন্দা পড়েনি তাতে। প্রদীপের আলোয় হিরাগুলো নানা বর্ণের কিরণ ছড়াচ্ছে। মারকুনী হারটা কুদুমীর গলায় পরিয়ে দিতে উদ্যত হয়। কুদুমী চিৎকার করে সরে ইসমাইলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। খিলখিল করে হাসি দিয়ে মারকুনী বলে, 'আমি বলেছিলাম না, তোমাকে আমি রানী ক্লিওপেট্রা বানিয়ে দেব। ভয় কর না কুদুমী। এসব হার-অলংকার তোমারই।'

'না'– কেঁপে উঠে কুদুমী– 'না, আমি এসব খুলি ও হাড়-কংকালের মধ্যে আমার পরিণাম দেখতে পেয়েছি। এরাও আমারই ন্যায় রূপসী ছিল। এটা ঐ খোদার প্রিয়ার হার, যিনি এখানে কোথাও মৃত পড়ে আছেন। আমি সেই লোকদের আঞ্জাম দেখে ফেলেছি, অহংকার যাদেরকে খোদায় পরিণত করেছিল।'

কুদুমী এতই ভয় পেয়ে যায় যে, সে ইসমাইলকে ধরে টানাটানি শুরু করে

দিয়ে বলে, 'আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চল, নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে। আমি এখন কংকাল ছাড়া কিছুই নয়।'

কুদুমীর গলায় একটি হার ছিল। হারটা খুলে সে সেটি একটি কংকালের উপর ছুঁড়ে মারে। হাতের আঙ্গুল থেকে মহামূল্যবান আংটিগুলো খুলে ফেলে দেয়। তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আমি আমার পরিণতি দেখে ফেলেছি। ইসমাইল তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।'

ইত্যবসরে মারকুনী অন্য একটি কক্ষে চলে যায়। এই সুযোগে কুদুমীকে আত্মসংবরণ করার পরামর্শ দিয়ে ইসমাইল বলল, 'এতকিছুর পর এ মুহূর্তে আমরা এখান থেকে চলে গেলে সমুদয় সম্পদ এই দু'খৃস্টান তুলে নিয়ে যাবে।'

আরো একটি পথ চোখে পড়ে ইসমাইলের। প্রদীপ তার হাতে। কুদুমীকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যায় ইসমাইল। আরো একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করে তারা। কক্ষের মধ্যখানে একটি চবুতরায় একটি বাক্স রাখা আছে। বাক্সের ভেতর একটি মানুষের লাশ। লাশের মুখমণ্ডলের দিকটা খোলা। এ-ই সেই ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়, যাকে মানুষ খোদা বলে বিশ্বাস করত ও সেজদা করত। লাশটা মমি করা। চেহারাটা সম্পূর্ণ অক্ষত। চোখ দু'টো খোলা।

ইসমাইল র‍্যামন্স-এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত। তাকায় কুদুমীও। তারপর চোখাচোখি করে দু'জন।

এদিক-ওদিক চোখ বুলায় ইসমাইল ও কুদুমী। এখানেও হাড়ের কংকাল দেখতে পায় তারা। অত্যন্ত আকর্ষণীয় কয়েকটি বাক্সও দেখতে পায়। একটি বাক্সের ঢাকনা খোলা। বাক্সটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে তারা। কতগুলো সোনার অলংকার, হিরা-জহরত পড়ে আছে তাতে। একটি মানুষের বাহুর হাড় ও একটি হাতের হাড্ডিও ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে। মাথার খুলি ও অন্যান্য হাড়-কংকাল পড়ে আছে বাইরে বাক্স সংলগ্ন।

'হায়রে মানুষ!'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইসমাইল বলল– 'লোকটা মারা যাওয়ার আগে অলংকার হিরা-জহরত তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। তার আশা ছিল, সে এখান থেকে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তার আগেই লোকটা স্বর্ণালংকারেরই উপর মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল! বৃদ্ধ ঠিকই বলেছিল যে, লালসা-ই মানুষের বড় শত্রু। ইসমাইল বাক্সটার প্রতি হাত বাড়িয়ে বলল, 'কুদুমী! তুমিও লোভে পড়েই এসেছ। আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব।'

'না ইসমাইল!'– ইসমাইলের বাক্সর প্রতি বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ফিরিয়ে আনে কুদুমী– 'আমার লালসা মরে গেছে। কুদুমী মৃত্যুবরণ করেছে।'

ইসমাইল পুনরায় বাক্সে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হঠাৎ কুদুমী চিৎকার করে বলে ওঠে, 'নিজেকে রক্ষা কর ইসমাইল!'

'ইসমাইল ঝানু লোক। একদিকে লুটিয়ে পড়ে চক্কর কাটে সে। খানিক সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দেখে, মারকুনী তরবারী উঁচিয়ে তার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। ইসমাইল সরে যাওয়ায় তরবারীর আঘাতটা গিয়ে পড়ে বাক্সর উপর। মারকুনী জোরালো কণ্ঠে বলে, 'এ ধনভাণ্ডার আমার।'

ইত্যবসরে মারকুনীর সঙ্গীও এসে যায়। ইসমাইলের কাছে খঞ্জর আছে, যা দ্বারা তরবারীর মোকাবেলা করা যায় না। পার্শ্বেই একস্থানে একটা বর্শা পড়ে আছে দেখতে পায় কুদুমী। মারকুনী ইসমাইলের উপর আঘাত হেনে চলেছে। ইসমাইল দক্ষতাবলে হাতের প্রদীপকে ঢাল বানিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে। মারকুনীর সঙ্গীও তার সঙ্গে যোগ দেয়। ধনভাণ্ডার দেখে মাতাল হয়ে গেছে খৃস্টানদ্বয়। কুদুমী কী করছে, সেদিকে তাদের নজর নেই।

কুদুমী বর্শাটা কুড়িয়ে নেয়। অপেক্ষা করতে থাকে সুযোগের। একসময় মারকুনীর পিঠটা চলে আসে কুদুমীর সামনে। কুদুমী তার সর্বশক্তি ব্যয় করে হাতে বর্শাটা ছেদিয়ে দেয় মারকুনীর পাজরে। টেনে বের করে আঘাত হানে আবারো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারকুনী।

মারকুনীর সঙ্গী কুদুমীর উপর তরবারীর আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এ সময় ইসমাইল খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। লোকটির পাজর থেকে পেট পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে সে-ও।

কুদুমী যে গুপ্তধনের ভাণ্ডার থেকে ভাগ নিতে এসেছিল, সঙ্গে নিয়ে আসা নিজের গলার হার, মূল্যবান আংটি ও নাক-কানের অলংকার সব সেখানে খুলে ছুঁড়ে ফেলে ইসমাইলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। নির্মল বায়ু গায়ে লাগে কুদুমীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। চলতে চলতে ইসমাইলকে বলে– 'বলতে পার, আমরা কোথা থেকে এসেছি? তুমি কি আমাকে চেন? বল তো আমি কে?'

'এসব প্রশ্ন তো আমারও'– ইসমাইল বলল- 'আমরা অতীত জীবনের সব পাপ ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে এসেছি।'

এই বিজন পার্বত্য এলাকা থেকে বের হওয়ার পথ তাদের জানা আছে। তারা পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে। অল্প ক'টি উট দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। অন্যগুলো কোথায় গেছে, কি হয়েছে, কে বলবে। দু'টি উটের পিঠে চড়ে বসে দু'জন। কায়রো অভিমুখে রওনা হয় তারা।

❁ ❁ ❁

পরদিন রাত দ্বিপ্রহর। গিয়াস বিলবীস ইসমাইল ও কুদুমীর মুখ থেকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথার তাৎপর্য এখন আমার বুঝে এসেছে। তিনি বলেছিলেন, এসব ধনভাণ্ডার থেকে তোমরা দূরে থাক।'

গিয়াস বিলবীস নগরীর কোতোয়াল। ইসমাইল ও কুদুমী তাকে ভালভাবেই চিনত। তারা গুনাহের কাফফারা আদায় করতে চাচ্ছিল। পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে তারা আহমার দরবেশের নিকট না গিয়ে সোজা চলে যায় গিয়াস বিলবীসের কাছে। কাহিনীর ইতিবৃত্ত শুনিয়ে তারা বলল, 'এই ঘটনার মূল নেপথ্য নায়ক আহমার দরবেশ।'

গিয়াস বিলবীস সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে পাঠান। তাকে ঘটনা শুনান হল। আহমার সাধারণ কোন ব্যক্তি নন। তারা সুলতান আইউবীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুলতান আইউবী অনুমতি প্রদান করেন। গিয়াস বিলবীস ও আলী বিন সুফিয়ান কয়েকজন সেনাসদস্য নিয়ে আহমার দরবেশের বাড়িতে হানা দেয়। সমস্ত ঘরে তল্লাশি নেয়া হয়। অন্য সবকিছুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পুরনো সেই কাগজগুলোও পাওয়া গেল। আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করা হল।

রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসের সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্য র‍্যামন্স-এর সমাধি অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। সুলতান আইউবী নির্দেশ দেন, সমাধিটা আগে যেভাবে বন্ধ ছিল, ঠিক সেভাবেই বন্ধ করে রেখে আসবে। তিনি কাউকে ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করে দেন। ইসমাইল তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

সুলতান আইউবীর বাহিনী সমাধি এলাকায় গিয়ে উপনীত হয়। রক্তাক্ত এক কাহিনীর জীবন্ত এক গ্রন্থ যেন এলাকাটি। এখানে লাশ, ওখানে লাশ। এখানে রক্ত, ওখানে রক্ত। রক্তের ছোঁয়ায় ম্লান হয়ে গেছে এলাকার মনোমুগ্ধকর সবুজের সমারোহ।

সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সমাধির মুখটা পূর্বের ন্যায় সুবিশাল সেই পাথর দ্বারা বন্ধ করে দেয়। ফেরাউন র‍্যামন্স চোখের আড়ালে চলে যায় পুনর্বার। শুধু নতুন করে নিজের বুকে তুলে নেয় আরো দু'টি পাপীর লাশ।

তিন গোয়েন্দা

১১৭৪ খৃস্টবর্ষ মোতাবেক ৫৬৯ হিজরী ইসলামী দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হল না। বছরের শুরুতেই আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ শোনালেন যে, আক্রায় আপনার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে এবং অপর একজন ধরা পড়েছে। এ সংবাদ নিয়ে এসেছিল তৃতীয় অন্য এক গুপ্তচর, যে এ দু'জনের সঙ্গী ছিল। ফিরে আসা গোয়েন্দা অনেক মূল্যবান তথ্যও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এক গোয়েন্দার শাহাদাত ও একজনের গ্রেফতারী ব্যাকুল করে তোলে সুলতান আইউবীকে।

আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন যে, সুলতান মাত্রাতিরিক্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন। আলী জানতেন, সুলতান আইউবী হাজারো সৈনিকের শাহাদাতবরণে কখনো অস্থিরতা কিংবা মনস্তাপ প্রকাশ করেন না। কিন্তু একজন কমান্ডো বা কোন গোয়েন্দার শাহাদাতের সংবাদ তাকে ব্যাকুল করে তোলে।

তেমনি এক দুঃসংবাদে সুলতান আইউবীর সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বেদনার ছাপ দেখে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আমীরে মোহতারাম! আপনার চেহারা মলিন হয়ে গেলে মনে হয় যেন সমগ্র ইসলামী দুনিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। ইসলামের ইজ্জত জীবনের কুরবানী কামনা করছে। একদিন আমাদের দু'জনকেও হয়ত শহীদ হতে হবে। দু'জন গোয়েন্দা হারিয়ে গেছে, তাতে কী হয়েছে? তাদের জায়গায় অন্য দু'জন পাঠিয়ে দেব। এই ধারা তো আর বন্ধ হয়ে যাবে না।'

'গোয়েন্দা মারফত শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে, আমি সেই আশংকা করছি না আলী!'– ম্লান মুখে হাসি টেনে সুলতান আইউবী বললেন– 'একজন গোয়েন্দার শাহাদাত আমার মনে এই ভাবনাটা জাগিয়ে তোলে যে, একদিকে এই নিবেদিতপ্রাণ মুমিন আমাদের চোখের আড়ালে জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন ও পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থেকে দুশমনের দেশে একা দায়িত্ব পালন করছে ও জীবনদান করছে, অন্যদিকে একজন ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার নিজের বিলাস-ভবনে রাজার হালে বাস করছে, বিলাসিতা করছে এবং ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করছে।'

'আচ্ছা, সালার, নায়েব সালার ও সকল কমান্ডারকে একটা নিয়ম করে ওয়াজ-নসীহত করলে কেমন হয়?'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আপনি মাসে অন্তত একবার ইসলামের মর্যাদা এবং ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াজ করুন। আমার ধারণা, দুশমনের প্রতি যাদের আকর্ষণ আছে, আপনি যদি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাদের দুশমন কে এবং তাদের লক্ষ্য কী; তাহলে তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন এসে যাবে।'

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'একজন মানুষ যখন ঈমান বিক্রির পেশা অবলম্বন করে, তুমি তার সম্মুখে কুরআন রেখে দিলে সে পবিত্র কিতাবখানা ধরে একদিকে সরিয়ে রাখবে। একদিকে কতগুলো শব্দসম্ভার অপরদিকে অর্থ-বৈভব, নারী আর মদ। এমতাবস্থায় মানুষ শব্দসম্ভার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। শব্দ-ভাষা মানুষকে নেশা দিতে পারে না, পারে না রাজত্বদান করতে। আমাদের জাতির গাদ্দাররা শিশু নয়, অজ্ঞ-অশিক্ষিতও নয়। তারা সবাই শাসক, সেনাবাহিনী ও সরকারের উঁচুপদের লোক। তারা সাধারণ সৈনিক নয়। দুশমনের সঙ্গে মাখামাখি শাসকরাই করে থাকে। সৈনিকরা লড়ে আর মরে। আমি কাউকে ওয়াজ করব না, ভাষণ দেব না। ঘন ঘন ভাষণদানকারী শাসকরা মূলত দুর্বলমনা ও অসৎ হয়ে থাকে। তারা দেশবাসীর হৃদয় ভাষা ও ভাষণ দ্বারা জয় করার চেষ্টা করে। ঘন ঘন ভাষণ শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। আমি ফৌজ ও কওমকে একথা বলব না যে, আমরা বিজয়ী, আমরা সুখী। আমি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাব। তারপর পরিস্থিতিই বলবে, আমরা ধনী না গরীব, বিজয়ী না পরাজিত। ফৌজ ও জনগণ আমার নিকট খাবার চাইবে। আমি মুখের ভাষায় তাদের পেট ভরাব না। আমি গাদ্দারদের শাস্তি দেব। তাদেরকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করব। শোন আলী বিন সুফিয়ান! তুমি আমাকে বক্তৃতার জালে আবদ্ধ কর না। আমার যদি বলার অভ্যাস বেড়ে ওঠে, তাহলে আমি মিথ্যা বলতেও শুরু করব।'

মিসরে বিদ্রোহের যে আশংকা দানা বেঁধেছিল, তাকে দমন করা হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চপদের কয়েকজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। দু'জন সুলতান আইউবীর নিকট এসে আত্মসমর্পণ করে অপরাধ স্বীকার করেছে এবং ক্ষমা নিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবীর কথা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশে যারা গাদ্দারী ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, তারা স্বার্থপূজারী শাসক হয়ে থাকে। তারাই ফৌজ ও কওমকে বিভ্রান্ত করে সুখের স্বপ্ন দেখায় এবং বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করে। ১১৭৪ সাল পর্যন্ত মিসরে বিদ্রোহের নাম-চিহ্নও ছিল না। খৃস্টানরা গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজে

লিপ্ত ছিল এ-ই যা। সুলতান আইউবী খৃস্টান অধিকৃত এলাকাগুলোতে গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছিলেন।

আক্রা ফিলিস্তিনের একটি এলাকা। খৃস্টানদের প্রধান পাদ্রী–খৃস্টানরা যাকে 'ক্রুশের মোহাফেজ' বলে বিশ্বাস করে– এখানে অবস্থান করেন। এখান থেকেই খৃস্টান কমান্ডাররা দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে থাকে। এক কথায়, আক্রা খৃস্টান হাইকমান্ডের হেডকোয়ার্টার। নুরুদ্দীন জঙ্গী যখন কার্ক দুর্গ জয় করেন, তখন খৃস্টানরা এই আক্রাকে কেন্দ্র বানিয়ে সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাত থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসকে রক্ষা করার পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেখানকার পরিস্থিতি এবং দুশমনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতান জঙ্গীকে অথবা কায়রোতে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছানোর জন্য তিনজন গোয়েন্দা প্রেরণ করা হয়েছিল। অতিশয় নির্ভীক ও বিচক্ষণ গুপ্তচর ইমরান তাদের কমান্ডার।

তিন গোয়েন্দা অতি অনায়াসে ঢুকে যায় আক্রা। সুলতান আইউবী যখন শোবক দুর্গ ও শহর জয় করেন, তখন সেখান থেকে অসংখ্য খৃস্টান ও ইহুদী কার্ক পালিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন কার্কও জয় করে ফেলে, তখন সেখান থেকেও অমুসলিমরা পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

এই দু'টি বিজিত অঞ্চলের আশপাশের এলাকার ইহুদী-খৃস্টানরাও পালিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে তার কয়েকজন গুপ্তচর নির্যাতিত ও বাস্তুহারা খৃস্টানের বেশ ধারণ করে খৃস্টানদের এলাকায় চলে গিয়েছিল। তাদের তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তারা আক্রা থেকে খৃস্টানদের যুদ্ধ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো প্রেরণ করবে। সেখানকার খৃস্টান বাহিনীর গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখবে, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে আতংক সৃষ্টি করবে এবং এই তথ্যও সংগ্রহ করবে যে, সেখানে কী ধরনের নাশকতা পরিচালনা করা যায়।

মুসলমানদের হাতে সর্বস্বহারা খৃস্টানের বেশে আক্রা ঢুকে পড়ে তিন গোয়েন্দা। নির্যাতিত খৃস্টান হিসেবে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়ে যায় তারা। তিনজনই প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত বিচক্ষণ। ইমরান সোজা বড় পাদ্রীর নিকট চলে যায়। নিজেকে এমন একটি এলাকার শরণার্থী বলে পরিচয় দেয়, যেটি খৃস্টানদের ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। ইমরান এমনভাবে কথা বলে, যেন তার মাথায় ধর্মীয় উন্মাদনা চেপে বসেছে এবং খোদার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে ফিরছে। সে পাদ্রীকে জানায়, তার স্ত্রী-সন্তানরা সবাই মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। কিন্তু তাদের জন্য তার কোন দুঃখ নেই। অস্থিরচিত্ত ইমরান প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে যে, সে গীর্জার সেবা

করতে চায়। সে শুনেছে, খোদা ও রূহানী শান্তি গীর্জায় পাওয়া যায়। পাদ্রী জিজ্ঞেস করলে বলে, জন্‌গন্থুর।

'আর আমি মুসলমান তো হয়েই গিয়েছিলাম। ইমরান পাদ্রীকে বলল– 'মুসলমানদের একজন মৌলভী বলেছিল, খোদা মসজিদে আছেন। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের অভিযোগ ছিল, আমি কোন কাজ করি না– কেবল খোদা আর রূহানী শান্তি খুঁজে বেড়াই। আমি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার স্ত্রীকে মুসলমানদের হাতে হত্যা করিয়ে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন। কারণ, আমি তাকে ভাত-কাপড় দিতে পারতাম না। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার সন্তানদেরকেও তুলে নিয়েছেন। কারণ, সন্তান মা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর আমি তো তাদের খবরই নিতাম না। আমি মুসলমান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা আমার নিষ্পাপ সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলল। তারা আমার উপর অনেক অত্যাচার করে। তাতেই আমি বুঝে ফেলি, খোদা মুসলমানদের বুকে নেই, আছেন অন্য কোথাও।'

বলতে বলতে সীমাহীন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে ইমরান। হঠাৎ পাদ্রীর গলা জড়িয়ে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'পবিত্র পিতা, বলুন! আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? আমি আত্মহত্যা করব পবিত্র পিতা! তারপর পরজগতে আপনাকে টেনে খোদার সামনে নিয়ে যাব এবং বলব, এই লোক ধর্মগুরু ছিল না- ছিল একজন ভণ্ড। ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দিত।'

ইমরানের মানসিক অবস্থা এমন রূপ ধারণ করে যে, ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইমরানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি আমার নির্যাতিত সন্তান। খোদা তোমার নিজেরই বুকে আছেন। খোদার পুত্রের এবাদতখানায় তুমি তাকে দেখতে পাবে। এই ধর্মে এই রূপেই তুমি খোদাকে পেয়ে যাবে। এখন তুমি চলে যাও। প্রতিদিন সকালে আমার কাছে এস। আমি তোমাকে খোদা দেখাব।'

'আমি কোথাও যাব না পবিত্র পিতা'! ইমরান বলল– 'আমার কোন ঘর নেই। জগতে কেউ নেই আমার। আপনি আমাকে আপনার কাছেই থাকতে দিন। আমি আপনার এবং খোদার পুত্রের গীর্জার এত অধিক সেবা করব যে, তত সেবা আপনিও করেননি।'

ইমরান প্রশিক্ষণ পেয়েছিল আলী বিন সুফিয়ানের নিকট থেকে। তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে যেহেতু খৃস্টানদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেহেতু তাদেরকে খৃস্টবাদ ও খৃস্টানদের গীর্জার আদব-কায়দা সম্পর্কে শুধু শিক্ষাই দেয়া হয়নি, রীতিমত রিহার্সেলও করান হয়েছে। ইমরান সেই মহড়াকে এমন চমৎকারভাবে বাস্তবের রূপ দেয় যে, আক্রার বড় পাদ্রী

এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তাকে গীর্জায় থাকতে দেয়। ইমরান এত চমৎকারভাবে পাদ্রীর সেবা করতে শুরু করে যে, অল্প ক'দিনে সে পাদ্রীর খাস খাদেমে পরিণত হয়ে যায়। প্রশিক্ষণ ও বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তার বলে ইমরান পাদ্রীর অন্তর জয় করে নেয়। পাদ্রী স্বীকার করে নেন যে, লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কিন্তু আবেগ তার উপর এত প্রবলভাবে চেপে বসেছে যে, তার বুদ্ধি-মেধা লোপ পেতে শুরু করেছে। পাদ্রী ইমরানকে দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

❁ ❁ ❁

ইমরানের এক সঙ্গী খৃস্টান এক ব্যবসায়ীর নিকট গিয়ে বলে, আমি কার্ক থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান। ওখানে আমার গোটা পরিবার মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। লোকটি তার দুঃখের কাহিনী এমন আবেগময় ভঙ্গিতে বর্ণনা করে যে, তাতে প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ী তাকে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে রেখে দেয়।

ইমরানের এই সঙ্গী গোয়েন্দার নাম রহীম হাঙ্গুরা। সুদানী মুসলমান। ইমরানের মতই বিচক্ষণ, সাহসী ও সুদর্শন।

রহীম এখন খৃস্টান ব্যবসায়ীর দোকানের কর্মচারী। রহীম লক্ষ্য করে, অনেক খৃস্টান অফিসার তার দোকানে আসছে এবং সওদাপাতি ক্রয় করছে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রশিক্ষণের জোরে রহীম ব্যবসায়ীর বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যবসায়ী তাকে দিয়ে বাসার কাজও করাতে শুরু করে। আইলীমুর নামক খৃস্টান ব্যবসায়ীর বাসায়ও আনাগোনা শুরু হয়ে যায় রহীমের। বাসার লোকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে ফেলে রহীম হাঙ্গুরা। ব্যবসায়ীর স্ত্রী, যুবতী কন্যা ও পুত্রদের কাছে রহীম নিজের বিপদের কাহিনী এমনভাবে বিবৃত করে যে, শুনে তাদের প্রত্যেকের চোখে পানি এসে যায়। রহীম তাদেরকে জানায়, আমার ঘরও আপনাদের ঘরের ন্যায় বিলাসবহুল ছিল। ছিল উন্নত জাতের ঘোড়া। ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রহীম বলে, আমার ছিল আপনার এই কন্যারই মত অতিশয় রূপসী যুবতী বোন। প্রয়োজনীয় চাকর-চাকরানী ছাড়াও ছিল এমন অনেক কর্মচারী, যাদেরকে শুধু বিপদগ্রস্থ বলে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। রহীম চোখের পানি মুছতে মুছতে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে, আর আজ আমি অন্যের ঘরে নোকরী করছি।

ব্যবসায়ীর ষোড়শী কন্যা আইলসন। অতিশয় রূপসী। রহীমের বক্তব্যে অন্যদের তুলনায় বেশী প্রভাবিত হয় মেয়েটি। রহীমকে তার বোন সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করে। খুটিয়ে খুটিয়ে এ-কথা ও-কথা নানা বিষয় জানতে চায়। রহীম বলে, 'আমার বোনটি ঠিক তোমারই ন্যায় ছিল, যেন তুমিই। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার তার কথা বেশী বেশী মনে পড়ছে। বোনটি মরে গেলেও দুঃখ করতাম না। দুঃখের বিষয় হল, ওকে মুসলমানরা তুলে নিয়ে গেছে। তুমি বুঝতে পারবে, ওর কী পরিণতি ঘটেছে! এখন আমার একটাই ভাবনা, বোনকে মুসলমানদের হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার করব। বিষয়টি মনে পড়লে অনেক সময় আমি পাগলের মত হয়ে যাই, মন চায় বোনকে যেখান থেকে হারিয়েছি, সেখানে ছুটে যাই। কিন্তু আবার ভাবি, তাতে কী হবে? ওখানে গেলে বোন তো পাব না, পাব মৃত্যুকে। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।' বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রহীমের। দু'চোখ তার বাষ্পাচ্ছন্ন।

মা-মেয়ে বোধ হয় চিন্তা করেছে যে, এমন সুশ্রী যুবক ভরা যৌবনেই দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত। তার আবেগময় অবস্থা-ই প্রমাণ করছে, তার দুঃখ যদি হাল্কা করা না যায়, তাহলে লোকটি পাগল হয়ে যেতে পারে কিংবা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। ব্যবসায়ীর অবিবাহিত রূপসী কন্যা আইলসন হৃদয় দিয়ে রহীমের দুঃখ অনুভব করতে শুরু করে। রহীমের বেদনা নিজেকেও বেদনাহত করেছে বলে মনে হয় তার। প্রথম দিনেই রহীমের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে আইলসন।

নিজের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে রহীম যখন ব্যবসায়ীর ঘর থেকে বের হয়, তখন এক বাহানায় আইলসন ছুটে এসে রহীমের পথ আগলে দাঁড়ায় এবং বলে, আপনি আমাদের বাসায় প্রতিদিন আসা-যাওয়া করবেন। মেয়েটি সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বলে রহীমের দুঃখের বোঝা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

রাতে ব্যবসায়ী ঘরে ফিরলে মা-মেয়ে দু'জনই ছেলেটার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার কথা বলেন। রহীমের চেহারা-গঠন এমন যে, দেখতে তাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের সন্তান বলে মনে হয়। ত্রুটি যদিও কিছু আছে, সেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার ব্যবহার আর চালচালনে। আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চলেছে রহীম হাঙ্গুরা।

তিন-চারদিন পর। রহীম হাঙ্গুরা তার মালিকের কাছে উপবিষ্ট। এমন সময় সে তার এক সঙ্গীকে দেখতে পায়। তার নাম রেজা আলজাদা। রহীম উঠে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে আর কথা বলছে। রহীম রেজাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করছ? রেজা জানায়, আমি এখনো কোন আশ্রয় পায়নি।

রেজা অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া প্রতিপালনেও তার বেশ দক্ষতা আছে। রহীম তাকে নিজের মালিকের কাছে নিয়ে এসে ফ্রান্সিস নামে পরিচয়

করিয়ে দেয়। বলে, এ আমার বন্ধু, আমারই ন্যায় মজলুম। একটা চাকরির প্রয়োজন। রহীম মালিককে এ-ও জানায় যে, তার বন্ধু ঘোড়া প্রতিপালনে খুবই অভিজ্ঞ। ব্যবসায়ী বলল, ঠিক আছে, আমার কাছে তো অনেক অফিসারের আসা-যাওয়া আছে; দেখি, তাদের মাধ্যমে ফ্রান্সিসকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি কিনা।

দু-তিনদিন পর এমন একটি আস্তাবলে রেজার চাকরি হয়ে যায়, যেখানে খৃস্টান ফৌজের বড় বড় অফিসারদের ঘোড়া থাকে।

খৃস্টানদের অনেক সেনা অফিসার আসা-যাওয়া করে রহীমের মালিকের কাছে। সেও যাওয়া-আসা করে তাদের কাছে। রহীম দেখতে পায়, তার মালিক অফিসারদেরকে মদ-হাশীশ ছাড়াও লুকিয়ে লুকিয়ে নারী সরবরাহ করছে। এই সূত্রেই সামরিক অফিসারদের মুঠোয় করে রেখেছে ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ীকে রহীম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলেছে। সে আকাঙ্খা ব্যক্ত করে যে, খৃস্টান ফৌজ সমগ্র আরব ও মিসর দখল করে নিক, কোন মুসলমান জীবিত না থাকুন এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এ জাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে রহীম এমন ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে উঠছে, যেন সে আক্রার মুসলমানগুলোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তাদের রক্ত পান করবে। ব্যবসায়ী তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন যে, খৃস্টান ফৌজ তার এই খায়েশ পূরণ করবে। রহীম খৃস্টান বাহিনীর ঐসব অফিসারদেরকেও মন্দ বলতে শুরু করে, যারা আক্রায় বসে বসে আয়েশ করছে।

এসব আবেগময় কথাবার্তার পাশাপাশি রহীম বুদ্ধিমত্তার কথাও বলতে থাকে এবং মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য এমন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করে যে, ব্যবসায়ী তাকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান বলে ভাবতে শুরু করে। রহীমের এই আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ব্যবসায়ী তাকে খৃস্টানদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ভেদ জানাতে শুরু করে। সেনা অফিসারদের সঙ্গে উঠাবসা থাকার কারণে ব্যবসায়ী সামরিক বিষয়ে অনেক তথ্যই জানে।

ব্যবসায়ীর রূপসী কন্যা আইলসনের সখ্য গড়ে উঠে রহীমের সাথে। রহীমও নিজের মনে আসক্তি অনুভব করে আইলসনের প্রতি। রহীম মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে, দায়িত্ব পালন শেষে আইলসনকে সঙ্গে করে কায়রো যাবে। মেয়েটাকে বিয়ে করবে মুসলমান বানিয়ে। মন দেয়া-নেয়া চলছে দু'জনের মধ্যে। কিন্তু দু'জনের একজনও জানে না, খৃস্টান ফৌজের বড় এক অফিসার নজর রাখছে আইলসনের প্রতি।

রেজা আলজাদাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তার আস্তাবলে ঘোড়া রাখেন,

এমন একজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আলাপ হয় তার। কথাবার্তা শুনে অফিসার আন্দাজ করে, ছেলেটা অসাধারণ, বেশ বুদ্ধিমান। মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে দু'জনের মধ্যে। অফিসারের সঙ্গে আগ বাড়িয়েও কথা বলতে পারছে রেজা। একদিন রেজা অফিসারকে জিজ্ঞেস করে, 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে আপনারা কবে নাগাদ পরাস্ত করবেন?' তারপর সে অফিসারের আপন হয়ে আইউবীর সৈন্যদের কি কি গুণ আছে এবং খৃস্টান সৈন্যদের কি কি ত্রুটি আছে তার বিবরণ দেয়। একদিন অফিসারকে এমন কিছু কথাবার্তা শোনায়, যা একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ লোক ছাড়া বলতে পারে না। অফিসার খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আসলে কে?' ঘোড়া প্রতিপালন করা তো তোমার পেশা হতে পারে না!'

'সহিসী আমার পেশা, আপনাকে কে বলল?' রেজা জবাব দেয়– 'আমি কার্কে অনেকগুলো ঘোড়ার মালিক ছিলাম। আমি নিজে ফৌজে ছিলাম না বটে; আমার দু'টি গোড়া যুদ্ধে গিয়েছিল। এটা কালের চক্র স্যার! কালের চক্রেই আমি ঘোড়ার মালিক আজ আপনাদের আস্তাবলে সহিসীর চাকুরী করছি। তবে তার জন্য আমার দুঃখ নেই। আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারেন, তাহলে জীবনের বাকী দিনগুলো আমি আপনার জুতা পরিষ্কার করে কাটিয়ে দেব।'

'পরাজয় সালাহুদ্দীন আউইবীর লিখন হয়ে গেছে ফ্রান্সিস!' রেজাকে বললেন অফিসার।

'কিন্তু কিভাবে?'– সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল রেজা– 'আমাদের সম্রাটগণ যদি কার্ক ও শোবকের উপর আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে সেই পদ্ধতিতে অবরুদ্ধ করে পরাজিত করার চেষ্টা করেন, যে পদ্ধতিতে তারা আমাদেরকে পরাজিত করেছিল, তাহলে আপনারা সফল হতে পারবেন না। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যুদ্ধের ওস্তাদ। আমি শুনেছি, তারা নাকি আমাদের বাহিনীকে দুর্গ থেকে দূরে প্রতিহত করার আয়োজন করে রেখেছে। ভাল হবে, যদি আক্রমণটা এমন একদিক থেকে করা হয়, যেদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে বলে আইউবী কল্পনাও করে না। আইউবী ও জঙ্গী দুর্গে বসে থাকুক, আপনারা মিসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

'এমনই তো হবে'– অর্থবহ মুচকি হেসে অফিসার বললেন– 'সমুদ্রে কোন দুর্গ থাকে না। মিসরের উপকূলেও কোন দুর্গ নেই। মিসরে এখন ক্রুশেরই রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ফ্রান্সিস।'

প্রথম তথ্যটি সংগ্রহ করল রেজা। তারপর সেই অফিসারের নিকট থেকে আরো অনেক তথ্য জেনে নেয় সে। যুদ্ধের ভেদ বিস্তারিত প্রকাশ করে না

কেউ। ইঙ্গিত থেকেই জেনে নিতে হয় অনেক কিছু। 'ই' বললে 'ইদরীস' বুঝতে হয়। একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী গোয়েন্দার পক্ষে তা কোন ব্যাপারই নয়। একটি ইশারাকে নিজের যোগ্যতা বলে এক বিশাল কাহিনীর রূপ দিতে পারে অভিজ্ঞ গুপ্তচর।

❁ ❁ ❁

রহীম ও রেজা প্রতি রোববার সকালবেলা গীর্জায় গিয়ে ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে এবং আগের দিনের রিপোর্ট প্রদান করছে। রহীম ইমরানকে অবহিত করে রেখেছিল যে, তার মালিকের মেয়ে আইলসন তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে শুরু করেছে। ইমরান তাকে বলে দেয়, 'তুমি তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান কর না; অন্যথায় তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। তবে সাবধান! তুমি আবার মেয়েটির ভালবাসায় হারিয়ে যেও না।'

কিন্তু ঘটনা সেদিকেই গড়াচ্ছিল। রহীম আইলসনের রূপ-যৌবনে হারিয়ে যেতে শুরু করল। মেয়েটি রহীমকে এমনও বলে দিয়েছিল যে, তোমার-আমার বিয়ে হতে হলে আমাদেরকে আক্রা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কারণ, একজন সেনা অফিসার আমাকে পাওয়ার জন্য আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছে। কিন্তু রহীম ইমরানকে এতকিছু অবহিত করেনি।

ইমরান এখন পাদ্রীর ঘনিষ্ঠ শিষ্য। পাদ্রীর ভেদ-রহস্য সবই রহীমের জানা হয়ে যায়। অবসর সময়ে ইমরানকে ধর্মের দীক্ষা প্রদান করছেন পাদ্রী। তিনি ইমরানকে সবক দিচ্ছেন যে, খৃস্টবাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল, ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য খৃস্টানদের লড়াই করতে হবে এবং যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা জরুরী নয় যে, মুসলমানদেরকে মেরে ফেলতে হবে। প্রথমত তাদেরকে খৃস্টান বানাবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করার পরও যাদেরকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হবে না, তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিতে হবে। তার উপায় হল, তাদের মধ্যে অপকর্মের বীজ বপন করতে হবে। এ-কাজের জন্য মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে অপকর্ম ছড়িয়ে দেবে, মুসলিম যুবক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চরিত্র ধ্বংস করবে। যেহেতু ইহুদীরাও মুসলমানদের দুশমন এবং তারা তাদের মেয়েদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, সেহেতু মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য ইহুদী মেয়েদেরকেও কাজে লাগাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে একটাই- মুসলমানদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলা। তারপর এর জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা। অন্যের দৃষ্টিতে হোক তা অবৈধ, নিপীড়নমূলক, লজ্জাকর।

ইমরান পাদ্রীর মুখ থেকে এসব কথা শুনছে আর স্বস্তি প্রকাশ করছে।

পাদ্রীর আস্তানায় সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসাররাও আসা-যাওয়া করছে। সে দিনগুলোতে যেহেতু খৃস্টানদের একের পর এক ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে পালাতে হচ্ছিল, সে কারণে আক্রায় যে কারো মুখে একই প্রশ্ন বিরাজ করছিল যে, জবাবী হামলা কবে হবে। পাদ্রীর আস্তানায় ও এর বাইরে অন্য কোন আলোচনা নেই। ইমরান সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য হাসিল করে চলেছে। সে এও জেনে ফেলেছে যে, খৃস্টান সম্রাটদের মধ্যে একতা নেই। প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ রাজত্বই মুখ্য। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রত্যেকের ধর্ম এক, তাই ক্রুশের উপর হাত রেখে তারা ইসলাম নির্মূলের যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। অন্যথায় ভেতরে ভেতরে তারা বিভক্ত। কেউ কেউ এমনও আছে, তারা একদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, অন্যদিকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন সিজার ম্যানুয়েল, যিনি এক ময়দানে নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সন্ধি করে জরিমানা আদায় করেছেন এবং মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন তিনি অন্যান্য সম্রাটদের উত্তেজিত করছেন, যেন সবাই মিলে সুলতান জঙ্গীর উপর আক্রমণ চালায়। তার পরামর্শ, আমাদের আক্রমণ অভিযানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হোক; একটি জঙ্গীর উপর অপরটি মিসরের উপর। সুলতান জঙ্গী তখন কার্কে অবস্থান করছিলেন।

এ কারণে অনেক সম্রাটের উপরই পাদ্রীর আস্থা ছিল না। তাদের দু-মুখো নীতির জন্য তিনি বেজায় অস্থির। ইমরান ইচ্ছে করলে বলতে পারে, 'যে জাতি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের মেয়েদেরকে যা-তা কাজে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না, সে জাতির সম্রাটরা একে অপরকে ধোঁকা দিবে তাতে বিচিত্র কী? ময়দানে পরাজিত হয়ে যে জাতি আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে জাতির চারিত্রিক অবস্থা তো এমন হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ধোঁকা দিয়েই বেড়াবে।' কিন্তু ইমরান প্রসঙ্গটা এড়িয়ে। সে এ কথাটা সুলতান আইউবীকে বলার জন্য মুখস্ত করে রেখেছে যে, যদি ইসলামের সারিতে গাদ্দার না থাকত, তাহলে খৃস্টানদেরকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তাদের থেকে ইউরোপকেও ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হত। গাদ্দারীই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ঘাতক। আক্রার পাদ্রী ও খৃস্টান সম্রাটগণ মুসলমানদের এই দুর্বলতায় অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে অবস্থান করে ইমরান জানতে পারে, খৃস্টানরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান আরো জোরদার করেছে। সে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সেই শাসকদের নামও সংগ্রহ করে নেয়, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং খৃস্টানরা তাদেরকে ইউরোপের মদ, নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

ইমরান ও রেজা দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্তব্য থেকে সরে যাচ্ছে রহীম হাঙ্গুরা। এখন তার চেষ্টা, দোকান ছেড়ে কিভাবে ব্যবসায়ীর ঘরে কাজ নেয়া যায়। আইলসনের ভালবাসা তাকে অন্ধ করে চলেছে।

দিনকয়েক পর আইলসন রহীমকে জানায়, তার তিনগুণ বয়সী এক সেনা অফিসারের সঙ্গে তার বিবাহ হচ্ছে। বয়সের এত ব্যবধান না হলেও আইলসন রহীম ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি নয়। মাকে সে জানিয়েও দিয়েছে যে, অফিসারকে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার পিতা তা মানতে রাজি নয়। এই সেনাঅফিসারকে দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে সে। তার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য। একদিন আইলসন তার গলার ক্রুশটা খুলে রহীমের হাতে দিয়ে তার উপর নিজের হাত রেখে ক্রুশের শপথ করে বলল, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না। রহীমও শপথ করে, আমিও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

❁ ❁ ❁

একদিন চার-পাঁচজন সেনা অফিসার পাদ্রীর নিকট আগমন করেন। পাদ্রী তাদেরকে তার খাস কামরায় নিয়ে বসান। ইমরান তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝে ফেলে, বিশেষ কোন কথা আছে নিশ্চয়ই। সে পাদ্রীর কক্ষে ঢুকে পড়ে। তাকে দেখামাত্র যে অফিসার কথা বলছিল, তিনি কথা বন্ধ করে দেন। পাদ্রী ইমরানকে বললেন, 'জনগন্থর! তুমি এ সময় কক্ষে ঢুকবে না; আমরা একটা জরুরী আলাপ করছি।'

ইমরান বের হয়ে পাশের কক্ষে চলে যায় এবং দেয়ালের সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসার কথা বলছেন ক্ষীণ কণ্ঠে। তবু কাজের কথাগুলো ইমরান বুঝে ফেলে। মিটিং শেষ হওয়ার পর অফিসাররা যখন বের হতে শুরু করেন, তখন ইমরান সরে অন্যত্র চলে যায়। পাদ্রী বা অন্য কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

গুরুত্বপূর্ণ আরো তথ্য পেয়ে গেছে ইমরান। সে সিদ্ধান্ত নেয়, এক্ষুণি সে পালিয়ে যাবে। অবিরাম পথ চলে কায়রো পৌঁছে সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেবে যে, আপনি আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহন করুন। কিন্তু পাদ্রী তাকে ডেকে নিয়ে এমন একটি কাজে জুড়িয়ে দেন যে, তৎক্ষণাৎ পালানো আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। তাছাড়া যাওয়ার আগে তাকে রহীম ও রেজার নিকট থেকেও তথ্য নিতে হবে। এমনও হতে পারে, আজ সে যে তথ্য লাভ করল, তারাও তা পেয়ে থাকবে। এভাবে সকলের দ্বারা সত্যায়িত হলে তিনজন একত্রেই আক্রা থেকে বেরিয়ে যাবে। এর জন্য তাকে চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাচ্ছে না ইমরানের ব্যাকুল মন।

পরদিন রেজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় ইমরান। রেজাকে সে তার আস্তাবলেই পেয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করে, নতুন কোন তথ্য পেয়েছ কি? রেজা জানায়, আমি অস্বাভাবিক একটা তৎপরতা লক্ষ্য করছি। উড়ো উড়ো শুনেছি, খৃস্টানরা জবাবী আক্রমণ স্থলপথে করবে না। মনে হচ্ছে, তারা সমুদ্রপথে হামলা চালাবে। এখন আমাদেরকে তাদের আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে হবে।

ইমরান রেজাকে জানায়, খৃস্টানরা এই আক্রমণকে চূড়ান্ত অভিযানের রূপ দিতে চায়। নিজে যা কিছু শুনেছে, তা রেজাকে শুনিয়ে দেয় এবং বিস্তারিত জানার জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়। বিস্তারিত তো জানাই আছে ইমরানের। কিন্তু রেজাকে বিষয়টা সত্যায়ন করাতে চাইছে সে। ইমরান রেজাকে জানায়, আমি দু'একদিনের মধ্যে এখান থেকে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কর্তব্য আমার পালন হয়ে গেছে। বাহনের জন্য তিনটি ঘোড়া বা উটের প্রয়োজন। কোথাও হতে চুরি করে সংগ্রহ করতে হবে এগুলো।

রহীমের নিকটও যাওয়া আবশ্যক ইমরানের। চলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানিয়ে দেয়া দরকার তাকেও। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে। তাছাড়া তার কাছে যেতেও চাচ্ছে না ইমরান। কারণ, ব্যবসায়ী রহীমকে থাকার জন্য যে জায়গা দিয়েছে, সেখানে যাওয়া ইমরানের জন্য ঠিক নয়। ইমরান গির্জায় চলে যায়।

রহীমের উদ্দেশ্যে গেলেও তাকে পেত না ইমরান। নিজ ঠিকানায় ছিলও না সে। ছিল না আক্রার কোথাও। ইমরান যখন তার কর্তব্য নিয়ে অস্থির, সে সময় আইলসন রহীমকে ব্যস্ত করে রেখেছে অন্য ব্যাকুলতায়।

সে রাতে খৃস্টানদের নাচ-গান ও ভোজসভার আয়োজন ছিল। যে বয়সী অফিসার আইলসনকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, সে মেয়েটিকে তার সঙ্গে নৃত্য করার আহ্বান জানায়। কিন্তু আইলসন তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে অন্য যুবক অফিসারদের সঙ্গে নৃত্য করে। অফিসার আইলসনের পিতার কাছে নালিশ করে। পিতাও সেই আসরে উপস্থিত ছিল। পিতা মেয়েকে শাসিয়ে দেয় যে, তুমি তোমার পাণিপ্রার্থীকে অপমান কর না, যাও তার সঙ্গে গিয়ে নাচ। আইলসন রাগ করে আসর ত্যাগ করে চলে যায় এবং পিতাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসে যে, আমি এই বুড়োটাকে বিয়ে করব না।

ক্ষুণ্নমনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আইলসনের পিতা ও বুড়ো অফিসার আইলসনের পেছন পেছন ছুটে। মেয়েটি এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। দু'জন ঘরে গিয়ে দেখতে পায়, মেয়ে ঘরে নেই। তালাশ করে মেয়েকে রহীমের কক্ষে পায়। সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে কি করছ? মেয়ে

বিরক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমি যথায় ইচ্ছে যাব; আপনি তাতে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন! আইলসনের কথায় তার পাণিপ্রার্থী বুড়ো অফিসারের মনে সন্দেহ জাগে। ব্যবসায়ী তার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যায়। অফিসার রহীমকে জিজ্ঞেস করে, 'ঐ মেয়েটি এখানে কেন এসেছিল?' রহীম উত্তর দেয়, 'এসেছে তো আপনার কী?' ও এখানে অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে!' অফিসার রহীমকে ধমকি দিয়ে বলে, 'তুই এখান থেকে চলে যাবি; অন্যথায় আমি তোকে জ্যান্ত রাখব না। রহীমের দেহেও যৌবনের রক্ত প্রবাহমান। সেও মুখের উপর জবাব দেয়। কথা কাটাকাটি হয় দু'জনের মধ্যে। আইলসনের পিতা এসে দু'জনকে শান্ত করে। শেষে অফিসার ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ করে আদেশের সুরে বলে, 'আমি এই লোকটাকে এখানে আর এক দণ্ডও দেখতে চাই না।'

পরদিন রহীমকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ী বলল, 'তোমার আর এখানে চাকুরী করা হবে না। তুমি নিজের পথ দেখ। সেনাবাহিনীর এতবড় একজন অফিসারকে অসন্তুষ্ট করে আমি আমার ব্যবসা লাটে উঠাতে চাই না। আর দেরী না করে তুমি এখান থেকে চলে যাও। অফিসার ইচ্ছে করলে তোমাকে বিনা দোষেও কয়েদখানায় পাঠাতে পারতেন।'

কী উদ্দেশ্যে এই খৃস্টান এলাকায় আসা, ভুলে গেছে রহীম। খৃস্টান মেয়ে আইলসনই এখন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, চাওয়া-পাওয়া তার। যতসব মান-মর্যাদা আইলসনকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। অফিসার তাকে ধমকি দিল, এই অপমানের বাস্তব জবাব দিতে চাইছে সে। প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর রহীম।

ব্যবসায়ী প্রতিদিনের মতো দোকানে চলে যায়। রহীম যায় তার মালিকের ঘরে। দেখা করে আইলসনের সঙ্গে। তারা উভয়ে শলাপরামর্শ করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পালানোর সময় ঠিক করা হয় সন্ধ্যায়।

রাতে যখন ইমরান রেজার নিকট বসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার করছিল, তখন রহীম আইলসনের অপেক্ষায় শহরের বাইরে এক নির্জন এলাকায় অপেক্ষমান। আইলসন রহীমকে বলে দিয়েছিল, সে তার বাবার ঘোড়া নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে, পরে একসাথে দু'জনে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে। অধীর অপেক্ষমান রহীম চিন্তা করছিল, আইলসন তার বাবার অগোচরে কি করে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

আইলসন ঘোড়া চুরি করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আইলসনকে দেখে রহীম বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, সে এত সহজেই এসে পড়বে।

ক্ষীপ্রগতিতে ছুটে এসে নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়াসহ আইলসন। রহীম ঘোড়ার পিঠে আইলসনের পেছনে এক লাফে চড়ে বসে। ঘোড়া চলতে শুরু করে। বেশ কিছুদূর চলার পর ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে দেয় আইলসন। পরে আবার বাড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আক্রা অতিক্রম করে বেশ দূরে চলে যায়।

❁ ❁ ❁

মধ্যরাত নাগাদ রহীম ও আইলসন এমন এক স্থানে এসে ঘোড়া থামায়, যেখানে পানি আছে। উদ্দেশ্য ঘোড়াকে পানি পান করাবেন এবং নিজেরাও কিছুটা বিশ্রাম করবে। রহীমের জানা আছে, সামনে বহুদূর পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে, এখন আর তাদের নাগাল কেউ পাবে না। রহীম আইলসনকে বলল, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও; শেষ রাতের আঁধারীতে আবার আমরা রওনা হয়ে যাব।'

'তুমি কি বাইতুল মুকাদ্দাসের পথ চেন?' জিজ্ঞেস করে আইলসন।

আক্রা থেকে পালিয়ে আসার আগে তারা স্থির করেনি তারা কোথায় গিয়ে উঠবে। বাইতুল মোকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করায় রহীম বলল, 'বাইতুল মোকাদ্দাস কেন? আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব, যেখানে তোমাকে ধাওয়া করার কেউ সাহস পাবে না।'

'কোথায় সেই জায়গা?' আইলসন জিজ্ঞেস করে।

'মিসর।' রহীম উত্তর দেয়।

'মিসর?'– একরাশ বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে আইলসন– 'ও তো মুসলমানের দেশ। ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত রাখবে না।'

'মুসলমানদেরকে তুমি চিন না আইলসন!'– রহীম বলল– 'মুসলমান বড় হৃদয়বান; তুমি গিয়েই দেখতে পাবে।'

'না'– ভয়ার্ত কণ্ঠে আইলসন বলল– 'মুসলমান নাম শুনলে আমার ভয় লাগে। শিশুকাল থেকেই আমি জানি, মুসলমান এক ঘৃণ্য ও হিংস্র জাতি। আমাদের এলাকায় মায়েরা শিশুদেরকে মুসলমানের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। আমি মুসলমানকে ঘৃণা করি।'

মিসর ও মুসলমান নাম শুনে আইলসন সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। সে রহীমের আরো কাছে এসে বসে। বলে, 'তুমি আমাকে বাইতুল মোকাদ্দাস নিয়ে চল। ওখানে গিয়ে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। কোন্দিকে বাইতুল মোকাদ্দাস? আমি দিকটা ভুলে গেছি।'

'আমি মিসরের দিকে যাচ্ছি।' রহীম বলল।

আইলসন বিগড়ে যায় এবং কাঁদতে শুরু করে।

'তুমি কি মুসলমানদেরকে ঘৃণা কর?' জিজ্ঞেস করে রহীম।

'অনেক।' জবাব দেয় আইলসন।

'আর আমাকে কি ভালবাস?'

'অনেক।' উত্তর দেয় আইলসন।

'যদি বলি, আমি মুসলমান, তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমি হাসব'– আইলসন জবাব দেয়– 'তোমার রসিকতা আমার কাছে বেশ ভাল লাগছে।'

'আমি রসিকতা করছি না আইলসন।'– গম্ভীর কণ্ঠে রহীম বলল– 'আমি সত্যি সত্যিই বলছি, আমি মুসলমান। তোমার ভালবাসাই আমাকে এত ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য করেছে! আমি সন্তুষ্টচিত্তেই তোমার জন্য এই কুরবানী বরণ করে নিয়েছি।'

'কিরূপ কুরবানী?' আইলসন জিজ্ঞেস করে– 'তুমি তো পূর্ব থেকেই আশ্রয়হীন; এখন না আমরা ঘর বাঁধব, সংসার করব!'

'না, আইলসন!'– রহীম বলল– 'আমি এখন আশ্রয়হীন হয়েছি। তুমি নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ। আমাকে বিবাহ করে নতুন করে সংসার করবে। কিন্তু আমার আর কোন ঠিকানা হবে না। আমি কর্তব্য থেকে পালিয়ে আসা মানুষ, আমি আমার বাহিনীর দলত্যাগী সৈনিক। আমি গোয়েন্দা। আক্রায় গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রেমের বেদীতে বলি দিয়েছি আমার সব দায়িত্ব-কর্তব্য।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ'– মুখে হাসি টেনে আইলসন বলল– 'চল, শুয়ে পড়ি; রাত পোহাবার আগেই আমি তোমাকে জাগিয়ে তুলব।'

'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না আইলসন।' বলল রহীম– 'আমার নাম রহীম হাঙ্গুরা। আইলসন! আমি তোমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রাখতে চাই না। তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি তোমাকে যেখানেই রাখব, শান্তিতে রাখব। আমি তোমাকে তোমার পিতার ঘরের রাজত্ব দিতে পারব না ঠিক, তবে তোমাকে আমি কষ্ট পেতে দেব না। তোমার জীবন শান্তিতেই কাটবে।'

'আমাকে কি মুসলমান হতে হবে?' জিজ্ঞেস করে আইলসন।

'তাতে অসুবিধা কি?' রহীম জবাব দেয়– 'তুমি ওসব ভেব না। শুয়ে পড়। আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ। সামনে কথা বলার প্রচুর সময় পাব।'

রহীম শুয়ে পড়ে। শুয়ে পড়ে আইলসনও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আইলসন রহীমের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়। আইলসনের চোখে ঘুম আসছে না। গভীর চিন্তায় হারিয়ে যায় সে।

রহীমের যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন ভোর হয়ে গেছে। সজাগ হওয়া মাত্র ধড়মড় করে উঠে বসে। এতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুমানো ঠিক হয়নি, কথাও এমন ছিল না। চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকায় রহীম। কিন্তু একি! ঘোড়াও নেই, আইলসনও নেই।

রহীম বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। আশপাশে ঘুরে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে দূরপথে দৃষ্টিপাত করে। বিরান মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না। আইলসনের নাম ধরে সজোরে ডাক দেয় রহীম। কোন জবাব নেই। একঝাঁক চিন্তা এসে চেপে ধরে রহীমকে। ভাবনার সাগরে তলিয়ে যায় সে।

রহীমের মনে সন্দেহ জাগে, হয়ত কেউ পশ্চাতে তাদের ধাওয়া করেছিল। এসে আইনসনকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তাহলে রহীমকে জীবিত রেখে যাওয়ার কথা নয়। কেউ আসলে তো তাকে হত্যা করে ফেলত কিংবা অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত। আইলসনকে তারা এত সঙ্গোপনে তুলে নিয়ে যাবে, অথচ সে টের পাবে না– এটা তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে! আবার এও হতে পারে যে, আইলসন নিজেই পালিয়ে গেছে। মুসলমান পরিচয় দেয়ার কারণে মেয়েটি হয়ত তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

আইলসনকে কেউ তুলে নিয়ে যাক কিংবা সে নিজেই চলে যাক, একটি প্রশ্ন রহীমকে অস্থির করে তুলেছে যে, এখন সে যাবে কোথায়? আক্রা ফিরে যাওয়া তো আশংকামুক্ত নয়। কায়রো গেলেও ভয়। কারণ, রহীম তার কর্তব্য থেকে পালিয়ে এসেছে। কমান্ডার ইমরানকে তো আর বলে আসেনি যে, সে চলে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে একটি অজুহাত ঠিক করে নেই রহীম। সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সে কায়রোর পরিবর্তে কার্কে চলে যাবে। গিয়ে বলবে, ওখানকার খৃস্টানরা টের পেয়ে গেছে যে, আমি মুসলমান এবং গুপ্তচর। তাই অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। ইমরান বা রেজাকে সংবাদ বলে আসার সুযোগও পাইনি। বেশ চমৎকার বাহানা। রহীম নিশ্চিত, এই কাহিনী বিবৃত করলে কেউ বলবে না যে, প্রমাণ দাও, সাক্ষী আন।

রহীম কয়েক ঢোক পানি পান করে কার্ক অভিমুখে রওনা হয়। আইলসনের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে অস্থির করে ফিরছে। যার জন্য সব ত্যাগ করা– দায়িত্ব, ঈমান, সহকর্মী সমস্ত– তাকে হারানোর বেদনা কম নয়। মেয়েটির কি হল, কোথায় গেল, জীবনে হয়ত আর তা জানাই হবে না– এই অনুতাপে পুড়ে মরছে রহীম।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করেছে রহীম। হঠাৎ কয়েকটি ধাবমান ঘোড়ার

ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসে তার। পেছনের দিকে তাকায়। উড়ন্ত ধূলি-বালির একখণ্ড মেঘ ধেয়ে আসছে তার দিকে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজে রহীম। কিন্তু নেই। ঘোড়ায় চড়ে কে আসছে, জানে না সে। রহীম ঘোড়ার পথ ছেড়ে পার্শ্বপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। মনে তার প্রচণ্ড ভয়।

নিকটে চলে এসেছে ঘোড়াটি। দাঁড়িয়ে যায় ঠিক রহিমের পার্শ্ব ঘেঁষে। এবার রহীম থেমে যায়, ঘোড়ার আরোহীরা খৃস্টান। রহীম নিরস্ত্র। পালাবারও পথ নেই। আরোহীরা রহীমকে ঘিরে ফেলে। রহীম তাদের একজনকে চিনে ফেলে। লোকটা আইলসনের পাণিপ্রার্থী অফিসার। সে রহীমকে উদ্দেশ করে বলে, 'আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, তুমি খৃস্টান নও।'

রহীমকে গ্রেফতার করা হল। হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বেঁধে লাশের ন্যায় তুলে নেয়া হল একটি ঘোড়ার পিঠে। আক্রা অভিমুখে ছুটে চলে ঘোড়া।

ঠিক এ সময় রহীমের সঙ্গে দেখা করতে যায় ইমরান। না পেয়ে রহীমের মালিকের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে। কর্মচারী জানায়, তাকে চাকুরী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ইমরান ভাবনায় পড়ে যায়। কী হল? রহীম গেলই বা কোথায়? এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার কাছে গেল না কেন? রেজার নিকটও তো যেতে পারত। কোন প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পায় না সে।

ইমরান গির্জায় ফিরে যায়। রহীমকে খুঁজে বের করতে হবে। তার মনে এই শংকাও জাগে, রহীম গ্রেফতার হল কিনা। তবে তো আমাদের ব্যাপারেও তথ্য দিয়ে ফেলবে। এতক্ষণ বলে ফেলেছেও হয়ত। ধরা পড়া কিংবা মারা যাওয়া চিন্তার বিষয় নয়– চিন্তা হল তারা যে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল এবং সংগ্রহ করেছে, তা নিয়ে এখান থেকে বের হতে হবে।

সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ দেরী। রেজা আস্তাবলের বাইরে একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। চারটি ঘোড়া আস্তাবলের গেটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এক আরোহী তার আসনের সম্মুখ থেকে লাশের ন্যায় কি একটা নীচে নামায়। দেখে রেজার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়। এ তো রহীম! হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বাঁধা। আরোহীদের মধ্যে বড় এক অফিসারও রয়েছে। রেজা ভালভাবেই চিনে তাকে। অন্যরাও তার অচেনা নয়।

আরোহীরা রহীমকে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় রেজার প্রতি দৃষ্টি পড়ে অফিসারের। অফিসার রেজাকে ডাক দেয়, ফ্রান্সিস! রেজা ছুটে আসে। কিন্তু তার পা উঠছে না যেন। সে নিশ্চিত বুঝে ফেলে, আমিও ধরা পড়ে যাচ্ছি। ভীতপদে অফিসারের কাছে দাঁড়ায় রেজা– 'জ্বী স্যার।'

'এই ঘোড়াগুলোকে ভেতরে নিয়ে যাও'– অফিসার শান্ত কণ্ঠে রেজাকে

বলল– 'নিয়ে আমাদের সহিসদের হাতে বুঝিয়ে দাও।' অফিসার রহীম সম্পর্কে নির্দেশ দেয়, 'ওকে ঐ কামরায় নিয়ে যাও।'

'ফ্রান্সিস' নামে ডাকায় রেজার হালে পানি আসে যে, তাহলে রহীম আমার কথা বলেনি। রেজা এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করে, 'ও কে? চুরি-টুরি করেছে বোধ হয়?'

'বেটা সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর'– এক সৈনিক জবাব দেয় এবং তাচ্ছিল্যভরে বলে– 'এবার লোকটা পাতালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গোয়েন্দাগিরি করবে; তুমি যাও, ঘোড়াগুলো রেখে আস।'

এ সময়ের মধ্যে কোন এক সুযোগে রেজা ও রহীমের চোখাচোখি হয়ে যায়। রহীম রেজাকে চোখের সাংকেতিক ভাষায় বলে দেয়, তোমার কোন ভয় নেই। রেজা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তথাপি একজনের ধরা পড়া তো কোন প্রীতিকর ঘটনা নয়। রহীম ধরা পড়েছে। পরিণতি কী হবে, তা তো বলা যায় না। অন্য সঙ্গীদের ব্যাপারে রহীম এখনো কোন তথ্য দেয়নি, দেয়ার পর্যায় এখনো আসেওনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর দেখা যাবে কি হয়! তাছাড়া রহীমকে জীবন দিতেই হবে। মরতে হবে খৃস্টানদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুকে ধুকে।

রহীমকে কোন্ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা জানে রেজা। তারপর সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তাও তার জানা।

❁ ❁ ❁

ইমরান গির্জা সংলগ্ন নিজ কক্ষে অস্থির মনে বসে বসে ভাবছে, রহীম কোথায় উধাও হয়ে গেল। কক্ষের দরজা খোলা। হঠাৎ শাঁ করে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় এক ব্যক্তি। লোকটা রেজা। কোন ভূমিকা ছাড়াই ভয়জড়িত কণ্ঠে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিসফিস করে বলে, 'রহীম ধরা পড়ে গেছে!'

নিজে যা দেখেছে, ইমরানকে অবহিত করে রেজা। এ-ও জানায়, রেজা ইংগিতে বলে দিয়েছে, আমাদের কথা সে কিছু বলেনি।

'এখনো বলেনি। ইন্টারোগেশন সেলে গিয়ে সব-ই বলে দিবে'– ইমরান বলল– 'ও জায়গায় মুখ বন্ধ রাখা সহজ নয়।'

ইমরান ও রেজা এখন কী করবে? এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, নাকি আরো এক-দু'দিন অপেক্ষা করবে?'

এমনি স্পর্শকাতর মুহূর্তে একটি ভুল করে ফেলে তারা। তারা আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে যায়। কমান্ডো এবং গেয়েন্দাদের জন্য নির্দেশ হল, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সাহসিকতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। তাড়াহুড়া ও আবেগ পরিহার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সহকর্মী

যদি কোথাও এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, তাকে উদ্ধার করতে গেলে নিজেদেরকেও ফেঁসে যাওয়ার আশংকা আছে, তাহলে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রহীমের ঘটনায় আবেগপ্রবণ হয়ে যায় রেজা। বলল, 'আমি রহীমের ন্যায় সুদর্শন ও সাহসী বন্ধুকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করব।'

'সম্ভব হবে না।' ইমরান বলল। সে রেজাকে এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যয় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

'শোন ইমরান! রহীমকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমি সেখানেই থাকি। কাজেই ওকে সেখান থেকে বের করে আনা সম্ভব কিনা দেখতে তো পারি'– রেজা বলল– 'সেখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে আমার এতটুকু বন্ধুত্ব আছে যে, আমি তথ্য নিতে পারব, রহীম কোথায় আছে। যদি আমি তার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি, তাহলে নিশ্চিত রহীম মুক্তি পেয়ে যাবে। অন্যথায় এর বেশী আর কী হবে, আমিও না হয় তার পথের পথিক হয়ে গেলাম! এমতাবস্থায় আমি যদি ধরা খেয়ে যাই, তাহলে তুমি চলে যেও। তথ্য তো সব তোমার কাছে। আমি রহীমকে রেখে যেতে পারব না।'

রহীমকে মুক্ত করে আনা যদিও রেজার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু রেজার আবেগপ্রবণতায় ইমরানও সম্মত হয় এবং বাস্তবতাকে ভুলে যায়। রেজা ইমরানকে এই বলে ফিরে যায়, সে রাতে খোঁজ নিয়ে জানবে রহীমকে মুক্ত করার কোন সুযোগ আছে কিনা। যদি কোন সুযোগ বের করতে না পারে, তাহলে তারা রাতের মধ্যে চলে যাবে। ইমরানের দায়িত্ব ঘোড়ার ব্যবস্থা করা।

ঘোড়ার ব্যবস্থা করা ইমরানের জন্য সহজ ছিল না। কারণ, তাকে পাদ্রীর দেহরক্ষীদের ঘোড়া চুরি করতে হবে। আর এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

রহীমকে তখনো বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হয়নি। ইন্টেলিজেন্স হিংস্র প্রকৃতির দু'জন অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তাকে। কারণ, গোয়েন্দা ধরা পড়লে প্রথমে তার থেকে তথ্য আদায় করা হয়। তারপর চলে অকথ্য নির্যাতন। যেহেতু গোয়েন্দারা একাধিক লোক থাকে, তাই অন্য সহযোগীদের খুঁজে বের করার জন্য স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যে, তার অন্য সাথীরা কোথায়? এখানে এসে সে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছে ইত্যাদি।

রহীমকেও উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করা হয়। রহীম জবাব দেয়, এখানে আমি একা। আমার কাছে কোন তথ্য নেই। ব্যবসায়ীর কন্যা আইলসনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমরা পরস্পর ভালবাসতাম। একজন বৃদ্ধ অফিসারের সাথে আইলসনকে জোর করে বিবাহ দিতে চাওয়ায় আমরা দু'জনে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

‘ জান, তুমি কিভাবে ধরা পড়েছ?’

‘না’– রহীম জবাব দেয়– ‘আমি এতটুকুই জানি যে, আমি ধরা পড়েছি।’

‘তুমি আরো অনেক কিছু জান’– এক অফিসার বলল– ‘যা যা জান, সব বলে দাও, আমরা তোমাকে কোন কষ্ট দেব না।’

‘আমি শুধু এতটুকুই জানি যে, আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেছি’– রহীম বলল– ‘এই অপরাধের শাস্তি আমি সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করে নেব।’

‘তোমার হৃদয়ে এখনো কি আইলসনের ভালবাসা আছে?’

‘আছে’– রহীমের সোজা উত্তর– ‘এবং চিরকাল থাকবে। আমি তাকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমান বানিয়ে তাকে বিয়ে করার কথা ছিল।’

‘আমি যদি বলি, মেয়েটা তোমার সাথে প্রতারণা করেছে, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?’

‘না’– রহীম বলল– ‘যে মেয়ে আমার জন্য নিজের বাড়ি-ঘর, পিতা-মাতা, স্বজন ত্যাগ করেছিল, সে প্রতারক হতে পারে না। অন্য কেউ তার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকবে হয়ত।’

‘আচ্ছা, আমরা যদি আইলসনকে তোমার হাতে তুলে দেই, তাহলে কি বলবে, তোমার ক’জন সঙ্গী আছে এবং তারা কোথায় আছে? তুমি এখান থেকে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছ?’

রহীমের মস্তক অবনত হয়ে যায়। সে অবস্থায় কেটে যায় কিছু সময়। এক অফিসার যখন তার মাথাটা ধরে উপরে তোলে, তখন তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অফিসারদের বারবার প্রশ্ন করার পরও রহীম নির্বাক। অফিসার ভাবল, ছেলেটির ভেতরটায় ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’-এর দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না। তবে তার ভাব-গতিতে বুঝা যাচ্ছে, আইলসনের প্রতি তার ভালবাসা এখনো প্রগাঢ় এবং এ প্রেম তার হৃদয়ের অনেক গভীরে প্রোথিত।

‘দেখ, সময় নষ্ট করে লাভ নেই, সব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে’– এক অফিসার বলল– ‘কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে যাবে। তখন তুমি না বেঁচে থাকবে, না মরতে পারবে। উত্তরটা যদি আগেভাগেই দিয়ে দাও, তাহলে আইলসনকেও পাবে আর শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে। এটা বন্দীশালা নয়– এক অফিসারের কক্ষ। তুমি যদি চিন্তা করার সময় চাও, তাহলে হয়ত এই রাতটুকু তোমাকে সময় দেয়া যেতে পারে।’

রহীম কোন কথাই বলছে না। মুখ তুলে শুধু প্রত্যেক অফিসারের দিকে এক নজর করে তাকায়। অফিসারদের এমন কোন আশংকা নেই যে, রহীম এই কক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। সামরিক এলাকা, বারান্দায় পাহারা আছে, আছে টহল প্রহরাও। কক্ষ থেকে বের হতে পারলেও পালিয়ে যাবার

সুযোগ নেই। এক অফিসার আরেক অফিসরকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছ, ওকে পাতাল কক্ষে নিয়ে চল। লোহার উত্তপ্ত শলাকার ছ্যাঁকা দাও, দেখবে কথা কিভাবে বের হয়। এরপরও যদি মুখ না খুলে, তাহলে পানাহার বন্ধ করে ফেলে রাখ।'

'আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন!'– দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'এ কথা ভুলে যেও না, লোকটা মুসলমান। এ যাবত তোমরা ক'জন শত্রু গোয়েন্দার নিকট থেকে তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছ? তোমরা হয়ত জান না– এরা জীবন দিতে রাজী, মুখ খুলতে রাজী নায়। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা, লোকটা বলেছিল, সে সমস্ত নির্যাতন-নিপীড়ন তার পাপের শাস্তি মনে করে বরণ করে নেবে? লোকটাকে কট্টর মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। দেখবে, পাতাল কক্ষে নিলেও সে বলবে, 'আমি কিচ্ছু জানি না।' আমাদের উদ্দেশ্য তো ওকে প্রাণে মেরে ফেলা নয়; আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যে কোন প্রকারেই তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার অন্য সঙ্গীদের ঠিকানা নেয়া। আর এ কথা জানা যে, আমরা মিসর আক্রমণের যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তা ওরা জেনে ফেলেছে কিনা।'

'এ তথ্য জানা ওর বাপেরও সাধ্য নেই'– দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'আমাদের হাইকমান্ডের অফিসারদের ব্যতীত আর কেউ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে না। তাছাড়া লোকটি ব্যবসায়ীর মেয়ের প্রেমেই ডুবে ছিল। দুনিয়ার কোন খবরই ওর ছিল না। ও তো এটাও জানে না যে, আইলসনই ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকটা এখনও আইলসনে প্রেম সরোবরে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'আমি আইলসনকেই ব্যবহার করতে চাই'– এক অফিসার বলল– 'লোকটাকে আজ রাতটা এই কক্ষেই থাকতে দেব। আমি আশা করি, দিনের পর দিন পরিশ্রম করেও আমরা যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারব না, আইলসনের ন্যায় রূপসী মেয়ে তার থেকে কয়েক মিনিটেই তা বের করে ফেলতে পারবে।'

'কিন্তু মেয়েটার উপর কি ভরসা রাখা যায়?'

'তোমাদের কি এখনো সন্দেহ আছে?' দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'তুমি বোধ হয় পুরো ঘটনা শোননি। আইলসন ফিরে এসে ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ তুমি শোননি। এখন জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব যেহেতু আমাদের দু'জনের উপর, সেজন্য পুরো ঘটনা তোমার জানা থাকা দরকার। আইলসন লোকটাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। কিন্তু আসল পরিচয়টা তার জানা ছিল না। আইলসন জানত, লোকটা খৃস্টান, নাম আইলীমোর। আইলসনকে তার পিতা কামান্ডার ওয়েস্ট মেকার্টের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। মূলত ঘুষ হিসাবেই মেয়েটাকে তার হাতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক পর্যায়ে মেয়েটা এই

গোয়েন্দার হাত ধরে পালিয়ে যায়। পথে কথায় কথায় সে আইলসনের কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সে অকপটে বলে দেয়, আমি খৃস্টান নই– মুসলমান। নাম আইনীমোর নয় রহীম হাঙ্গুরা এবং সে গোয়েন্দা। আইলসনের হৃদয়ে মুসলমান নামের প্রতি কি পরিমাণ ভীতি ও ঘৃণা শৈশব থেকেই বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা লোকটি জানত না। জানত না মেয়েটা কত ধার্মিক খৃস্টান। শেষ পর্যন্ত আইলসন নিশ্চিত হয় যে, এই মুসলমানটা তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কায়রো নিয়ে গিয়ে তাকে নষ্ট করবে। হয়ত কারো কাছে তাকে বিক্রি করে ফেলবে। আমরা আমাদের শিশুদের মন-মস্তিষ্কে মুসলমান সম্পর্কে যে ঘৃণা সৃষ্টি করে রেখেছি, তা যে কোন খৃস্টান ছেলে-মেয়ে-ই মনে রাখবে।

আইলসনের হৃদয়েও ধর্মপ্রীতি জেগে ওঠে এবং এই অনুরাগ মুসলমানের ভালবাসার উপর জয়ী হয়। রহীমের প্রতি ভালবাসার স্থলে সৃষ্টি হয় প্রবল ঘৃণা। আইলসন পেছনের সব ভুলে যায়। ভুলে যায় বৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথাও। তার ক্রুশের কর্তব্যের কথা স্মরণ এসে যায় যে, মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শত্রুজ্ঞান করবে এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কাজ করবে। বস্তুত আইলসন অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী। সে রহীমকে বুঝতেই দেয়নি, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে সে পালিয়ে আসবে। রহীম ঘুমিয়ে পড়লে আইলসন সুযোগ বুঝে ঘোড়া নিয়ে চলে আসে। আইলসনের পথঘাট জানা ছিল। সে আক্রা এসে পৌঁছে এবং পিতার কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে রহীম সম্পর্কে অবহিত করে। তার পিতা তৎক্ষনাৎ এ খবর কমান্ডার ওয়েস্ট মেকাটকে ঘুম থেকে জাগিয়ে অবহিত করে। কমান্ডার তিনজন সিপাহী নিয়ে রহীমকে ধাওয়া করতে চলে যায়। রহীম পায়ে হেঁটে কতটুকুই আর যেতে পেরেছে– সে ধরা পড়ে যায়। ফলে এখন সে আমাদের হাতে বন্দী।'

'রহীম কি জানে, আইলসন তাকে ধোঁকা দিয়েছে?'

'না, আমি এখন আইলসনকে কাজে লাগাতে চাই। রহীমকে আমরা উন্নত খাবার পরিবেশন করব।'

চাকর-বাকর ও আম-জনতার মুখে একই কথা, একই আলোচনা– একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। ফ্রান্সিস নামে রেজাও তাদের একজন। সেও অন্যদের ন্যায় ধৃত মুসলমান গোয়েন্দাকে নিয়ে নানারকম মন্তব্য এবং অভিমত ব্যক্ত করছে– লোকটিকে জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলান উচিত কিংবা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকিয়ে মেরে ফেলা দরকার।

রেজা জানে, রহীম এখনও সেই কক্ষেই আছে। অনেকেই ভেবে পায় পায় না, গোয়েন্দাকে এখনো বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন! বন্দীশালার এক কর্মচারী জানায়, কয়েদীর জন্য অফিসারদের ন্যায় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অফিসার নিজেই খাবার পরিবেশন করছে। এ কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করে দেয়। রেজা কথায় কথায় বাবুর্চিখানার কর্মচারীকে আলগ নিয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি ঠাট্টা করছ যে, মুসলমান গোয়েন্দাকে অফিসারদের মানের খাবার দেয়া হয়েছে! তাই যদি হয়, তাহলে তো লোকটা গোয়েন্দা নয়!'

'অত্যন্ত ভয়ংকর গোয়েন্দা'- কর্মচারী বলল- 'আমি তদন্তকারী অফিসারের কথা শুনেছি। খানা খাওয়ার পর আবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি একটি মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। মেয়েটি গোয়েন্দাকে ফাঁদে ফেলে কথা বের করবে।'

রহীমের খাওয়া শেষ হলে আইলসন তার কক্ষে প্রবেশ করে। অফিসাররা চলে গিয়েছিল আগেই। তারা আইলসনকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়- তাকে কী করতে হবে এবং কয়েদীকে কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে। আইলসনকে দেখে রহীম চমকে উঠে- বিষয়টা স্বপ্নের মত মনে হয় তার কাছে।

'তুমি?'- বিস্মিত কণ্ঠে আইলসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করে রহীম- 'তোমাকেও কি গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে? তুমি কি বন্দী?'

'হ্যাঁ'- আইলসন জবাব দেয়- 'গতরাত থেকে আমি বন্দী।'

'ওখান থেকে তুমি কিভাবে উধাও হয়েছিলে?'- রহীম জিজ্ঞেস করে- 'তুমি নিজে নিজে পালিয়ে এসেছ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তা বটে'- আইলসন বলল- 'আমার জীবন-মরণ তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তোমাকে ছেড়ে আমি পালাতে পারি না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমার চোখে ঘুম আসছিল না। আমি উঠে পায়চারি করতে শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে চলে যাই। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার মুখ চেপে ধরে এবং আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়। তারা ছিল দু'জন। একজন আমার ঘোড়া ছিনিয়ে নেয় এবং অপরজন আমার মুখ চেপে রাখে, যার ফলে আমার আর্তচিৎকার তুমি শুনতে পাওনি। তারা আমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

'তাদেরকে কে বলল যে, আমার নাম রহীম- আইলীমোর নয়?'- রহীম জিজ্ঞেস করে- 'আর যারা তোমাকে ধরে নিয়ে আসল, তারা আমাকে ধরল না কেন? আমাকে কেন হত্যা করল না?'

'আমি তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না'- আইলসন বলল- 'আমি নিজেই আসামী।'

'তুমি মিথ্যা বলছ আইলসন।'– রহীম বলল– 'তারা ভয় দেখিয়ে তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আর তুমি ভয়ে বলে দিয়েছে আমি কে। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমার কোন কষ্ট হোক আমি তা সহ্য করতে পারব না।'

'আমার কোন কষ্ট না হোক, তা-ই যদি তোমার কাম্য হয়, তাহলে তারা তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করছে, সব বলে দাও'– আইলসন বলল– 'তারা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছে, তোমাকে তারা ছেড়ে দেবে।'

'কথা শেষ কর আইলসন'– তাচ্ছিল্যের সাথে রহীম বলল– 'এ কথাও বল, আমি সব বলে দিলে তারা আমাকে মুক্ত করে দেবে আর তুমি আমাকে বিয়ে করে নেবে।'

'হ্যাঁ, বিয়ে তো হবেই'– আইলসন বলল– 'শর্ত হল, তোমাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

'তুমি কি এই আশা নিয়ে এসেছ যে, মুক্তির খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব?'– রহীম বলল– 'আইলসন! আমি ফৌজের সাধারণ সৈনিক নই– আমি একজন গোয়েন্দা। আমার বিবেক আছে। আমি ক্ষণিকের জন্য বিবেকের উপর তোমার প্রেম-ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। এখন আমি আমার সেই পাপেরই শাস্তি ভোগ করছি। তুমি মিথ্যা বলছ। যে ক্রুশের নামে শপথ করেছ, তা-ই গলায় ঝুলিয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ওখান থেকে তুমি নিজে পালিয়ে এসেছ, কথাটা কি মিথ্যে? তোমার হৃদয় মুসলমানদের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। আমার আসল পরিচয় পেয়ে তুমি আমার প্রতি আর আস্থা রাখতে পারনি। আমাকে নিদ্রায় রেখে তুমি নিজে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে পালিয়ে এসেছ। এসে তুমি তোমার বুড়ো পাণিপ্রার্থীকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ। বল, বল আইলসন আমি কি মিথ্যা বলছি? বল, ঘটনাটি কি এরকম-ই নয়? আমার অন্তরেও তোমার জাতির প্রতি ঘৃণা আছে। তোমার জাতিকে আমি আমার শত্রু ভাবি। আমার জীবনটা আমি তোমার জাতির ধ্বংস-সাধনে কুরবান করেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা অক্ষুণ্ন থাকবে আইলসন। তার প্রতি কখনো আমার ঘৃণা জন্মাবে না। তোমার খাতিরে কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছি। কিন্তু তুমি– তুমি নাগিনীর ন্যায় আমাকে দংশন করছ। আর এটাই তোমার ধর্ম– এটাই তোমাদের চরিত্র।'

অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ও হৃদয়কাড়া ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল রহীম। আইলসনের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এতকিছুর মাঝেও তার হৃদয়ে রহীমের ভালবাসা বিদ্যমান। তার চোখে চোখ রেখে ধীর অথচ হৃদয়গ্রাহী রহীমের কথাগুলো তার মন ছুঁয়ে যায়। আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে রূপসী

তরুণী আইলসন। তার দু'চোখে পানি এসে যায়। তারপর অস্থিরতার সাথে রহীমের হাত দু'টো চেপে ধরে এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই আইলীমোর। তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলে, আমি ভুলিনি। আমি অপরাধী– আমি তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি। এই পাপের কঠিন শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে মদ্যপ ঐ বৃদ্ধ কমান্ডারের হাতে তুলে দেয়া হবে। আমাকে আর তিরস্কার কর না আইলীমোর।'

'আমি আইলীমোর নই– আমি রহীম।' রহীম বলল– 'আমি রহীম– আবদুর রহীম– আমি দয়াময়ের গোলাম।'

❁ ❁ ❁

রাতের বেলা। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ইসলামী দুনিয়া। কিন্তু একদল মানুষ শত্রুর পরিবেশিত মদ আর নারী নিয়ে পড়ে আছে মাতালের ন্যায়। এরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার গাদ্দার। অপরদিকে তাদের থেকে দূরে-বহুদূরে একজন মুসলমান ইহলীলা সাঙ্গ করছে ইসলামের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে। দু'জন জান বাজি রেখে জাতির জন্য মূল্যবান উপহার– গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আক্রা থেকে বেরিয়ে কায়রো পৌঁছার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ এমন এক তথ্য, মিসরের ইজ্জত ও ইসলামের আব্রু নির্ভর করছে তার উপর। তাদের দৃষ্টিতে এই ভেদ আল্লাহর আমানত। তারা এখানে নিজ দায়িত্ব পালন করছে, নাকি আয়েশ করে ফিরছে, তা দেখবার মত কেউ নেই। কিন্তু তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তাদেরকে দেখছেন এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করছে।

রহীম মুক্ত হয়ে আসতে পারবে কি পারবে না, রেজা আসবে কি আসবে না?– এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ইমরান। কী করবে সে? ওদের অপেক্ষা করবে, নাকি এক্ষুণি চলে যাবে? কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যে ইসলামী দুনিয়ার জন্য অতিশয় মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করলাম, তা কি কায়রো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব? মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে ইমরানের।

ইমরান আরো একটি কারণে শীঘ্র কায়রো কিংবা অন্তত কার্ক গিয়ে পৌঁছতে চায়। পাছে সুলতান আইউবী কিংবা নুরুদ্দীন জঙ্গী বা উভয়ে অন্য কোনদিকে আক্রমণ বা অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে না ফেলেন। যদি এমনটা হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাদের ফৌজ যদি অন্য কোন দিকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মিসরের মোহাফেজ তো আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। এসব ভাবনা ইমরানকে এমনভাবে বিচলিত করে তোলে যে, কোন দিশা না পেয়ে সে কক্ষের দরজা বন্ধ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়।

ইমরান নফল নামায পড়ছে। সুপ্ত নগরীর নীরবতা ভেদ করে কোন একটা তৎপরতার শব্দ তার কানে ভেসে আসে। কারো ছুটে চলার আওয়াজও শোনা যায়। তাতে ইমরানের ব্যাকুলতা আরো বেড়ে যায়। দু'চার রাকাত নামায আদায় করে ইমরান মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে ইমরান দোয়া করে, 'হে আল্লাহ! দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আমাকে তুমি এই আমানতটা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার সুযোগ দাও, এরপর তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে আমার বংশসহ নিয়ে নিও।'

ইমরানের কক্ষের বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়ে। ইমরান দরজা খুলে দেয়। বাইরে রেজা দণ্ডায়মান। রেজা ভেতরে ঢুকতেই ইমরান তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

রেজা হাঁপাচ্ছে। ইমরানকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানায়, রহীম শহীদ হয়ে গেছে। সেই সাথে মারা গেছে একটি মেয়েও। রহীমের লাশটা এলাকার এক মুসলিম পরিবারের ঘরে রেখে এসেছে। সেই ঘরেরই কোন স্থানে তাকে দাফন করার কথা।

ইমরানের অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। চিন্তা তার রহীমকে নিয়ে নয়, দ্বীনের জন্য জীবন দেয়া-নেয়াই তো তাদের কাজ। ইমরান ভাবে, রহীমের জন্য এই মুসলিম পরিবারটা আবার বিপদে পড়ে না যায়। রেজা জানায়, সে ঘরে তিনজন পুরুষ আছে, অন্যরা মহিলা। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এক কোণে মাটি খনন শুরু করে দিয়েছে। তারা বেশ সতর্ক। কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

আক্রা থেকে বের হওয়া এই মুহূর্তে কঠিন ব্যাপার। সমস্ত শহর সীল করে দিয়েছে খৃস্টানরা। একটি খৃস্টান মেয়ের নিহত হওয়া এবং একটি শত্রু গোয়েন্দার পলায়ন মামুলি ব্যাপার নয়। বের হতে হবে রাতে। দু'জন একত্রে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দু'জনের কেউ ধরা পড়লে আর যা হোক এ তথ্য দেয়া যাবে না যে, রহীম মারা গেছে এবং তার লাশ অমুক জায়গায় আছে।

এখন প্রয়োজন শুরু ঘোড়ার। একস্থানে খৃস্টানদের আটটি ঘোড়া বাঁধা আছে। ইমরান রেজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দূর থেকে দেখা গেল, এক প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেজাকে একস্থান লুকিয়ে রেখে ইমরান এগিয়ে যায়। চলে যায় সান্ত্রীর নিকটে। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার, আজ পাহারা কেন? সান্ত্রী ইমরানকে ভাল করেই চেনে। চেনে জনগন্থুর নামে। বড় পাদ্রীর খাস খাদেম হিসেবে তাকে বেশ শ্রদ্ধাও করে। সে বলে, একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। আজ সে একটি মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। সে জন্য

নির্দেশ এসেছে সাবধান থাকতে।

সান্ত্রীর উপস্থিতিতেঘোড়া খুলে নেয়া সম্ভব নয়। ইমরান তাকে কথায় মাতিয়ে তোলে। এক পর্যায়ে তার পেছনে গিয়ে দু'বাহু দ্বারা তার ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরে। সান্ত্রীর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ইমরান বাঁহাতে তাকে শক্ত করে ধরে ডান হাতে কোমর থেকে খঞ্জরসম ছোট তরবারীটা বের করে সান্ত্রীর পেটে আঘাত করে। মারা যায় সান্ত্রী।

ইমরান রেজাকে ডেকে নিয়ে আসে। দু'টি ঘোড়া খুলে নিয়ে জিন বাঁধে। তারপর দু'জন দু'টিতে চড়ে ছুটে চলে।

গীর্জার অন্য সান্ত্রীরা কোথাও ঘুমিয়ে আছে। ইমরান ও রেজা এগিয়ে যায়। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একাধিক পথ আছে। তারা একটি পথ ধরে এগুতে থাকে। বেরিয়ে যায় শহর থেকে। আচমকা তারা কতগুলো লোকের বেষ্টনীতে পড়ে যায়। হাঁক আসে– 'থাম, তোমরা কারা?'

'আমরা এলাকার বাসিন্দা'– ইমরান বলল– 'তোমাদের ন্যায় আমরাও কর্তব্য পালন করছি।'

তিন-চারটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে, যার আলোতে ইমরান ও রেজা দেখতে পায়, একটি অশ্বারোহী বাহিনী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। এবার তাদের স্মরণে আসে, আরে, শহর তো সীল করে দেয়া হয়েছে! ইমরানের গায়ের পোশাকে নিহত সান্ত্রীর রক্তের দাগ। সেদিকে খেয়াল নেই তার। প্রদীপের আলোতে খৃস্টান সেনাদের চোখ পড়ে যায় সেদিকে। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমার শরীরে রক্তের দাগ কেন? ইমরান বুঝে ফেলে অবস্থা বেগতিক। কথা বাড়িয়ে ঝামেলা করলেই ক্ষতি। তার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করা ভাল।

হাতে ধরা লাগামটা ঝটকা একটা টান দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয় ইমরান। রেজাও তার অনুসরণ করে। বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে।। খানিকটা বিলম্ব করে ফেলেছে তারা।

ইমরান বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার পেছনে ছুটছে তিন অশ্বারোহী। রেজা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়। রেজার উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি ইমরান শুনতে পায়– 'থামবে না ইমরান, ছুটে যাও– আল্লাহ হাফেজ।'

অনেক দূর পর্যন্ত ইমরান এই শব্দ শুনতে থাকে। ইমরানের ঘোড়াটা বেশ উন্নতজাতের- দ্রুতগামী। তার ডান-বাঁ দিয়ে তীর অতিক্রম করতে শুরু করে। পথ তার চেনা। কার্ক অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলে ইমরান। ধাওয়াকারীদের সাথে তার ব্যবধান বাড়তে থাকে।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য উদিত না হলেও ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ততক্ষণে চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ইমরানের ঘোড়া। কিন্তু পানির

সন্ধান করার সুযোগ তার নেই। সামনের এলাকা বালুকাময় প্রান্তর। ঘোড়া হাঁটছে ধীরলয়ে।

ইমরান মরু এলাকায় প্রবেশ করেছে মাত্র, এমন সময় দু'টি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার সম্মুখে। এর অর্থ হল থেমে যাও। ইমরান দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো ইমরানের বাহিনীরই সদস্য। দেখে হালে পানি আসে তার।

ইমরানকে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কমান্ডার তার কথা শুনে তাকে একটি তাজাদম ঘোড়া ও দু'জন সিপাহী দিয়ে কার্ক অভিমুখে রওনা করিয়ে দেয়। ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কায়রো যাবে। আক্রা থেকে যে তথ্য নিয়ে এসেছে, তা জঙ্গীর নিকট পৌঁছিয়ে যেতে চায় সে।

❁ ❁ ❁

ইমরান যখন কার্ক দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গীর সামনে বসে তার কাহিনী বিবৃত করছিল, তখন সুলতান জঙ্গী তার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন, যেন তিনি এ সুদর্শন যুবকটিকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিতে চাইছেন। সুলতান জঙ্গী বসা থেকে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলচিত্তে ইমরানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং গণ্ডদ্বয়ে চুম্বন করেন। তিনি খাপ থেকে তরবারীটা বের করে আবার সেটি খাপে ঢুকিয়ে দু'ঠোঁটে স্পর্শ করে চুমো খান। তিনি তরবারীটা দু'হাতের তালুতে নিয়ে ইমরানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যে সময়টায় খৃস্টানরা হিংস্র চিলের ন্যায় মুসলমানদের চাঁদ-তারার উপর ছোঁ মেরে চলেছে, তখন একজন মুসলমান তার একজন মুসলিম ভাইকে তরবারী অপেক্ষা ভাল আর কী উপহার দিতে পারে! তুমি বাগদাদে বল, দামেস্কে বল, অন্য যে কোন জায়গায় বল, আমি তোমাকে একটি মহল উপহার দিতে পারি। তুমি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছ, তার বিনিময়ে তুমি বিপুল অর্থ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু প্রিয় বন্ধু আমার! আমি তোমাকে প্রাসাদ পুরস্কার দেব না। সম্পদের স্তূপ দিয়েও আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব না। কারণ, এ দু'টি বস্তুই মুসলমানদেরকে অন্ধ ও পঙ্গু করে দিয়েছে। এই নাও, এটি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে দিলাম। এটি আমার তরবারী। মনে রাখবে, এই তরবারী প্রবল প্রতাপশালী বহু খৃস্টানের রক্তপান করেছে। এই তরবারী অনেক দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছে। আমার এই তরবারী ইসলামের প্রহরী।'

ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। জঙ্গীর হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে তাতে চুমো খায়, চোখে লাগায়। তারপর অস্ত্রটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে নেয়। আনন্দের অতিশয্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ইমরানের। মুখ দিয়ে কথা আনতে পারছে না, দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার।'

'আর তুমি নিজের মর্যাদা জেনে নাও দোস্ত!'– জঙ্গী বললেন– 'একজন গুপ্তচর শত্রুর বিশাল বাহিনীকে যেমন পরাস্ত করতে সক্ষম, তেমনি একজন গাদ্দার পারে নিজের জাতিকে পরাজয়ের গ্লানির মুখে ঠেলে দিতে। তুমি দুশমনকে পরাজিত করে ফেলেছ ইমরান। তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছ, তা দুশমনের পরাজয়েরই সংবাদ। খৃস্টানরা মিসর-ফিলিস্তিনের কূলে ভিড়তে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের নৌ-বহর ফিরে যেতে পারবে না। এই বিজয় তোমার। এর উপযুক্ত প্রতিদান তোমাকে আল্লাহ প্রদান করবেন।'

'বিলম্ব না করে আমাকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত'– ইমরান বলল– 'দিন তো বেশী নেই। সময়ের অনেক আগেই আমীরে মেসেরের সংবাদটা পেয়ে যাওয়া দরকার।'

'তুমি এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন– 'আমি তোমাকে উন্নতজাতের ঘোড়া দিচ্ছি।'

সুলতান জঙ্গীর নির্দেশিত পথে ইমরান কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। এ-পথে বেশক'টি সেনা চৌকি আছে। প্রতিটি চৌকিতে দূতদের ঘোড়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে।

'... আর সালাহুদ্দীনকে প্রথম কথাটা বলবে, সে যেন রহীম ও রেজার পরিবারকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেয়। বাইতুলমাল থেকে যেন তাদের পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী ইমরানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি শুধু গুপ্তচরবৃত্তিই জান, নাকি যুদ্ধও বুঝ?'

'কিছু বুঝি না তা নয়'– ইমরান জবাব দেয়– 'আপনি হুকুম করুন।'

'পয়গাম লেখার সময় নেই'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন– 'তুমি সালাহুদ্দীনকে বলবে, কার্কের নিয়ন্ত্রণভার তার হাতে তুলে দিয়ে আমার বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। একের পর এক খবর পাচ্ছি, সেখানে খৃস্টানদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে এবং আমাদের ছোটখাট শাসকরা তাদের হাতে খেলছে। কিন্তু তোমার এই টাটকা সংবাদটা আমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করছে। বছর চার-পাঁচেক আগে তোমরা রোম উপসাগরে খৃস্টানদের নৌ-বহরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে। তারা তোমাদের ফাঁদে আটকে গিয়েছিল। এবার তারা আসবে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। সে জন্যই তারা ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলকে বেছে নিয়েছে। তোমরা যদি সরাসরি সমুদ্রে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তা ভুল হবে। তোমাদের কাছে খৃস্টানদের সমান নৌ-শক্তি নেই। তাদের আছে বিশাল বিশাল জাহাজ। প্রতিটি জাহাজে পাল ছাড়াও আছে অসংখ্য দাঁড়। দাঁড় চালনার জন্য আছে

বিপুলসংখ্যক মাল্লা। তোমাদের তা নেই। তোমাদের স্বতন্ত্র মাল্লা নেই। যারা মাল্লা, তারাই সৈনিক। নৌ-যুদ্ধে তারা একত্রে দু'কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। তাই আমার পরামর্শ, শত্রুকে কূল পর্যন্ত আসতে দাও। ওরা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তার মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'...ইমরান যে তথ্য নিয়ে এসেছে, দুশমন যদি সে মতেই আক্রমণ চালায়, তাহলে আমি থাকব দুশমনের পার্শ্বে। তাদের হিসেবে বাঁ-পার্শ্বে। ডান পার্শ্বকে তোমরা নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমাদের দায়িত্বে আরেকটি কাজ এই থাকবে যে, খৃস্টানদের জাহাজগুলো যেন ফিরে যেতে না পারে। পিছুহটার চেষ্টা করলে আগুন ধরিয়ে দেবে। তোমাদের কাছে যদি নৌ কমান্ডো থাকে, তাহলে জানই তো তাদের দ্বারা কী কাজ নেয়া যাবে। আর সুদানের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, আশা করি সে কথা বলতে হবে না। ওদিককার সীমান্ত উন্মুক্ত না থাকে যেন। আমার ধারণা, তোমাদের কাছে সৈন্য কম। সেই অভাব আমি পূরণ করার চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোপনীয়তা রক্ষা করা। গোপনীয়তার খাতিরে আমি পয়গাম লিখে পাঠালাম না। আল্লাহ বিজয় দান করলে আমি কার্কের দায়িত্বভার ফৌজের হাতে তুলে দিয়ে বাগদাদ চলে যাব।'

নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই পয়গাম হৃদয়ঙ্গম করে ইমরান কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

১১৭৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকের কোন একদিন যখন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দিলেন যে, আক্রায় এক গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে এবং তাদের কমান্ডার ইমরান ফিরে এসেছে; তখন সঙ্গে সঙ্গে সুলতান নির্জীব হয়ে যান। বেদনা-ভারাক্রান্ত মুখে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে দু'চারটি কথা বলেই তিনি ইমরানকে ভেতরে ডেকে নেন এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বন্ধন ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'বল, তোমার এক সঙ্গী কিভাবে শহীদ হল, অপরজন কিভাবে ধরা পড়ল?'

ইমরান পুরো ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা দেয়। সুলতান আইউবী তন্ময় হয়ে ঘটনার বিবরণ শোনেন। তারপর ইমরান যখন তার আক্রা থেকে নিয়ে আসা মহামূল্যবান তথ্যের বিবরণ দেয়, শুনে সুলতান আইউবী চমকে ওঠেন। ইমরান আরো অবহিত করে যে, আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীকেও বিষয়টি অবহিত করে এসেছি। ইমরান সুলতান আইউবীকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বার্তা শোনায়।

সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম রহীম ও রেজার পরিবারের জন্য ভাতা চালু

করে দেন। তারপর ইমরানকে অনেক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ইমরান জানায়, খৃস্টানদের নৌ-বহর আগেকার তুলনায় বড় হবে। আক্রমণ হবে এক মাসের মধ্যে। ইউরোপ থেকে তাগড়া সৈন্য আসবে। তাদেরকে ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলে অবতরণ করান হবে। অপর বাহিনী আসবে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে। এরা মিসরের দিকে এগিয়ে যাবে। ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলে অবতরণ করা সৈন্যরা ইস্কান্দারিয়া দখল করে সে অঞ্চলকে তাদের আখড়ায় পরিণত করবে। তারপর উত্তরদিক থেকে মিসরের উপর আক্রমণ চালাবে। ইমরানের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী খৃস্টানদের আশা, তারা সুলতান আইউবীর অজান্তেই অভিযানটা সেরে ফেলবে এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীও তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। কেননা, পথে বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থানরত বাহিনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বাস্তবিক সে এমনই এক ঝড় ছিল যে, সুলতান আইউবী আগাম খবর যদি না পেতেন, তাহলে খৃস্টানরা সুনিশ্চিতরূপেই মিসর দখল করে নিত।

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তাঁর সকল সিনিয়র কমান্ডদের তলব করেন। আলী বিন সুফিয়ানকে নির্দেশ দেন, দুশমনের গোয়েন্দাদের প্রতি নজরদারী তীব্রতর কর, তৎপরতা বৃদ্ধি কর, যাতে তারা আমাদের বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত কোন সংবাদ বাইরে পাচার করতে না পারে। ইস্কান্দারিয়া সম্পর্কেও তিনি জরুরী নির্দেশনা প্রদান করেন।

❁ ❁ ❁

বৃটেন এখনো এ-যুদ্ধে শরীক হতে চাচ্ছে না। ইংরেজদের আশা ছিল, তারা একাই যে কোন সময় মুসলমানদেরকে পরাজিত করে মুসলিম অঞ্চলগুলো দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু পোপের অনুরোধে তারা ক্রুসেডারদেরকে গোটা কতক যুদ্ধজাহাজ প্রদান করে। স্পেনের পূর্ণ বহর এই আক্রমণে অংশ নিতে প্রস্তুত। ফ্রান্স, জার্মানী এবং বেলজিয়ামের জাহাজও এসে পড়েছে। এই সম্মিলিত নৌ-বহরে ইউনান ও সিসিলীর কতগুলো জঙ্গী কিশতীও যোগদান করেছে। রসদ ও অস্ত্র বহনের জন্য নেয়া হয়েছে মাছ ধরার পালতোলা নৌকা। এ বহরে ঐ সকল দেশ থেকে তাগড়া সৈনিকরা এসে যোগ দিচ্ছে, যারা ক্রুশে হাত রেখে শপথ করেছিল, বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।

'সালাহুদ্দীন আইউবী যদি তার নৌ-বাহিনী দ্বারা আমাদের মোকাবেলা করে, তাহলে তাকে মিসরের সমান মূল্য দিতে হবে'– রোম উপসাগরের ওপারে এক কনফারেন্সে বসে ফরাসী নৌ-বাহিনীর কমান্ডার বলল– 'আমরা জানি, তার নৌবাহিনীর কতটুকু শক্তি আছে। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন

জঙ্গী স্থলপথে লড়াই করার মানুষ। আমরা আশা করতে পারি যে, এই অভিযানের সংবাদ মুসলমানরা সময়ের আগে জানতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী যখন এ সংবাদ পাবেন, ততক্ষণে আমরা কায়রো অবরোধ করে ফেলব। আর নুরুদ্দীন জঙ্গীও তার সাহায্যে আসতে পারবেন না। আমাদের এই আক্রমণ হবে চূড়ান্ত।'

'আমি আবারো বলছি, সুদানীদেরকে কাজে লাগানো আবশ্যক।' বললেন রেনাল্ট। রেনাল্ট একজন প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট ও যুদ্ধবাজ। তার দায়িত্ব বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে স্থলপথে আসা ও আক্রমণ করা। তিনি শুরু থেকেই জোর দিয়ে বলছিলেন, মিসরের উপর উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে হামলা হলে দক্ষিণ দিক থেকে সুদানীরা যাতে আক্রমণ করে, সেই ব্যবস্থা করা হোক।

'আপনি পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাচ্ছেন'– ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– '১১৬৯ সালে আমরা সুদানকে দেদারছে সাহায্য দিয়েছিলাম এবং এই আশায় আমরা সমুদ্রপথে মিসর আক্রমণ করেছিলাম যে, সুদানীরা দক্ষিণ দিক থেকে হামলা করবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যেসব সুদানী আছে, তারা বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। দু'বছর পর আবার তাদেরকে মদদ দিলাম। তাতেও কোন সুফল পেলাম না। তারা আবারো আমাদেরকে হতাশ করল। এখন কেন আমরা তাদেরকে আমাদের এই অভিযানে শরীক করতে যাব? আপনি জানেন না যে, সুদানীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা। মুসলমানদের উপর ভরসা রাখা ঠিক নয়। আপনি যদি সত্য সত্য ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে চান, তাহলে কোন মুসলমানকে বন্ধু বানাবেন না। ক্রয় করে তাদেরকে কাজে লাগাতে পারেন, বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে পারেন, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা-ই পোষণ করতে হবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন'– অপর এক খৃস্টান সম্রাট বললেন– 'আপনারা ফাতেমীদেরকে বন্ধু বানিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তারা এখন পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারেনি। আমরা তাদেরকে বড় বড় যোগ্যতাসম্পন্ন গোয়েন্দা ও নাশকতা কর্মী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে তাদেরকে ধরা খাইয়েছে ও খুন করিয়েছে। তাই এখন আর আমরা কারো প্রতিই আস্থা রাখতে পারছি না। আমাদের ভরসা একমাত্র আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তির উপর। এখন সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।'

বিপুল সমরশক্তিতে গর্বিত খৃস্টানরা। তাদের নৌ-শক্তির তো কোন হিসাব

নেই। বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে যে বাহিনী আসছে, সংখ্যায় তারা সমুদ্রপথে আগমনকারী সেনাসংখ্যার দ্বিগুণ। অন্তত ছয়জন সম্রাটই আছেন এই বাহিনীতে। নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের সংখ্যা ছিল অগনিত। তবে তাদের একটি ত্রুটি ছিল, তাদের একক কমান্ড ছিল না। তথাপি এই বাহিনী অতি অনায়াসে সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীকে পরাস্ত করে ফেলার কথা।

সুলতান আইউবীর দুর্বলতা, প্রথমত তাঁর সৈন্য কম। দ্বিতীয়ত গাদ্দাররা মিসরে অশান্তি ছড়িয়ে রেখেছে। বড় আশংকা, সুদানীরা হামলা করে বসতে পারে। নুরুদ্দীন জঙ্গীও ঠিক এ ধরনেরই সমস্যার সম্মুখীন। ইসলামী দুনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। শাসকরা ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত। তারা প্রত্যেকে খৃস্টানদের করতলগত। ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার কোনই পরোয়া নেই তাদের।

সুলতান আইউবী তার সিনিয়র কমান্ডারদেরকে ডেকে মূল বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেন। এক অংশকে সুদানের সীমান্ত অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে বললেন। তার কমান্ডারকে নির্দেশ দেন, সীমান্তের বেশ দূরে তাঁবু স্থাপন করবে; কিন্তু বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে সক্রিয় ও তৎপর রাখবে, যেন ধূলিবালি উড়তে থাকে, যাতে শত্রুরা মনে করে, তোমাদের সৈন্য অনেক। একটি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করলেন যে, কখনোই যেন বাহিনী বেকার না থাকে।

দ্বিতীয় অংশকে ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তাদের প্রতি নির্দেশনা, রওনা হবে রাতে আর গন্তব্যে পৌঁছবে দিনের বেলা। এ দলের কমান্ডারদেরকে বলে দিলেন, তোমার গন্তব্য কোথায় এবং সর্বশেষ অবস্থান কোন্ স্থানে হবে, তা পরে জানান হবে।

তৃতীয় দলকে সুলতান আইউবী নিজের হাতে রেখে দেন। তিনি কোন দলের কমান্ডারকে বলেননি যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্যে কি? তারা সবাই দেখতে পেল, সবগুলো মিনজানীক সেই দলটিকে দেয়া হয়েছে, যাদের গন্তব্য ইস্কান্দারিয়া।

এর সাত দিন পর। সুলতান আইউবী কায়রোতে নেই, নুরুদ্দীন জঙ্গী কার্কে নেই। দু'জনই ইস্কান্দারিয়ার পূর্বপ্রান্তে ঘোরাফেরা করছেন। কিন্তু কারো বুঝার যো নেই যে, এরা কোন্ দেশের সম্রাট কিংবা সেনাকমান্ডার। কারো বুঝার সাধ্য নেই যে, এরাই তারা, যারা খৃস্টানদের জন্য আপাদমস্তক আতংক। এ মুহূর্তে তারা দু'জন নিরীহ উষ্ট্রচালক, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কেউ জানে না।

সমুদ্রের কূলে গিয়ে তারা চোখের দৃষ্টিতে রোম উপসাগরের বিস্তৃতি পরিমাপ করেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের এই ঘোরাফেরা অব্যাহত থাকে তিন-চারদিন পর্যন্ত। তারপর নুরুদ্দীন জঙ্গী চলে যান কার্কে আর সুলতান আইউবী ইস্কান্দারিয়া গিয়ে তার নৌ-বাহিনী প্রধানকে জরুরী নির্দেশনা দিয়ে মিসর ফিরে যান।

❀ ❀ ❀

পূর্ণ নীরবতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে এসে পড়ে খৃস্টানদের নৌ-বহর। বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে মিসর অভিমুখে রওনা দেয় স্থল বাহিনী। উভয় বাহিনী রওনা দেয় সময়ের মিল রেখে। বেশ উপযুক্ত মওসুম বেছে নিয়েছে খৃস্টানরা। শান্ত সমুদ্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ-তরঙ্গের আশংকা নেই।

খৃস্টীয় নৌ-জাহাজের কাপ্তানদের মিসরের উপকূলীয় এলাকা চোখে পড়তে শুরু করেছে। একেবারে সম্মুখের জাহাজের কাপ্তান সমুদ্রে একটি মাছধরা নৌকা দেখতে পায়। চলে যায় নৌকার কাছে। জাহাজ থামিয়ে উপর থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'এই, তোমাদের জঙ্গী জাহাজগুলো কোথায়? মিথ্যে বললে কিন্তু পানিতে ডুবিয়ে মারব।'

জেলেরা বলল, 'মিসরের জাহাজ এদিকে থাকেনা। এখান থেকে এনেক দূরে থাকে।'

জাহাজ থেকে একটি রশি ফেলা হয়। দু'জন জেলে রশি বেয়ে জাহাজে উঠে যায়। তারা কাপ্তানকে মিসরের যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করে, তাহল, কয়েকটি জাহাজের মেরামতের কাজ চলছে। যেগুলো ভাল, সেগুলোও ইস্কান্দারিয়া পৌঁছতে দু'দিন প্রয়োজন হবে। কারণ, একে তো এখান থেকে অনেক দূরে, তদপুরি ওগুলোর পাল ও দাঁড় দুর্বল। জেলেরা খৃষ্টানদেরকে সবচেয়ে মূল্যবান যে তথ্যটি প্রদান করে, তা হল, সুলতান আইউবী নৌ-বাহিনীর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না; ফলে এই শাখার সৈন্য ও মাল্লারা অলসতা-বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে থাকে। তারা কূলবর্তী লোকালয়ে চলে যায়, জেলেদের থেকে মাছ ছিনিয়ে নেয় আর খায়।

খৃস্টান নৌ-বাহিনীর রাহবারের জন্য এই সব তথ্য দারুণ সুসংবাদ-ই বটে। সে জাহাজ থামিয়ে দেয় এবং একটি নৌকায় করে বাহিনীর কমাণ্ডারের নিকট ছুটে যায়। কমাণ্ডারকে জেলেদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অবহিত করে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়দান ফাঁকা। কমাণ্ডার জাহাজের বহর এখানেই থামিয়ে দেয় এবং সন্ধার পর অন্ধকারে কূলে গিয়ে ভিড়বে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

ইস্কান্দারিয়ার বন্দরঘাট থেকে আরো একটি নৌকা সমুদ্রের দিকে ছেড়ে আসে। বাহ্যত মাছধরার নৌকা। সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। নৌকাটা খৃস্টানদের

জাহাজের বহরের নিকট চলে যায়। অন্তত আড়াইশ' যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জেলেরা নৌকাটা বহরের মধ্যখান দিয়ে নিয়ে যায় এবং একে ওকে জিজ্ঞাসা করে কমাণ্ডারের নিকট চলে যায়। তারা কমাণ্ডারকে জানায়, ইস্কান্দারিয়ায় কোন ফৌজ নেই। আছে শুধু সাধারণ মানুষ। মিসরের যুদ্ধ জাহাজ এখান থেকে অনেক দূরে। এই জেলেরা মূলত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা; কিন্তু পরিচয় দেয় খৃস্টানদের গোয়েন্দা বলে।

রাতের প্রথম প্রহর। প্রথম সারির জাহাজগুলো সম্মুখ পানে এগিয়ে চলে এবং কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কূলে ভিড়ে। দ্বিতীয় সারিটি প্রথমটির পিছনে পিছনে এগিয়ে এসে নোঙ্গর ফেলে। এগিয়ে আসে তৃতীয়টিও।

সৈন্য অবতরণ করার ব্যবস্থা এই ছিল যে, প্রতিটি জাহাজ তীরে ভিড়বে না। একটির সঙ্গে আরেকটি সামনে পিছনে লাগোয়া থাকবে আর একের পর এক জাহাজ বেয়ে একেবারে সম্মুখের জাহাজ দিয়ে তারা ডাঙ্গায় অবতরণ করবে।

খৃস্টানদের সিদ্ধান্ত, ইস্কান্দারিয়ার উপর নীরবে হামলা করবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইস্কান্দারিয়ায় মুসলমানদের কোন সৈন্য নেই, কোন প্রতিরোধের আশংকাও নেই। শহরটি অতি অনায়াসে দখল হয়ে যাবে।

সম্মুখের জাহাজ থেকে যেসব সৈন্য অবতরণ করে, তাদেরকে ইস্কান্দারিয়ায় ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেয়া হল। তাদের আগাম বলে দেয়া হল, শহর তোমাদের; কোন প্রতিরোধ হবে না। হুড়মুড় করে ছুটে চলে খৃস্টান সৈন্যরা। শহরটা লুণ্ঠন করা তাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ নারীদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করা।

কিন্তু বাহিনীটি যেইমাত্র শহরের কাছাকাছি চলে আসে, শহরের বাইরে ডানে-বাঁয়ে হঠাৎ করে বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলে উঠে। অগ্নিশিখায় অন্ধকার রাত আলোকিত হয়ে যায়। এগুলো শুক্‌নো খড়, কাঠ ও কাপড়ের স্তূপ। রাতের অন্ধকারে আলোর প্রয়োজনে কেরোসিন ঢেলে এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

শহরের অলি-গলিতে প্রদীপ জ্বলে উঠে। ঘরের ছাদ থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়। খৃস্টানরা পিছন দিকে পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু ডান-বাম থেকেও তাদের উপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। আত্মসংরক্ষণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তীরের আঘাত খেয়ে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে সৈন্যরা। তাদের হাঁক-ডাক আর আর্তচিৎকারে রাতের পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

সংখ্যায় তারা দু'হজার। দু'চার-জন জীবনে রক্ষা পেলেও পেতে পারে। অন্যরা সব ধ্বংস হয়ে গেছে সুলতান আইউবীর যোদ্ধাদের হাতে।

যেসব খৃস্টান সৈন্য জাহাজ থেকে অবতরণ করেনি, তারা এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পায়। তারা এলোপাতাড়ি অগ্নিগোলা ও বহুদূরগামী তীর ছুঁড়তে শুরু করে।

কাপ্তানরা পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে, হঠাৎ একেবারে পিছনের দু'তিনটি জাহাজ থেকে আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে। তাদের মনে হল, যেন সমুদ্রের ভিতর থেকে আগুনের গোলা উঠে এসে জাহাজে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। পরম আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়ে খৃস্টানরা সবগুলো জাহাজকে একত্রিতভাবে জড়ো করে রেখেছিল। তাদের ধারণা, বিনা বাধায় বিজয় তাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু তারা যে সুলতান আইউবীর পাতা ফাঁদে এসে ঢুকেছে, সে খবর তাদের নেই।

দিনের বেলা প্রথম জাহাজের কাপ্তান যে সব জেলের সাথে কথা বলেছিল, তারাও ছিল আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। কিন্তু সমুদ্রে জেলেদের পেয়ে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে তাদের থেকে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে সে আনন্দ করেছিল। জেলেরা তাদেরকে একটি তথ্য-ই সঠিক দিয়েছিল যে, মিসরের নৌ-বহর এখান থেকে অনেক দূরে। ছিল আসলে দূরে-ই।

সুলতান আইউবী তাঁর নৌ-বাহিনী প্রধানকে বলে রেখেছিলেন, সমুদ্রের প্রতি নজর রাখ; যে কোন সময় হামলা আসতে পারে। নৌ-বাহিনী প্রধান নজরদারীর বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সময়ের আগে-ই খবর পেয়ে যান যে, খৃস্টানদের নৌ-বহর মাঝ-দরিয়ায় এসে পড়েছে। তিনি কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজকে– যেগুলোতে অগ্নি-গোলা নিক্ষেপকারী মিনজানীক স্থাপন করা আছে– দূরে একদিকে পাঠিয়ে দেন। জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুল নামিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে দূর থেকে দেখা না যায়। তার পরিবর্তে তিনি জাহাজগুলোকে গতিময় করার জন্য একদাঁড়ে দু'জন করে লোক নিয়োজিত করেন।

সন্ধ্যার পর যখন খৃস্টানদের নৌ-বহর তীরে এসে ভীড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মিসরের নৌ-বাহিনী প্রধান তার জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুলও তুলে দেন। দাঁড়ের গতিও তীব্রতর করে তুলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি এমন একসময় খৃস্টানদের জাহাজ-বহরের পিছনে গিয়ে পৌঁছেন, যখন তারা তাদের জাহাজগুলোকে একটার সঙ্গে অপরটা মিলিয়ে নোঙ্গর করে রেখেছে। খৃস্টানদেরকে এই প্রবঞ্চনায় ফেলেছে ইস্কান্দারিয়া থেকে আসা 'জেলে'রা। তারা খৃস্টান কমাণ্ডারকে বলেছিল, আমরা আপনাদের-ই গুপ্তচর। তারা তথ্য দিয়েছিল, ইস্কন্দারিয়ায় কোন ফৌজ নেই। অথচ বাস্তব অবস্থা হল, নগরীর সমুদ্রবর্তী বাড়ী-ঘরগুলোতে শুধু ফৌজ-ই ছিল– অধিবাসীদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধান মাত্র অল্প ক'টি জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। তা দ্বারা-ই তিনি দুশমনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হন। কয়েকটি জাহাজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অন্যরা মোকাবেলা করে। জ্বলন্ত জাহাজগুলো রাতকে দিবসে পরিণত করে দেয়। সেই আলোতে সুলতান আইউবীর জাহাজগুলোও চোখে পড়তে শুরু করে। তার মধ্য থেকে একটি জাহাজ খৃস্টানদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। আইউবীর নৌ-প্রধান তার জাহাজগুলোকে পিছনে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। খৃস্টানরা সেগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। ইস্কান্দারিয়ায় অবস্থানরত আইউবীর জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোতে অগ্নি-গোলা ছুঁড়তে শুরু করে। এই জানবাজরা মিসরের বাহিনীর তৃতীয় অংশ, যাদেরকে সুলতান নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। তাদেরকে-ই অসামরিক বেশে ইস্কান্দারিয়ার বসত-বাড়ীগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এবং অতি নীরবে শহরের বাসিন্দাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লড়ছেন বুদ্ধি আর কৌশলের লড়াই। শক্তি ব্যয় করছেন নিতান্ত কম। তার নিজের অধীনে রাখা আছে এখনো অনেক কমাণ্ডো।

রাতভর এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। সমুদ্রে জ্বলতে থাকে অসংখ্য জাহাজ। এক প্রলয়ের দৃশ্য সৃষ্টি হয়ে আছে নদীতে। খৃস্টানদের জাহাজ অসংখ্য। বিপুল পরিমাণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর এখনো আস্তো আছে অনেকগুলো। এগুলো মুসলমানদের জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। অবস্থা অনেকটা ঘিরে ফেলার মতো-ই হয়ে গেছে। রাত হওয়ার কারণে অবস্থা পরোপুরি আঁচ করা যাচ্ছে না। সুলতান আইউবীও রণাঙ্গনে উপস্থিত। তিনি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখা জাহাজগুলোকে অভিযানে অংশ নেয়ার নির্দেশ প্রেরণ করেন। রাতের শেষ প্রহরে সেগুলোও এসে পড়ে।

রাত পোহাতে আর দেরি নেই। মিসরের নৌ-বাহিনী প্রধান একটি নৌকায় করে কূলে এসে পৌঁছান। সঙ্গে তার কয়েকজন সিপাহী। তার পরিধানের পোশাক রক্তে রঞ্জিত। এক-পা আগুনে ঝলসে গেছে। তিনি যে জাহাজে ছিলেন, সেটিও পুড়ে গেছে। নিজে আহত হয়ে কয়েকজন সিপাহীকে উদ্ধার করে নিয়ে তীরে এসেছেন। তিনি সুলতান আইউবীকে পরিস্থিতির বিবরণ দেন যে, তার অর্ধেক জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। খৃস্টানদেরও এতো অধিক ক্ষতি হয়েছে যে, আর বেশী সময় লড়াই করার সাধ্য তাদের নেই। সুলতান আইউবী তাকে অবহিত করেন যে, আমাদের অবশিষ্ট জাহাজগুলোকেও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুলতানের এই পদক্ষেপে বাহিনী প্রধান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তার

কামনাও এটা-ই ছিল। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, খৃষ্টানরা জাহাজগুলোতে যেসব মালামাল ও রসদপাতি বোঝাই করে রেখেছে, সেগুলো এখন তাদের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসদ ছাড়া তাদের জাহাজে ফৌজও আছে। কোন কোন জাহাজে ঘোড়াও আছে। এই কারণে তাদের জাহাজের গতি কম, চক্কর কাটতে সময় লাগে। অন্যদিকে আমার জাহাজ শূন্য ও হালকা।

সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধানের জখম খুব গুরুতর। এখন আর তিনি বসে থাকতে পারছেন না, মাথাটা দুলছে। সুলতান ডাক্তার ডেকে পাঠান।

সুলতানের স্থাণীয় হেড-কোয়ার্টার সমুদ্র কূলবর্তী এক পার্বত্য এলাকায়। তিনি উঁচু একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের প্রভাত-কিরণ সমুদ্রের যে দৃশ্য উপস্থাপন করল, তা রীতিমত ভয়াবহ। অনেকগুলো জাহাজ মত্ত হাতীর ন্যায় সমুদ্রে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগুনে জ্বলছে বহু জাহাজ। পাল-মাস্তুল পুড়ে যাওয়ায় একই স্থানে দাঁড়িয়ে চক্কর কাটছে জাহাজগুলো। সমুদ্রে বহু মানুষ ভাসতে দেখা গেল। তরঙ্গমালা লাশগুলোকে তীরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। নিজের জাহাজগুলোর কোন সন্ধান পেলেন না সুলতান। অনেক দূরে পশ্চিমদিকে প্রথমে অনেকগুলো মাস্তুলের মাথা, তারপর পাল চোখে পড়তে শুরু করে। জাহাজগুলো এক সারিতে একটা থেকে অপরটা বেশ ব্যবধানে রণাঙ্গন অভিমুখে এগিয়ে আসছে। সুলতান আইউবী 'তোমার জাহাজ আসছে' বলেই তিনি পার্শ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু নৌ-বাহিনী প্রধান সেখানে নেই।

নৌ-বাহিনী প্রধান তাঁর জাহাজ-বহরের আগমন দেখে-ই সুলতানকে কিছু না বলে উপর থেকে নেমে যান। সুলতান যখন তাকে দেখতে পান, ততক্ষণে তিনি একটি নৌকায় চড়ে বসেছেন এবং নৌকার পালও উঠে গেছে। নৌকাটা দশ দাঁড়ের। সুলতান চীৎকার করে তাকে ডাক দেন– 'সাদী! তুমি ফিরে আস, তোমার স্থলে আমি আবু ফরীদকে পাঠাচ্ছি।'

নৌ-বাহিনী প্রধান বেশ দূরে চলে গেছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দেন– 'এটা আমার যুদ্ধ আমীরে মেসের! আল্লাহ্ হাফেজ।'

নৌকাটা দ্রুতগতিতে দূর থেকে দূরান্তে চলে যেতে থাকে। তারপর একসময় দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যায়।

দূত এসে সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেয়, ইস্কান্দারিয়ার উত্তর-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে খৃষ্টানদের কিছু সৈন্য অবতরণ করেছে এবং সেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। সুলতান সেখানকার জন্য কিছু নির্দেশ জারি করেন এবং

সমুদ্রের যুদ্ধ অবলোকন করতে থাকেন।

সুলতান দেখতে পান, খৃস্টানদের একটি জাহাজ কূলের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার তার বহরের একটি জাহাজও ঐ জাহাজটির কাছে চলে আসার চেষ্টা করছে। খৃস্টানরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ে সেটিকে প্রতিহত করার কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমান মাল্লারা সবকিছু উপেক্ষা করে জাহাজটির একেবারে নিকটে চলে যায় এবং লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজে ঢুকে পড়ে-ই হাতাহাতি লড়াই করে জাহাজটি দখল করে নেয়। মিসর নৌ-বাহিনীর জানবাজ সৈন্যরা খুন ও জীবনের নজরানা পেশ করে এ যুদ্ধ জয় করে। তারা তিন তিনজন, চার চারজন করে ভাগে ভাগে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন দলের সঙ্গে লড়াই করে। জীবন দিয়ে জীবন নিয়ে তারা শত্রুর জাহাজটা দখল করে নেয়।

খৃস্টানদের কোমর রাতারাতি-ই ভেঙ্গে যায়। তাদের কমাণ্ডার ক্রুশের শপথ পূর্ণ করে চলেছে। তারা তাদের সৈন্যদেরকে ভোর পর্যন্ত এই আশ্বাস দিয়ে দিয়ে লড়াতে থাকে যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে-ই আমরা সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে কাবু করে ফেলছি। কিন্তু পরদিন দ্বি-প্রহর পর্যন্ত তাদের অবস্থা দাঁড়ায়, জাহাজগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যেতে থাকে। তাদের অধিকাংশ শক্তি মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের যে ক্ষুদ্র বাহিনীটি কূলে অবতরণ করেছিল, তাদের অনেকে ইস্কান্দারিয়া থেকে তিন-চার মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে একস্থানে লাশ হয়ে পড়ে আছে। অবশিষ্টরা মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

সুলতান আইউবীর বাহিনীর দ্বিতীয় গ্রুপ এখনো যুদ্ধে অবতরণ করেনি। সুলতানের নিকট দূত আসছে-যাচ্ছে। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, খৃস্টানরা পরাজিত হয়ে গেছে, তখন তিনি ফৌজের দ্বিতীয় গ্রুপটিকে অন্য এক ময়দানে প্রেরণ করেন। ইমরানের তথ্য মোতাবেক বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকেও খৃস্টান ফৌজ আসার কথা। তাদের জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গী ওঁত পেতে আছেন। তথাপি অধিক সতর্কতার জন্য সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিরক্ষা শক্ত করে নেন। সুলতান তৃতীয় যে গ্রুপটিকে নিজের অধীনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে সেই খৃস্টানদের গ্রেফতার করার কাজে লাগিয়ে দেন, যারা সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

শেষ বেলার ক্লান্ত সূর্যের ম্লান কিরণমালা সুলতান আইউবীকে যে দৃশ্যটি প্রদর্শন করল, তাহল, এখন খৃস্টানদের সেই জাহাজগুলো-ই দেখা যাচ্ছে, যেগুলো পুড়ে গেছে, কিন্তু এখনো ডুবেনি কিংবা যেগুলোকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে এসেছে অথবা সেই জাহাজগুলোর-ই পাল-মাস্তুল নজরে আসছে, যেগুলো ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। অপরদিকে

সুলতানের নিজের যে জাহাজগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, সেগুলো কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। দর্শকরা অনুমান করল, সুলতান আইউবীর অর্ধেক নৌ-শক্তি মিসরের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। নৌকাগুলো কূলের দিকে আসছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের রক্ষাপাওয়া আহত-অক্ষত সৈন্যরা এগুলোতে করে কূলে আসছে। একটি নৌকা সেই টিলাটির নিকটে এসে কূলে ভিড়ে, সুলতান আইউবী যার উপর দাঁড়িয়ে। কার যেন লাশ তার মধ্যে। সুলতান আইউবী বিচলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'এই, এটি কার লাশ?'

'নৌ-বাহিনী প্রধান সাদী বিন সাদ-এর।' এক মাল্লা জবাব দেয়।

সুলতান আইউবী দৌড়ে নীচে নেমে আসেন। লাশের উপর থেকে কাপড়টা সরালেন। তার নৌ-বাহিনী প্রধান সাদী বিন সাদ-এর রক্ত রঞ্জিত লাশ!

মাল্লারা জানায়, সাদী বিন সাদ একটি জাহাজে গিয়ে পৌঁছে যুদ্ধের কমাণ্ড হাতে তুলে নেন এবং নিজে লড়াই করতে থাকেন। সেই জাহাজটির উপর তিনি তার কমাণ্ডের পতাকা উড়িয়ে দেন। খুব সম্ভব সে কারণে-ই খৃস্টানদের চারটি জাহাজ তাকে ঘিরে ফেলে। প্রতিরোধের শিকার হয়ে সেগুলোর মধ্যে দু'টি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সাদী বিন সাদ-এর জাহাজও ধ্বংস হয়।

সুলতান আইউবী তার নৌ-বাহিনী প্রধানের লাশের হাতে চুমো খেয়ে অশ্রু ছল ছল নয়নে বললেন, 'তুমি-ই সমুদ্রের বিজেতা সাদী বিন সাদ- আমি নই।'

সুলতান আইউবী নির্দেশ দেন, 'দুশমনের কিশতিগুলো সব সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। শহীদদের লাশগুলো সব সমুদ্র থেকে তুলে আন, একটি লাশও যেন সমুদ্রে না থাকে। তাদেরকে এখানেই দাফন কর। রোম উপসাগরের হিমেল হাওয়া চিরদিন তাদের কবরগুলোকে ঠাণ্ডা রাখবে।'

সমুদ্রে শহীদহওয়া মুজাহিদদের সংখ্যা কম ছিল না।

বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে খৃস্টানদের বাহিনী রওনা হয়ে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে। তারা জানেনা যে, তাদের নৌ-বাহিনী চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। খৃস্টানদের খ্যাতনামা যুদ্ধবাজ সম্রাট রেজনাল্ট তাদের কমাণ্ডার। বাহিনীটি তিন ভাগে বিভক্ত। এক অংশ সম্মুখে। দ্বিতীয় অংশ কিছুটা পিছনে মধ্যখানে এবং তৃতীয় অংশ অনেক বাঁ ঘেষে এগিয়ে চলছে। বাহিনীর সম্মিলিত কমান্ড রেজনাল্টের হাতে। তাদের আশা, তারা সুলতান আইউবীর উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আঘাত হানতে সক্ষম হবে। কল্পনার চোখে তারা কায়রো দেখতে পাচ্ছে। ঘোড়া-গাড়ির কাফেলা এবং রসদও আছে তাদের সাথে।

ইস্কান্দারিয়া থেকে অনেক দূরে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত বালুকাময় এক এলাকা। এখানকার কোথাও মাটির টিলা, কোথাওবা সমতল ভূমি। তার পার্শ্ববর্তী এলাকাটা পর্বতময়। পর্যাপ্ত সুপেয় পানি আছে এখানে। এই এলাকায় ছাউনি ফেলেন কমান্ডার রেজনাল্ট। তার বাহিনীর অগ্রগামী অংশ এগিয়ে চলছে সম্মুখে। ডানদিকের অংশ এখনো অনেক দূরে পিছনে। মধ্যরাতে হঠাৎ–নিতান্ত-ই হঠাৎ সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায় তার ক্যাম্পে। কেয়ামতটা আসমান থেকে নেমে এল, নাকি তার বাহিনী বিদ্রোহ করে বসল, কিছু-ই বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর ফাঁদে এসে পা দিয়েছে রেজনাল্ট। জঙ্গী তার সৈন্যদেরকে কয়েকদিন যাবত বসিয়ে রেখেছেন এ এখানকার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি ধরে নিয়েছেন, যেহেতু এখানে পানি আছে, কাজেই খৃস্টানরা অবশ্যই এখানে ছাউনি ফেলবে।

সুলতান জঙ্গীর কমাণ্ডারদের দুঃখ, খৃস্টান বাহিনীর অগ্রগামী অংশ আগে চলে গেছে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, রাতে ছাউনিতে হামলা চালাবে। কিন্তু অগ্রগামী বাহিনী এখানে ছাউনি না ফেলে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। অনেক পরে তারা দূরে ধূলির মেঘ দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল, ঝড় আসছে। মরু এলাকার ঝড়োহাওয়া বড় ভয়ানক হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তা ঝড় নয়–খৃস্টান বাহিনীর মধ্যম অংশ। তারা এসে এ স্থানে থেমে যায়। তারা তাঁবু স্থাপন করেনি। কেননা, ভোরেই তাদেরকে রওনা হতে হবে। পশুগুলোকে আলাদা বেঁধে রাখে। সূর্য ডুবে যায়।

মধ্যরাতে জঙ্গীর ওঁত পেতে থাকা সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা সকলে-ই আরোহী। তারা প্রথমে অন্ধাকারে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে। খৃস্টান সৈন্যদের মধ্যে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। এবার আরোহীরা ঘোড়া ছুটায়। এলোপাতাড়ি বর্শা ও তরবারী চালাতে চালাতে সামনে এগিয়ে যায়। খৃস্টান সৈন্যরা নিজেদের সামলে নিতে না নিতে-ই জঙ্গীর সৈন্যেরা আবার তীব্র আঘাত হানে। খৃস্টানদের বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর রশি খুলে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে। রেজনাল্ট এলাকা ছেড়ে পালিয়ে পিছনের বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। বাহিনীর সেই অংশটি এখান থেকে এখনো অনেক দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। নুরুদ্দীন জঙ্গী সেদিকে-ই কোথাও অবস্থান করছেন। খৃস্টান বাহিনীর সমস্ত রসদ পিছনে আসছে। জঙ্গী তাঁর জন্য আলাদা ইউনিট নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা ভোর নাগাদ রসদের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। ডানদিকের বাহিনী রাতে-ই টের পেয়ে গিয়েছিল। রেজনাল্ট সেই বাহিনীকে নিজের কাছে নিয়ে

আসতে চাইছেন। তার ধারণা মতে যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হবে। এই বাহিনী ভোরের আলো-আঁধারিতে রওনা হয়। নুরুদ্দীন জঙ্গী পিছন থেকে তার এক পার্শ্বের উপর আক্রমণ করে বসেন। তারা টের-ই পেলনা যে, আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আসল বা কে করল। সুলতান আইউবীর ন্যায় জঙ্গীও এক জায়গায় স্থির হয়ে লড়াই করেন না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হামলা করে করে প্রতিপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে থাকেন।

সুলতান জঙ্গী রাতে সুলতান আইউবীর নিকট দূত প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা তো দু'জনে আগেই তৈরী করে রেখেছেন। জঙ্গীর প্রতিটি কর্মতৎপরতা, পদক্ষেপ ও দুশমনের গতিবিধি হুবহু তার পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। রেজনাল্ট তার অগ্রগামী বাহিনীকে পিছনে সরে আসার বার্তা প্রেরণ করে। চারদিন পর্যন্ত জঙ্গী ও রেজনাল্টের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। জঙ্গী খৃস্টান সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে ফেলেন এবং 'আঘাত কর আর পালাও'-এর নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যান। খৃস্টানদের সম্মুখের বাহিনী পিছনে সরে আসে। রাতে তার উপর পিছন দিক থেকে হামলা হয়। হামলা করে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনী। তারা দু-তিন রাত কমাণ্ডো হামলা চালায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ধারা অব্যাহত থাকে তারপরও। খৃস্টানরা মুখোমুখি লড়াই করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদেরকে সফল হতে দিচ্ছেন না। যে পন্থায় হামলা চলছে, তাও চাট্টিখানি বিষয় নয়। আক্রমণে কমাণ্ডো যদি যাচ্ছে একশ', ফিরে আসছে ষাটজন। তা ছাড়া তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা, বীরত্ব ও দৃঢ়তা, যা সুলতান আইউবী তার সৈন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যুদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। খৃস্টান সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কমাণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। রসদ-পানি এসে পড়েছে জঙ্গীর কব্জায়। এ যুদ্ধের আগা-মাথা, দিক-পাশ কিছুই ধরতে পারছে না তারা। কী থেকে কী হয়ে গেল, কী-ইবা হচ্ছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কোন দিশা না পেয়ে তারা পালাতে শুরু করে। পালাবার শক্তিও যাদের নেই, তারা আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

সেনাপতি রেজনাল্ট হার মানতে প্রস্তুত নন। তিনি একস্থানে কিছু সৈন্য জড়ো করে নেন এবং তাদেরকে জঙ্গীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা জঙ্গীর অবস্থানের উপর হামলা চালায়। জীবনমৃত্যুর লড়াই লড়ছে খৃস্টান সৈন্যরা। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম রাতে জঙ্গীর গেরিলা গ্রুপের কিছু সৈন্য রেজনাল্টের নিজস্ব তাঁবুতে হামলা চালায়।

ভোর হল। খৃস্টান সেনাপতি রেজনাল্ট বন্দী হিসেবে জঙ্গীর সামনে

দণ্ডায়মান। সুলতান জঙ্গী বিভিন্ন শর্তে তাকে মুক্তি দেয়ার কথা ভাবছেন। মুক্তির শর্তগুলো তাকে অবহিত করছেন। বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রসঙ্গ আসে। জঙ্গী বললেন, বাইতুল মোকাদ্দাসকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাও।

সন্ধ্যা নাগাদ সুলতান আইউবীও এসে পড়েন।

যথাযথ সম্মানের সাথে রাখা হয়েছে রেজনাল্টকে। সুলতান আইউবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন।

'আপনি এক মহান যোদ্ধা।' সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে রেজনাল্ট বললেন।

'বরং বল, ইসলাম এক মহান ধর্ম'– সুলতান বললেন– 'সেই যোদ্ধা-ই মহান হন, যার ধর্ম মহান।'

মোহতারাম রেজনাল্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাদের নৌ-বহর এসেছে নাকি? নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীকে বললেন- 'এ প্রশ্নের সঠিক জবাব তুমি-ই দিতে পার; আমি তো এখানেই ছিলাম।'

আপনাদের নৌ-বহর সমভিব্যহারে এসেছিল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আবার ফিরেও গেছে। অনেকগুলো জাহাজ সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে। যেগুলো ডুবেনি, সেগুলোর পোড়া খোল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। যেসব সৈন্য জাহাজ থেকে নেমেছিল, তারা একজনও ফিরে যেতে পারেনি। আপনাদের সমস্ত মরদেহ আমরা পূর্ণ সম্মানের সাথে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।'

সুলতান আইবী সেনাপতি রেজনাল্টকে যুদ্ধের পুরো ঘটনার বিবরণ প্রদান করছেন আর রেজনাল্ট তন্ময় হয়ে শুনছেন। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সুলতান যা বলছেন, সত্য বলছেন কি!

'আপনি যা শোনালেন, যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে পারেন, এমনটা কিভাবে সম্ভব হল?' রেজনাল্ট জিজ্ঞেস করে। তার চোখে-মুখে দুনিয়ার বিস্ময়।

'এই রহস্য আপনাকে সেদিন উন্মোচন করব, যেদিন ফিলিস্তীন থেকে খৃষ্টানদের সর্বশেষ সৈন্যটি বেরিয়ে যাবে'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন- 'আপনার এই পরাজয় শেষ পরাজয় নয়। কেননা, আপনারা এই ভূখন্ড ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন মনে হচ্ছে।'

'আপনার ভূখন্ড আমি আপনাকে দিয়ে দিব'– রেজনাল্ট বললেন- 'আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমি আপনার সঙ্গে আর যুদ্ধ না করারও চুক্তি করব। আপনার সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে।'

'নিজের রাজত্ব নয়'-সুলতান আইউবী বললেন- 'আমরা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করছি। আমরা ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চাই। আপনাদের লক্ষ ইসলামের মূলোৎপাটন , যা কোনদিনও

সম্ভব নয়। আপনারা ফৌজ ব্যবহার করে দেখেছেন। নৌ-শক্তিও পরীক্ষা করেছেন। নিজ কন্যাদেরও ব্যবহার করে দেখেছেন। আপনারা আমাদের জাতির মধ্যে গাদ্দার তৈরি করেছেন। বলুন, বিগত এক শতাব্দীতে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন?'

'আমি কি আপনাকে বলব যে, আমরা কোন্ কোন্ স্থান থেকে ইসলাম বের করে দিয়েছি?'– রেজনাল্ট বলল- 'ইসলাম তো রোম উপসাগরের ওপারে পৌঁছে গিয়েছিল। বলুন তো সেখান থেকে ইসলাম কেন বিতাড়িত হয়েছে? রোম আপনাদের হাতছাড়া হল কেন? সুদান কেন আপনাদের দুশমনে পরিণত হল? শুধু এই জন্য যে, ইসলামের মোহাফেজদেরকে আমরা ক্রয় করে নিয়েছি। আর আজও আপনাদের বহু শাসক ভাই আমাদের কেনা গোলাম। তাদের শাসনাধীন ভূখন্ডগুলোতে মুসলমান আছে বটে; ইসলাম নেই।'

আমরা ওসব ভূখন্ডে ইসলামকে পুনর্জীবিত করব।' সুলতান আইউবী বললেন।

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন, সালাহুদ্দীন!'– রেজনাল্ট বললেন– 'আপনারা দু'জন ক'দিন জীবিত থাকবেন? ক'দিন যুদ্ধ করতে পারবেন? আপনারা ইসলামের পাসবানী কতদিন পর্যন্ত করবেন? আমি আপনাদের দু'জনের প্রশংসা করছি। স্বীকার করছি, আপনারা সফল। আপনারা দু'জন সত্যিই ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। কিন্তু আপনাদের জাতির মধ্যে ধর্মকে নীলামে বিক্রয়কারী লোকের সংখ্যা অনেক। আমরা হলাম ক্রেতা। আপনারা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবেন না। আপনাদের জাতির কর্ণধাররা আকণ্ঠ বিলাসিতায় নিমজ্জিত। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, যে পঁচন একটি জাতির মাথা থেকে শুরু হয়, তা রোধ করা যায় না; গোটা জাতিই তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। সে কারণে আমরা আপনাদের জাতির কর্ণধারদের ফাঁদে ফেলেছি। আপনারা যদি আমাকে হত্যা করে ফেলেন, যদি আমার ন্যায় দু'চারজন খৃস্টান সম্রাটকে খুন করেন, তবু ইসলামের পতন অনিবার্য। আমরা যে বিষ আপনাদের জাতির শিরায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, তার ক্রিয়া দিন দিন বাড়বে বৈ কমবে না।'

সেনাপতি রেজনাল্ট এমন এক বাস্তবতার বিবরণ দিচ্ছিলেন, সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু আপাতত তারা তো খৃস্টানদের উপর বিশাল এক বিজয় অর্জন করেছেন এবং এ মুহূর্তে খৃস্টানদের একজন বড় মাপের কমান্ডার তাদের হাতে বন্দী আছে। আরো অনেক খৃস্টান তাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

নূরুদ্দীন জঙ্গী রেজনাল্ট ও অন্যান্য খৃস্টান বন্দীদেরকে কার্ক নিয়ে যান। সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গী থেকে বিদায় নিয়ে কায়রো ফিরে যান। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎই যে তার শেষ সাক্ষাৎ, সুলতান আইউবী তা কল্পনাও করেননি। নুরুদ্দীন জঙ্গী রেজনাল্টের ন্যায় মূল্যবান কয়েদীকে কঠিন শর্ত আদায় না করে মুক্ত করবেন না, এই আনন্দ নিয়েই তিনি কায়রো ফেরেন। জঙ্গীও মনে মনে পরিকল্পনা একটা স্থির করে রেখেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন।

১১৭৪ সালের শুরুর দিক। বাগদাদের একটি এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তাতে ছয়-সাতটি জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। রাজধানী বাগদাদের কিছু ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিকগণ এই ভূমিকম্পকে ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূকম্পন বলে অভিহিত করেছেন।

দেশের জনসাধারণের প্রতি নুরুদ্দীন জঙ্গীর এত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল যে, দূরে বসে দুর্গতদের সাহায্যের নির্দেশ না পাঠিয়ে তিনি স্বয়ং কার্ক ত্যাগ করে ছুটে যান। দুর্গত জনতার সেবা তিনি নিজ হাতে করতে চান। তিনি কার্ক থেকে রেজনাল্ট ও অন্য কয়েদীদের সঙ্গে করে নিয়ে যান।

নুরুদ্দীন জঙ্গী বাগদাদ পৌঁছে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দারুল খেলাফতের বাইরে সময় কাটাতে শুরু করেন তিনি। তিনি হৃদয়-মন দিয়ে দুর্গত মানুষদের সেবা-শুশ্রূষা করে যাচ্ছেন। যেখানে রাত হচ্ছে, সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। নিজের নিরাপত্তার কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। খাবার কোত্থেকে আসছে, রান্না কে করছে, তার প্রতি তিনি কোনই ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ দুর্গত সব মানুষের পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হয়। টানা ব্যস্ততা থেকে তিনি অবসর হন। ডাক্তারকে বললেন, আমার গলায় কিসের যেন একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু কণ্ঠনালীর জ্বালা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ডাক্তার নানাভাবে চিকিৎসা করেন; কিন্তু সুলতান জঙ্গীর অবস্থা খারাপ হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, এখন আর তিনি কথাই বলতে পারছেন না। অবশেষে ১১৭৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যান। হাসান বিন সাব্বাহর ফেদায়ী গোষ্ঠী খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুর সময় কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। সুলতান আইউবীর জন্য কোন পয়গামও রেখে যেতে পারেননি। সুলতান আইউবী যখন সংবাদ পান, ততক্ষণে জঙ্গীর দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

পরদিনই বাগদাদ থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে আসে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে মওসেল, হালব ও দামেস্কের আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান আইউবী এ সংবাদও পান যে, বাগদাদের আমীর-উজীরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গীর এগার বছর বয়সের পুত্র আল মালিকুস্ সালিহ্কে সালতানাতে ইসলামিয়ার খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সুলতান বুঝে ফেললেন, আমীরগণ এই নাবালক খলীফাকে কোন্ পথে পরিচালিত করবে এবং কোন্ কূপের পানি পান করাবে।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন–

'পাঁচ মাস আগে তুমি আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে যে, আক্রায় তোমার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে। তখনই আমার মন বলছিল এবং অনুভূত হচ্ছিল যে, এই বছরটা ইসলামী দুনিয়ার জন্য শুভ হবে না।... বস আলী! আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন। এখন থেকে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

দুর্যোগের ঘনঘটা

১১৭৪ সালের মে মাস। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করলেন এই মাসের কোন একদিন। এটি ইসলামের ইতিহাসের একটি অন্ধকার দিন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃতদেহকে এখনো গোসলও দেয়া হয়নি। তার আগেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বেশকিছু মানুষের চেহারা। এরা খৃস্টান নয়। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে যারা আনন্দিত হয়েছিল, তারা শুধু খৃস্টানই ছিল না, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় মুসলমানও ছিল, যাদের আনন্দ ছিল খৃস্টানদের অপেক্ষা বেশী। এরা মুসলিম রিয়াসত ও জমিদারির আমীর-শাসক। জঙ্গীর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র এরা সকলেই জঙ্গীর বাসভবনে ছুটে এসেছে। এসেছে জঙ্গীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। তাদের মধ্যে কতিপয়কে এমন অস্থির দেখাচ্ছিল, যেন তারা জঙ্গীর মৃত্যুতে শোকাহত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্থিরতা ছিল জঙ্গীকে দ্রুত সন্ধ্যার আগেই দাফন করার জন্য। তাদের তর সইছে না।

জঙ্গীর মৃত্যুতে তারা সকলেই সমবেত হয়েছে। এদিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু তাদের হৃদয় শতধা-বিভক্ত। একজন অপরজনকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। তাদের ধর্ম এক, আল্লাহ এক, রসূল এক, কুরআন এক, দুমশনও এক। কিন্তু অন্তর তাদের একটি থেকে অপরটি আলাদা। তাদের দৃষ্টান্ত কোন গাছের এমন কতগুলো ডালের ন্যায়, যেগুলো গাছ থেকে ভেঙ্গে আলাদা হয়ে পড়ে গছে।

যুগটা ছিল মূলত নবাবী ও জামিদারীর। কিছু মুসলিম রিয়াসত সামান্য বিস্তৃত হলেও অন্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষদ্র। তাদের শাসকদেরকে 'আমীর' বলা হত। তারা ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীন। ইসলামের কোন দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে এই আমীরগণ খেলাফতকে আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দিত। কিন্তু এই সাহায্য শুধুমাত্র সাহায্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে কোন জাতীয় চেতনা ছিল না। তারা জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য খেলাফতের দাবি পূরণ করত। আবার সেই একই লক্ষ্যে ইসলামের একমাত্র দুশমন খৃস্টানদের সঙ্গে তলে তলে বন্ধুত্ব গড়ে তুলত। তাদের কেউ কেউ গোপনে খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তিও করে রেখেছিল। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর অস্তিত্ব খৃস্টানদের অগ্রগতির পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধক ছিল। তিনি এই মুসলিম আমীরদেরকে বহুবার সতর্কও করেছিলেন।

তাদেরকে একথা বুঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যে, খৃস্টানরা তোমাদেরকে ইসলামী ঐক্য থেকে সরিয়ে নিয়ে হজম করে ফেলবে। কিন্তু খৃস্টানদের পরিবেশিত ইউরোপীয় মদ, সুন্দরী নারী আর চকচকে সোনার টুকরোর মধ্যে এতই শক্তি ছিল যে, এগুলো তাদের কানে তুলা ও বিবেকে অর্গল এঁটে দিয়েছিল। জঙ্গীর আহ্বান পাথরের সঙ্গে টক্কর খেয়ে ফিরেই আসে শুধু।

তাদের প্রথম পরিচয় তারা জমিদার জায়গীরদার, নবাব, আমীর ও হাকেম। ধর্মের প্রশ্ন দেখা দিলে পরে মুসলমান। মুসলমান পরিচয়টা ছিল তাদের তৃতীয় এবং গৌন। তাদের ধর্ম পরিচয় যদিও ছিল, ছিল তা ক্ষমতা আর জায়গীরদারীর জন্য। এটাই তাদের ঈমান। তারা ইসলামী ঐক্যের কথা ভাবত না। তারা যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। কেননা, তাদের আশংকা ছিল, খৃস্টানরা তাদের জায়গীরদারী কেড়ে নেবে। তাদের মনে এই ভয়ও ছিল যে, তাদের প্রজারা যদি দুশমনের পরিচয় পেয়ে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ঈমানী শক্তি জেগে উঠবে। তারা তাদের নবাবীর জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে। বস্তুত প্রজারা তাদের জন্য স্বতন্ত্র এক হুমকিই ছিল। তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ছিল বিদ্যমান। জঙ্গীর বাহিনী তাদেরই ভাই-বন্ধু ছিল। জঙ্গীর মুজাহিদরা নিজেদের অপেক্ষা দশগুণ বেশী সৈন্যের মোকাবেলা করেছে। এ ছিল চেতনার ফল। এই চেতনা দু'চোখে সহ্য করতে পারত না আমীরগণ। তাই নুরুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন তাদের অপ্রিয়। আর সালাহুদ্দীন আইউবীকেও তারা দুশমন ভাবত। এখন জঙ্গী মারা গেছেন। তারা আনন্দিত। তারা মনে করত, এই জগত দ্বিতীয় আর কোন জঙ্গীর জন্ম দেবে না। জঙ্গীর সঙ্গে জিহাদও দাফন হয়ে যাবে।

জঙ্গীকে দাফন করা হয়েছে। খৃস্টানদের মনে মুসলমানদের যে ভীতি ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। এখন আর একটি কাঁটা অবশিষ্ট আছে, সে হল সুলতান আইউবী। কিন্তু এ কাঁটা নিয়ে তাদের তেমন কোন ভাবনা নেই। সুলতান আইউবী এখন নিঃসঙ্গ। তাকে সাহায্যদাতা জঙ্গী মারা গেছেন। খৃস্টানদের বড় আনন্দ এই জন্য যে, জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাদের অনুগত আমীর-উজীরগণ জঙ্গীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র আল মালিকুস সালিহকে সিংহাসনে বসিয়েছে। বয়স তার এগার বছর। খেলাফতের মূল সিংহাসন এখন খৃস্টানদের হাতে।

খৃস্টানদের অনুগত আমীরদের মধ্যে একজন হলেন গোমস্তগীন। একজন মওসেলের গবর্নর সাইফুদ্দীন। একজন দামেস্কের শাসক শামসুদ্দীন ইবনে আবদুল মালেক। আল জাজীরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজত্ব নুরুদ্দীন জঙ্গীর ভাতিজার হাতে। তাছাড়া আরো কয়েকজন জায়গীরদার আছেন। তারা সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তারা সকলেই আনন্দিত। কিন্তু এই বুঝ

তাদের নেই যে, বালি-কণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন তারা খৃস্টানদের সহজ শিকারে পরিণত।

জঙ্গীর মৃত্যুতে ইসলামী দুনিয়ার যে ক্ষতি হয়েছে, জঙ্গীর স্ত্রী তা অনুধাবন করতে পেরেছেন। উপলব্ধি করেছেন সুলতান আইউবীও। আর বুঝেছে তারা, যাদের অন্তরে ইসলামের মর্যাদা জাগ্রত ছিল।

❁ ❁ ❁

নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর বেশ ক'দিন পর। সুলতান আইউবী নিজ কক্ষে পায়চারী করছেন। কক্ষে বসে কথা বলছেন মোস্তফা জুদাত।

মোস্তফা জুদাত একজন ঊর্ধ্বতন তুর্কী সেনা অফিসার। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে তিনি মিনজানীকের কমান্ডার ছিলেন। জঙ্গীর ওফাতের পর ইসলামী দুনিয়ায় তিনি যে ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, তা তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। তিনি এই বলে ছুটি নিয়ে এসেছেন যে, বাড়ি গিয়েছি কয়েক বছর হয়ে গেল; এবার একটু বাড়ি যাওয়া দরকার। দামেস্ক থেকে রওনা হয়ে তিনি কায়রোতে সুলতান আইউবীর নিকট চলে আসেন। মোস্তফা জুদাত সেই অফিসারদের একজন, যারা আগে মুসলমান পরে অফিসার। তিনি জানতেন, নুরুদ্দীন জঙ্গীর পর সুলতান আইউবীই ইসলামের মর্যাদা সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম এবং করবেনও। তার আশংকা ছিল, সুলতান আইউবী এদিককার খবর হয়ত জানেন না, তাই তাকে তিনি দামেস্কের কারগুজারী শুনাতে এসেছেন।

'.. আর ফৌজ কি অবস্থায় আছে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'মহামান্য জঙ্গী ফৌজের মধ্যে যে জযবা সৃষ্টি করেছিলেন, তা অটুট আছে'– মোস্তফা জুদাত জবাব দেন– 'কিন্তু এই জযবা বেশীক্ষণ টিকবে না। আপনি জানেন, খৃস্টানদের সয়লাব শুধু সেনাবাহিনীই রোধ করে রেখেছে। মাননীয় জঙ্গীর জীবদ্দশায় কার্যত সেনাবাহিনীই দেশ শাসন করত। যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীরই হাতে ছিল। কিন্তু সেই পদক্ষেপ ছিল খেলাফতের অপছন্দনীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। এখন আমরা খেলাফতের অনুগত। আমরা এখন নিজেদের মত করে কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। খলীফা যদি কোন যুদ্ধ পরিকল্পনা হাতে না নেন, তাহলে সেনাবাহিনীর কিছুই করার নেই। জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে লড়াই করার ও জীবন দেয়ার মত আত্মমর্যাদাবোধ মুসলিম আমীরদের মধ্যে নেই। আমীরদের জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনাবোধ খৃস্টানরা ক্রয় করে নিয়েছে। এবার তারা আমাদের সেনাপতিদের ক্রয় করার অভিযানে নেমেছে। তাদের এই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ফৌজ ও জনগণ উভয় ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেছে। এই অপতৎপরতা যদি অতিদ্রুত

প্রতিহত করা না যায়, তাহলে খৃস্টানরা যুদ্ধ ছাড়াই সালতানাত ইসলামিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমাদের সালতানাতে ইসলামী জায়গীর-জমিদারীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমীরদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়। তারা মদে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। খৃস্টানরা ওখানে নারীর ফাঁদ ছড়িয়ে দিয়েছে। আপনি শুনে অবাক্ হবেন যে, এই মেয়েরা আমাদের আমীরদের হেরেমে অবস্থান করছে। তারা হেরেমে বিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সেনাঅফিসারদের নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে বেহায়াপনার ফাঁদে আটক করছে।

'আর আমি জানি তারপর কী হবে'- সুলতান আইউবী বললেন- 'আমাদের সৈন্যদেরকে অপকর্মে অভ্যস্ত করা হবে।'

'অভ্যস্ত করা হচ্ছেও'- মোস্তফা জুদাত বললেন- 'আর হাশীশীরাও তাদের তৎপরতা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। এখন হবে কি জানেন? আমাদের যে সালার বা নায়েব সালার মন থেকে খৃস্টানদের দুশমনী ঝেড়ে না ফেলবে এবং জিহাদের পক্ষে কাজ করবে, তাদেরকে হাশীশীদের পেশাদার ঘাতকদের দিয়ে রহস্যময় উপায়ে হত্যা করা হবে।'

কোন্ আমীর কী করছেন, মোস্তফা জুদাত সুলতান আইউবীকে তার বিস্তারিত বিবরণও প্রদান করেন। তার সারাংশ হল, নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী আমীরগণ একে অপরকে দুশমন ভাবতে শুরু করেছেন। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদের এই কপটতা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

'আপনি আমাকে ওখানকার পরিস্থিতি জানাতে এসে ভালই করেছেন'- সুলতান আইউবী বললেন- 'আপনি না আসলে আমি এতকিছু জানতাম না। তবে আমার এতটুকু অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, এগার বছরের বালককে খলীফা নিযুক্ত করে মানুষ কী করতে চায়।'

'আর আপনি কী করতে চান?'- মোস্তফা জুদাত জিজ্ঞেস করেন- 'আপনি যদি অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে মনে করুন সালতানাতে ইসলামিয়ার সূর্য ডুবে গেছে। আর আপনার পদক্ষেপ হওয়া উচিত শুধুই যুদ্ধ।'

'আহ! সেই দিনটিও আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হল যে, আজ আমাকে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার কথা ভাবতে হচ্ছে'- দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবী বললেন- 'আমি আশংকা করছি, আমার মৃত্যুর পর গাদ্দাররা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করবে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী ছিল।'

'কিন্তু আপনি যদি এই ভয়ে কায়রো বসে থাকেন, তাহলে ইতিহাস আপনার পথে এই লজ্জাজনক অভিযোগ আরোপ করবে যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুবরণ করার পর সালাহুদ্দীন আইউবীরও দম বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি মিসরের কজা অটুট রাখার জন্য সালতানাতে ইসলামিয়াকে কুরবান করে দিয়েছিলেন।'

'তা ঠিক'– সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'এই অভিযোগ বেশী অপমানজনক। আমি সবদিকেই চিন্তা করেছি মোস্তফা! শোন, আমি যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য বের হই, তাহলে আমি দেখব না আমার ঘোড়ার পদতলে কে পিষ্ট হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে সেই কালেমাগো মানুষগুলো কাফেরদের চেয়েও বেশী ঘৃণ্য, যারা কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে...।'

'আপনি ফিরে যান। আমি আলী বিন সুফিয়ানকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি গেছেন গোয়েন্দাবেশে। ওখানকার কেউ টের পাবে না যে, আলী বিন সুফিয়ান তাদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে এবং পরিসংখ্যান নিচ্ছে যে, এখানে কোন্ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আপনি গিয়ে দেখুন, কোন্ কোন্ সালার সন্দেহভাজন। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে আরো অনেক লোক গেছে। ওখানে তাদের করণীয় কী, তা তারাই ভাল জানে। পাশাপাশি আমি আমীরদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়ার আহ্বান সম্বলিত বার্তা দিয়ে দূতও প্রেরণ করেছি। তারা আমার পয়গাম বুঝবার চেষ্টা করবে, সেই আশা আমি করি না। আমি শুধু তাদেরকে সোজা পথটা শেষবারের মত দেখিয়ে দিতে চাই। আমি তাদেরকে একথা বলব না, তারা যদি আমার নির্দেশমত কাজ না করে, তাহলে আমি কী করব।'

মোস্তফা জুদাত বিদায় নিয়ে যান। সুলতান আইউবী দারোয়ান ডাকেন। দারোয়ান আসলে তিনি কয়েকজন সালার ও প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এদেরকে জলদি আমার কাছে আসতে বল।'

এরা সকলেই সুলতান আইউবীর হাইকমান্ডের সদস্য।

❁ ❁ ❁

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আল্লাহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে কঠিন হৃদয় দান করেছেন। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে এত শক্ত করে তৈরি করেছিলেন যে, পাহাড় সমান বেদনাও তিনি হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী ও স্বতন্ত্র্য মেজাজের অধিকারী। আমীর-গোলাম সকলকে তিনি সমান মর্যাদা প্রদান করতেন। একজনের উপর আরেকজনকে প্রাধান্য দিতেন বীরত্ব ও বাহাদুরীর ভিত্তিতে। যারা তাঁর কাছে ঘেঁষত, তারা তাঁর থেকে দু'রকম প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করত। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভালবাসা। তাঁর সৈনিকরা যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে

দেখলে এতই উজ্জীবিত হয়ে উঠত যে, তারা শত্রুর উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার তাঁর এক খাদেম অপর খাদেমের গায়ে জুতা নিক্ষেপ করে। তিনি তখন কক্ষ থেকে বের হচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে জুতাটি এসে তার গায়ে পড়ে। খাদেমরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান, যেন কিছুই হয়নি। এ ছিল তার চরিত্র মাধুরী। বন্ধু তো ভাল, শত্রুও তার সম্মুখে উপস্থিত হলে তার ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়ে যেত।'

'নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু সালতানাতে ইসলামিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। সেই সমস্যার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দিক ছিল, মুসলমানদের নিজেদেরই আমীর-উজীরগণ খৃস্টানদের বন্ধু ও ইসলামের দুশমনে পরিণত হয়েছিল।

মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো মিসর থেকে বের হতে পারছেন না। এমনি পরিস্থিতিতে তার সাধ্য এতটুকুই ছিল যে, তিনি সালতানাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু মিসরের প্রতিরক্ষাকে অটুট রাখবেন। তার চেয়ে বেশী কিছু করার সাধ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি বিন্দু পরিমাণ ঘাবড়ালেন না। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমি যদি ইসলামের সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেই, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে খৃস্টানদের সঙ্গে হাশর করা হবে'। তিনি ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারকে তাঁর জীবনে সবচে বড় কাজ মনে করতেন। তিনি কখনো নিজেকে শাসক ভাবেননি। সালাহুদ্দীন আইউবীর যৌবনকালের কথা আমার স্মরণ আছে। যৌবনে তিনি পূর্ণরূপে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি মদপান করতেন, নাচ-গানের আসর বসাতেন। বাদ্য-বাজনা ও নাচের খুঁটিনাটি বুঝতেন। আরো দশজন বিপথগামী যুবক যা করে থাকে, তিনি তার কোনটিই বাদ দিতেন না। কেউ কখনো কল্পনাও করেনি যে, এই যুবক অল্প ক'বছরেই ইসলামের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ও ইসলামের দুশমনের যমদূতে পরিণত হবেন। চাচার সঙ্গে প্রথমবারের মত খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে এসেই তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি সর্বপ্রথম বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেন এবং নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য কুরবান করে দিলেন। তিনি দেশের জনগণ ও সৈন্যদেরকে শিক্ষা দেন যে, ইসলামের কোন সীমানা-সরহদ নেই...।'

তার এই পরিবর্তিত চরিত্র দেখে কারো বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে, একসময় তিনি বিলাসী ছিলেন। প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখারই নাম চরিত্রের

উঁচুতা ও আদর্শের পরিপক্কতা। এই পরিপক্কতা সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে ছিল। বন্ধুদের আসরে তিনি বলতেন, আমাকে কাফেররা মুসলমান বানিয়েছে। আমরা যদি আমাদের বিপথগামী যুবকদেরকে খৃস্টানদের মন-মানসিকতা বুঝাতে পারি, তাহলে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে। দুশমনের সঙ্গে যে বন্ধুত্বের দীক্ষা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, তা তাদেরকে জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। আমি আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবীজী (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে চিনে নাও যে, তোমরা কী এবং কারা। আর দুশমনকেও ভাল করে চিনে নাও যে, তারা কারা এবং তাদের লক্ষ্য কী।' সালাহুদ্দীন আইউবীর চরিত্র ও আদর্শের মোড় দুশমনই পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি নিজ কাজে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, কখনো ভাববারই সময় পাননি, তিনি ইসলামী দুনিয়ার বড় মাপের একজন নেতা, মিসরের প্রতাপান্বিত শাসক এবং এমন একজন বীরযোদ্ধা যে, খৃস্টানদের বড় বড় কমান্ডাররা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরও তার ভয়ে তটস্থ থাকছে। তার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি অর্থাভাবে জীবনে কখনো হজ্ব করতে পারেননি। জীবনের শেষ মুহূর্তে তার একটিই বাসনা ছিল- হজ্ব করা। কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ দেরহাম রূপা ও একখণ্ড সোনা। সম্পদ বলতে ছিল একটি ঘর, তা-ও পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত।'

তার চারিত্রিক পরিপক্কতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, তিনি যখন তাঁর সালার প্রমুখকে বৈঠকের তলব করলেন, তখন তাঁর চেহারায় ভীতি বা পেরেশানীর লেশমাত্র ছিল না। উপস্থিত পারিষদবর্গ নীরব-নিস্তব্ধ। তাদের ধারণা ছিল, এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু না, তিনি মুচকি হেসে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, আমার বন্ধুগণ! তোমরা অত্যন্ত কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতেও আমার সঙ্গ দিয়েছ। আজ এমন এক পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবার মত নয়। কিন্তু স্মরণ রেখ, তারপরও যদি আমরা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তা হবে আমাদের জন্য দুনিয়াতেও অপমান, আল্লাহর দরবারেও অপমান। ইতিহাস আমাদের উপর অভিশম্পাত করবে এবং কিয়ামতের দিন সেই শহীদগণ আমাদেরকে লজ্জা দেবে, যারা ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন কুরবান করেছে। এখন আমাদের প্রত্যেককে জীবন কুরবান করার সময় এসেছে।'

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সুলতান আইউবী তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং বললেন, 'আমাদেরকে এখন আমাদের

ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

এই বলে তিনি সকলের চেহারা নিরিক্ষণ করেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। সকলের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুলতান নিশ্চিত বুঝে নেন যে, হ্যাঁ, আমার এই কর্মকর্তাগণ যে কোন পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গ দেবে। তিনি বললেন, আমার প্রথম পদক্ষেপ হল, আমি আমার স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে যাচ্ছি। আমি আর কেন্দ্রীয় খেলাফতের অনুগত থাকতে চাই না। কিন্তু এই ঘোষণা আমি তোমাদের প্রত্যেকের সম্মতি ছাড়া করব না। এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে তোমরা আরো দু'টি বিষয় নিয়ে ভেবে দেখ। প্রথমত, খেলাফত কার্যত শেষ হয়ে গেছে। তোমরাই বলেছ যে, খলীফা এখন এগার বছরের বালক, তিন-চারজন আমীর তাকে ঘিরে রেখেছে। আর এই আমীরগণ খৃস্টানদের বন্ধু। কাজেই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, খেলাফত এখন খৃস্টানদের মুঠোয়। তাই এবার আমাদের সংঘাত হবে খেলাফতের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি স্বাধীন না হও, তাহলে তোমাদের খলীফাকে মান্য করতে হবে আর এই মান্যতা হবে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক। তোমরাই বল, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এই পদক্ষেপ কি সঠিক হবে না যে, আমি মিসরের খেলাফতকে কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে স্বাধীন করে ফেলব এবং তারপর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে স্বাধীন, যা এখন ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যক?'

'তাহলে কি আপনি খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে চান?' এক সালার জিজ্ঞেস করেন।

'এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি'– সুলতান আইউবী জবাব দেন– 'কাল-পরশু পর্যন্ত আমার দূত ফিরে আসবে। পরিস্থিতি যদি আমাকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য করে, তাহলে আমি কুণ্ঠিত হব না।'

'আপনি মিসরকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে দিন'– এক কর্মকর্তা বলল– 'আমরা এগার বছরের বালককে খলীফা মানতে পারি না।'

'তো তোমরা কি সকলে আমাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেবে?' সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

সর্বান্তকরণে উপস্থিত সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমরা আপনাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেব। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তখনই মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর থেকেই সালাহুদ্দীন আইউবী 'সুলতান' অভিধায় ভূষিত হন।

'আমি রাসূলের উম্মতের নয়– রনাঙ্গনের বাদশাহ'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা তো দেখেছ, আমি খৃস্টান সৈন্যদের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা

করে থাকি। আমি দশ দশজন জানবাজ দিয়ে দশ দশ হাজার দুশমন সৈন্যকে পরাভূত করেছি। কিন্তু যখন আমি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবি, তখন আমার সব রণকৌশল মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়, আমার তরবারী তখন কোষ থেকে বেরুতে চায় না। দুর্ভাগ্য, আমাকে ও তোমাদেরকে সেই দিনটিও প্রত্যক্ষ করতে হল যে আমরা পরস্পর লড়াই করব আর খৃস্টানরা বসে বসে তামাশা দেখবে!'

'এই তামাশা আমাদের দেখাতেই হবে মহামান্য সুলতান!'– এক সালার বলল– 'মুখের ভাষা যদি আমাদের ভাইদের উপর ক্রিয়া না করে, তাহলে তরবারী ব্যবহার করতেই হবে। আমাদের কারো মধ্যে খেলাফতের গদির মোহ নেই। আমরা যা কিছু করব, ইসলামের খাতিরেই করব– ব্যক্তি স্বার্থে নয়।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী ইতিপূর্বে দামেস্ক, হাল্‌ব, মওসেল এবং আরো দু'তিনটি রিয়াসতের আমীরদের নিকট দু'জন দূত প্রেরণ করেছিলেন। সকলের নিকট তিনি দীর্ঘ পয়গাম প্রেরণ করেছেন। তাতে তাদের প্রত্যেককে খৃস্টীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামী ঐক্যের পক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূতদ্বয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। একজন আমীরও সুলতানের পয়গাম গ্রহণ করেননি, বরং অনেকে বিদ্রেপের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দূতগণ সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা প্রথমে খলীফার দরবারে গমন করি। পয়গাম পেশ করলে তা খলীফা নিজে পাঠ না করে তাকে ঘিরে রাখা আমীরদের পড়তে দেন। এই আমীরগণই তাকে খেলাফতের গদিতে বসিয়েছে। তারা আপনার পয়গাম পাঠ করে পরস্পর ফিসফিস করতে থাকে। একজন খলীফাকে বললেন, সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা দেখিয়ে সকল মুসলিম রিয়াসতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজেই হবেন সেই রাজ্যের অধিপতি। আরেকজন মুখ খুললেন। তিনিও এগার বছর বয়সী খলীফাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিলেন এবং বললেন, 'আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, যুদ্ধ করা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক একমাত্র খলীফা। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি খলীফার আদেশ অমান্য করেন, তাহলে আপনি তাকে বরখাস্ত করতে পারেন; মিসরের নেতৃত্ব অন্য কাউকে দিতে পারেন।'

বালক খলীফা আমাদেরকে এই নির্দেশই প্রদান করেন এবং বললেন, 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, সে যেন আমার নির্দেশের অপেক্ষা করে। ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজন আছে কিনা, আমিই তার সিদ্ধান্ত জানাব।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যে ফৌজ আছে, তন্মধ্যে মরহুম জঙ্গীর প্রেরিত অনেক বাহিনীও আছে– এক আমীর খলীফাকে বললেন– 'আপনি তাকে নির্দেশ প্রেরণ করুন, যেন তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নিজের মর্জিমত ফৌজ ব্যবহার করার সুযোগ তার থাকা উচিত নয়।'

'তাকে আরো বলবে, খেলাফতের পক্ষ থেকে যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে যেন ফেরত পাঠায়'– দূতদের উদ্দেশে খলীফা বললেন– 'আর তোমরা এবার যেতে পার।'

'আইউবীকে আরো বলবে, ভবিষ্যতে যেন তিনি খলীফাকে এরূপ পয়গাম পাঠানোর দুঃসাহাস না দেখান।' অন্য এক আমীর বললেন।

দূতরা সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা অন্যান্য আমীরদের নিকটও গমন করি। সবাই অবজ্ঞার সাথে আপনার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তিও করে।

রিপোর্টে সুলতান আইউবীর চেহারায় কোন পরিবর্তন আসল না, যেন তিনি এরূপই হওয়ার আশা করছিলেন। তিনি মূলত আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছিলেন। গোয়েন্দা প্রধান আলী একশত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক চলে গেছেন। গিয়েছেন বণিক ও বণিক কাফেলার বেশে। সুলতান এখনো তার কোন সংবাদ পাননি। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পরপর-ই সুলতান আইউবী সংবাদ পেয়ে যান যে, বিভিন্ন রিয়াসতের আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। সংবাদটা পেয়েছেন স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর মাধ্যমে, যিনি বর্তমান খলীফার মা। তিনি অতি সঙ্গপনে একজন দূত কায়রো পাঠিয়ে দেন এবং সুলতান আইউবীকে জঙ্গীর মৃত্যুর পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি সুলতান আইউবীকে বলে পাঠান–

'ইসলামের ইজ্জত এখন আপনার হাতে। আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। মানুষ আমাকে সম্মান করতে শুরু করেছে। কেননা, আমি খলীফার মা। তারা মনে করছে, আমি সৌভাগ্যশীল মা। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্রকে খলীফা বানানো হয়নি– তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। মওসেলের আমীর সাইফুদ্দীন ও অন্যসব আমীর আমার পুত্রের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আমার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্ররাও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। তারপরও এই আমীরদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকত, তাহলে আমি এতটুকু বিচলিত হতাম না। প্রকৃতপক্ষে তারা একে অপরের দুশমন। আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি নিজ হাতে পুত্রকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু তার পরিণতিকে আমি ভয় করি। ভাল হবে, আপনি এসে পড় ন। কিভাবে আসবেন, এসে কী করবেন, তা

আপনিই ভাল জানেন। আমি আপনাকে সতর্ক করতে চাই যে, আপনি যদি এদিকে দৃষ্টি না দেন কিংবা যদি বিলম্ব করে ফেলেন, তাহলে প্রথম কেবলা তো খৃস্টানদের কব্জায় আছেই, পবিত্র কাবাও তাদের হাতে চলে যাবে। সেই লাখো শহীদের খুন কি বৃথা যাবে, যারা জঙ্গী ও আপনার নেতৃত্বে জীবন কুরবান করেছে? আপনি হয়ত আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার পুত্রকে আমি কেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না? তার জবাব আমি দিয়েছি। আমীরগণ আমার পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর একবার মাত্র সে আমার কাছে এসেছে। এখন তাকে আমার পুত্র মনে হয় না। বোধ হয় তাকে হাশীশ খাওয়ানো হয়েছে। সে ভুলে গেছে, আমি তার মা। ভাই সালাহুদ্দীন! আপনি জলদি এসে পড় ন; দামেস্কের জনগণ আপনাকে স্বাগত জানাবে। আমার এই দূতের নিকটই জবাব দিন, আপনি কী করবেন কিংবা কিছুই করবেন কিনা!'

সুলতান আইউবী তখনই জবাব দিয়ে দূতকে বিদায় করে দেন। তিনি জঙ্গীর স্ত্রীকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমি অতিশয় কঠোর পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছি। কিন্তু পা ফেলব বুঝে-শুনে।

দূত রওনা হওয়ার পরপর সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে দামেস্ক, মওসেল, হাল্‌ব, ইয়েমেন ও অন্যসব ইসলামী অঞ্চলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন। আলী বিন সুফিয়ানের এ সফর কোন সরকারী সফর ছিল না। তিনি গুপ্তচরের বেশে এলাকাগুলোতে চলে যান। তার দায়িত্ব হল, যেসব মুসলিম আমীর একনায়কত্ব ঘোষণা করেছে, তারা কী চায়, খৃস্টানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কি-না, খলীফার বাহিনীর মতিগতি কেমন, এই বাহিনীকে খলীফার এমন সব নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণের জন্য প্রস্তুত করা যায় কি-না, যা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর, দুশমনের জন্য লাভজনক। আলী বিন সুফিয়ানের এ-ও জানার বিষয় ছিল যে, ও-সব এলাকার জনগণের মতিগতি ও চিন্তাধারা কী এবং ফেদায়ীরাও খলীফার সঙ্গে মিশে গেছে কি-না। তাকে এ ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যে,সুলতান আইউবী দামেস্ক কিংবা অন্য কোন মুসলিম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে।

সুলতান আইউবী অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েন না। কোথাও যেতে হলে বা অভিযান পরিচালনা করতে হলে আগে গোয়েন্দা মারফত সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি, সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে আগে তথ্য-পরিসংখ্যান জেনে নেন। এখানেই ছিল তার সাফল্য। সুলতান জঙ্গীর মৃত্যুর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য একই ধারায় তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে প্রেরণ করেন। আলী বিন সুফিয়ান রিপোর্ট নিয়ে আসবেন,

তারপর তিনি সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এখন অপেক্ষা শুধু আলী বিন সুফিয়ান কবে ফিরবেন।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবীর নির্দেশ প্রাপ্তির পর আলী বিন সুফিয়ান এক মুহূর্ত নষ্ট না করে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাছাই করে ফেলেন। তিনি তাদেরকে মিশন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন, ইসলামের আব্রু-ইজ্জত তোমাদের থেকে বিরাট কুরবানী তলব করছে। এই মিশনে তোমাদেরকে পূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে।

এই একশ' গোয়েন্দাকে বণিকের পোশাক পরানো হয়। আলী বিন সুফিয়ান কাফেলার সরদার সাজেন। তারা কতগুলো উটের পিঠে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বোঝাই করে। দামেস্ক ইত্যাদির বাজারে নিয়ে এগুলো বিক্রি করা হবে এবং তৎপরিবর্তে অন্য মাল ক্রয় করা হবে। বেশকিছু উট ছাড়াও তাদের সঙ্গে আছে কয়েকটি ঘোড়া। বাণিজ্যিক পণ্যের অভ্যন্তরে তারা তরবারী, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। তন্মধ্যে আছে দাহ্যপদার্থ ও আগুন জ্বালানোর অন্যান্য বস্তু। আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা রাতের বেলা কায়রো থেকে রওনা হয় এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বহুদূর এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর কাফেলা আবার রওনা হয়। আলী বিন সুফিয়ান যথাশীঘ্রই গন্তব্যে পৌঁছুতে চাচ্ছেন।

কাফেলা দিনভর চলতে থাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও কাফেলা কোথাও থামেনি। রাত গভীর হতে চলেছে। এবার একটি উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উঁচু-নীচু টিলা আছে এখানে। আছে পানিও। বিশ্রাম ও পানির জন্য কাফেলা থেমে যায়।

লোকগুলো আসলে বণিক নয়– সৈনিক। তাদের চাল-চলনে শৃঙ্খলা আছে। আছে সতকর্তা। তাদের উট-ঘোড়াগুলো এমনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে, মানুষগুলোর ন্যায় ওরাও সুশৃঙ্খল। কারো মুখে টু-শব্দ নেই। না মানুষের মুখে, না পশুগুলোর মুখে। আলী বিন সুফিয়ান টিলা ও পর্বতের অভ্যন্তরে ঢুকে না গিয়ে বাইরেই ছাউনী ফেলেন। দু'ব্যক্তিকে পানির সন্ধানে প্রেরণ করা হয়। এখন সবারই হাতে অস্ত্র। কারণ, এই সফরে দু'টি ভয় রয়েছে। এক. মরুদস্যুর ভয়, দুই. খৃস্টান কমান্ডোদের ভয়।

পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে লোক দু'জন। পানির সন্ধান ছাড়াও তাদের দেখতে হবে, এখানে দুশমনের কোন কমান্ডো কিংবা কোন টহল বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে কিনা। তারা কিছুদূর চলে যায়। একস্থানে আলোর মত কিছু একটা দেখতে পায়। চলে যায় আরো সম্মুখে। একটি টিলার

উপরে উঠে যায়। এখানে মাঠের ন্যায় মনোরম একটি জায়গা। পানি আছে। সবুজ-শ্যামল এলাকা। আছে খেজুর বাগানও। দু'টি প্রদীপ জ্বলছে এখানে। সেই প্রদীপের আলোতে দশ-এগারজন মানুষ চোখে পড়ে তাদের। ছয়-সাতজন পুরুষ। অন্যরা নারী। মেয়েগুলো অতিশয় সুন্দরী। তারা আগুন জ্বালিয়ে গোশত ভুনা করছে আর পেয়ালায় করে কি যেন পান করছে। বোধ হয় মদ। খানিকটা আড়ালে একটি ঘোড়া ও কয়েকটি উট বাঁধা। অনেকগুলো সামানও একদিকে পড়ে আছে।

আলী বিন সুফিয়ানের লোক দু'জন লুকিয়ে লুকিয়ে নিকটে চলে যায়। রাতের নীরবতায় তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তাদের হাসি-কৌতুক প্রমাণ করছে, তারা মুসলমান নয়। মেয়েগুলো অশ্লীল আচরণ করছে।

লোক দু'জন ফিরে এসে আলীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। এবার আলী বিন সুফিয়ান নিজে যান। লুকিয়ে লুকিয়ে কাছে থেকে দেখেন। আলী লোকগুলোর ভাষা বুঝতে পারছেন না। ওরা খৃস্টান। আলী বিন সুফিয়ান ভাবছেন, তিনি তাদের নিকটে চলে যাবেন এবং জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন, তারা কারা, কোথায় যাচ্ছে। আবার ভাবছেন, গিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি। তার সঙ্গে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা আছে। এই ছয়-সাতজন পুরুষ আর চারটি মেয়েকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

লোকগুলোকে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে দেখছেন আলী বিন সুফিয়ান। তার মনে সন্দেহ জাগে, তারা খৃস্টান গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী এবং কোন ইসলামী ভূখন্ডে অভিযানে যাচ্ছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে আলীকে তাদেরই তো প্রয়োজন।

আরো নিকটে যাওয়ার জন্য তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। চলে যান টিলার একেবারে শেষপ্রান্তে। এখান থেকে চোখ পড়ে তার নীচে। আরো দু'জন লোক দেখতে পান তিনি। তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা টিলার আড়াল থেকে ঐ লোকগুলোর প্রতি বারবার তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা মরুদস্যু। ওদের দৃষ্টি মেয়েগুলোর প্রতি।

লোকগুলো আস্তে আস্তে পেছন দিকে সরে যায়। পরস্পর কথা বলে। আলী বিন সুফিয়ান তাদের কথা শুনতে পান, বুঝতেও পারেন। আলীর ভাষায়-ই কথা বলছে তারা।

'ওদের কাছে কি অস্ত্র আছে?' এক দস্যু জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আছে'- অপরজন বলল- 'আমি দেখেছি। তাদের তরবারী সরু। তারা খৃস্টান।

'তারা সাধারণ মুসাফির বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক, আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমরা তো আটজন; ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমরা ওদেরকে ধরে ফেলতে পারব।'

'ধরার প্রয়োজন কি। পুরুষদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে ফেলব আর মেয়েগুলোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাব।'

তারা সঙ্গীদের ডেকে আনতে চলে যায়। আলী বিন সুফিয়ান লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করেন। তারা অন্য একটি পথে বের হয়ে যায়। ওখানে তাদের ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ায় আরোহন করে অন্ধকালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান ভাবেন কী করা যায়। লোকগুলোকে সাবধান করে দেবেন, নাকি নিজ কাফেলায় নিয়ে যাবেন। গভীর ভাবনা-চিন্তার পর তিনি একটি পন্থা উদ্ভাবন করেন। নিজ কাফেলার লোকদের নিকট ফিরে আসেন। জনাবিশেক লোককে বর্শাসজ্জিত করে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং কর্তব্য বুঝিয়ে দেন। নিজেও সতর্ক অবস্থায় এদিক-ওদিক টহল দিতে থাকেন। দস্যুরা কখন আসবে তিনি জানেন না। তিনি দেখতে পান যে, মেয়েরা ও তাদের সঙ্গের পুরুষরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাত্র একজন লোক বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। তাতে বুঝা গেল, লোকগুলো প্রশিক্ষিত। প্রদীপগুলো জ্বলছে।

রাতের শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসছে। পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসে। সবাই সতর্ক হয়ে যায়। মেয়েদের প্রহরীও বদল হয়। এবার পাহারা দিচ্ছে অন্যজন। দস্যুরা পার্বত্য এলাকার মাঝামাঝিতে এসে পড়েছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তার লোকেরা টিলার উপরে। খানিক পর আট-নয়জন দস্যু সেই স্থানে ঢুকে পড়ে, যেখানে তাদের শিকার ঘুমিয়ে আছে। প্রহরী ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। দস্যুরা তাদের চারপাশ ঘিরে ফেলে এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে। মেয়েদের সঙ্গী পুরুষরা জেগে ওঠে। কিন্তু দস্যুরা তাদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ না দিয়েই চিৎকার করে বলে, 'সব মাল-পত্র ও মেয়েগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দাও এবং নিজেদের প্রাণ বাঁচাও।' দু'জন দস্যু তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দেয়। লোকগুলো নিরস্ত্র। তারপরও দু'জন মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক। বীর বিক্রমে লড়ে যায় অনেকক্ষণ।

সংকেত দেন আলী বিন সুফিয়ান। বাজের ন্যায় ছুটে আসে তার লোকেরা। এরা কারা ডাকাত দল তা বুঝে ওঠার আগেই এক একটি বর্শা এক একজন দস্যুর দেহে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তার আগে দস্যুদের হাতে মেয়েদের সঙ্গের দু'জন লোক মারা পড়েছে। তবে এর জন্য আলী বিন সুফিয়ানের কোন দুঃখ নেই।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের কাছে চলে যান। মেয়েগুলো ভয়ে থর থর

করে কাঁপছে। তাদের সামনে এগারটি লাশ পড়ে আছে। দু'টি তাদের দু'সঙ্গী পুরুষের। নয়টি দস্যুদের। আলী বিন সুফিয়ান তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। আলীর প্রতি মেয়েরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ? তাদের জবাব শুনে সুলতান আইউবীর প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান আলী মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "তোমরাও যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতে, আমিও তোমাদেরকে এমন অসত্য জবাব-ই দিতাম। আমি তোমাদের প্রশংসা করছি যে, এমনি এক ভীতিপ্রদ অবস্থায়ও তোমরা নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছ।'

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'– আলী বিন সুফিয়ানকে পাল্টা প্রশ্ন করে একজন– 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'তোমরা যেখান থেকে এসেছ'– আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন– 'আর যাবও সেখানে, যেখানে তোমরা যাচ্ছ। আমাদের কাজ ভিন্ন; কিন্তু গন্তব্য এক।'

তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে। সবিস্ময়ে তাকায় আলীর প্রতি। আলীর মুখে মুচকি হাসির রেখা। তিনি বললেন, দেখেছ তো কেমন চাল খেলে দস্যুদের হত্যা করে ফেললাম। কোন সাধারণ পথিক-মুসাফির কি এমন চাল খেলতে পারে? আমি যে দক্ষতা প্রদর্শন করলাম, তাকি একজন সুশিক্ষিত সেনা কমান্ডারের ওস্তাদীকর্ম নয়?

'তুমি মুসলমান সৈনিকও হতে পার।' এক মেয়ে বলল।

'আমি ক্রুশের সৈনিক।' আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন।

'তুমি কি তোমার ক্রুশ দেখাতে পারবে?' প্রমাণ চায় মেয়েরা।

'তুমি পারবে আমাকে তোমার ক্রুশ দেখাতে?' আলী বিন সুফিয়ান পাল্টা প্রশ্ন করেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমি জানি, তোমরা একজনও ক্রুশ দেখাতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে ক্রুশ নেই। কারণ, তোমরা যে কাজে যাচ্ছ, সেখানে ক্রুশ সঙ্গে রাখা যায় না। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের নামও জিজ্ঞেস করব না, নিজের নামও বলব না। আর আমার মিশন কি তাও বলব না। শুধু এতটুকুই বলব যে, আমরা একই পথের পথিক। আর আমাদের কারুরই জানা নেই যে, আমাদের মধ্য থেকে কে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। যীশুখৃষ্ট যেভাবে আমাকে ও আমার লোকদেরকে তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন, তা প্রমাণ করে তোমরা সঠিক পথে আছ এবং তোমরা কামিয়াব হবে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে, সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুসলমানদের কোন্ আমীর এমন আছে, যে আমাদের জালে আটকা পড়েনি? আমি তোমাদের উপদেশ দেব, তোমরা দৃঢ়পদ থাক।'

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কাজ সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। খোদাওন্দ ঈসা মসীহ তোমাদের কুরবানীকে বিফল করবেন না। আমরা যারা পুরুষ, তারা জীবন বিলিয়ে দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু কেউ তোমাদের জীবন হরণ করে না– হরণ করে তোমাদের সম্ভ্রম। আর তোমাদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় কুরবানী।'

আলী বিন সুফিয়ান ঝানু অতিশয় সুদক্ষ গোয়েন্দা। মুখের ভাষা তার জাদুমাখা। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে তার কথাগুলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেন যে, তারা খৃস্টান এবং নাশকতামূলক কাজের উদ্দেশ্যে দামেস্কসহ আন্যান্য অঞ্চলে যাচ্ছে। তারা বণিকের বেশে।

আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টানদের গুপ্তচরবৃত্তির নিয়ম-নীতি, গোপন সংকেত ও পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে অবহিত। এ পর্যন্ত বহু খৃস্টান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে তিনি অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করেছেন। এবার যখন তিনি তাদের-ই পরিভাষায় কথা বলছেন, তখন মেয়েরা ও তাদের সঙ্গী পুরুষরা শুধু নিশ্চিতই হয়নি যে, তিনি খৃস্টান, বরং তাকে খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে বিশ্বাস করে নেয়। তিনি ওদেরকে অবহিত করলেন যে, আমার সঙ্গে একশ' লোক আছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধবাজ গোয়েন্দাও আছে। আছে ফেদায়ীও। আমরা দামেস্কসহ অন্যান্য এলাকায় মুসলমানদের সেসব উর্ধ্বতন অফিসারদের খুন কিংবা গুম করতে যাচ্ছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবীর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি তাদেরকে আরো জানালেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত মিসরে কাজ করেছি, এবার আমাকে ওদিকেই পাঠানো হয়েছে।

খৃস্টান দলটি আলী বিন সুফিয়ানের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে একটি সমস্যার কথা ব্যক্ত করে। সমস্যাটা হল, তাদের কমান্ডার দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছে। এরা যেসব এলাকায় যাচ্ছে, ঐসব এলাকায় সে আগে গিয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুতে এরা এখন দিশেহারা। এদেরক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন।

আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অসুবিধা হবে না, প্রয়োজনে আমি নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হলেও তোমাদের পথ-নির্দেশনা করব। তোমাদের মিশন কি আমাকে খুলে বল।

তারা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের মিশন খুলে বলে। তাদেরকে কয়েকজন মুসলিম সালারের নাম দিয়ে বলা হয়েছে, তাদের কাছে উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দেবে এবং প্রয়োজন অনুপাতে মেয়েদের ব্যবহার করবে। তাদের

এমন কতিপয় সালার ও আমীর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, যারা খৃস্টানদেরকে দুশমন মনে করে। তাদেরকে খৃস্টানদের বন্ধু বানাতে হবে।

'দেখ, এই স্তরে এসে তোমাদের ও আমার কাজ এক হয়ে যাচ্ছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমাকেও ঐসব সালার ও নেতাদের খতম করতে হবে, যারা অন্তর থেকে খৃস্টানদের দুশমনী দূর করছে না।.. আচ্ছা, তোমরা দামেস্কে কোথায় থাকবে?'

'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, আমরা বণিকের বেশে যাচ্ছি'– একজন জবাব দেয়– 'দামেস্কের নিকেট গিয়ে এই মেয়েরা পর্দানশীল মুসলিম নারীতে রূপান্তরিত হবে। আমরা সরাইখানায় অবস্থান নেব। ওখান থেকে বণিকের বেশ ধারণ করে সালার প্রমুখদের নিকট যাব।'

❁ ❁ ❁

পরদিন ভোরবেলা। আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে চলছে। খৃস্টান দলটিও এই কাফেলার শামিল হয়ে গেছে। পশুর মধ্যে ডাকাতদের ঘোড়াগুলো এখন অতিরিক্ত। খৃস্টান নারী-পুরুষরা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে তিনিও খৃস্টান। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না। কারণ, তাদের মধ্যে মুসলমানও আছে, যারা ফেদায়ী ও হাশীশী বটে, কিন্তু তাদের উপর ভরসা রাখা যায় না। পথে আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টানদেরকে নিজের সঙ্গে রাখেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। এই ফাঁকে তাঁর অনেক কাজের কথা জানা হয়ে গেছে।

পরদিন কাফেলা দামেস্ক প্রবেশ করে। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশ মোতাবেক কাফেলা সরাইখানায় অবস্থান নেয়ার পরিবর্তে একটি মাঠে তাঁবু স্থাপন করে। মাঠে মানুষের ভীড় জমে যায়। বাহির থেকে কোন বণিক কাফেলা আসলে এলাকার মানুষ এভাবেই ভীড় জমায়। তারা চেষ্টা করে, পণ্য বাজারে যাওয়ার আগেই সরাসরি কাফেলার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সংগ্রহ করতে।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোষণা করে দেন, দশটি ঘোড়াও বিক্রি হবে। এই ভীড়ের মধ্যে দামেস্কের ব্যবসায়ী-দোকানদাররাও আছে। দু'চার ঘন্টার মধ্যে লোক সমাগম এক মেলার রূপ ধারণ করে। আলী বিন সুফিয়ান তার লোকদেরকে বলে দেন, যেন তারা মালপত্র দ্রুত বিক্রি না করে আটকে রাখে। তিনি তার কয়েকজন বিচক্ষণ লোককে বলে দেন, তোমরা জনতার মধ্যে মিশে যাও এবং সুযোগমত তাদের মনমানসিকতা জেনে নাও। তারা পরিধানের চোগা খুলে ফেলে ছদ্মবেশে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দু'তিনজন চলে যায় শহরে।

আলী বিন সুফিয়ান ও তার সকল লোকজন মাগরিবের নামায বিভিন্ন মসজিদে আদায় করে নেয়। তিনি খৃস্টান দলটিকে তাঁবুতে রেখে যান। তারা মসজিদে স্থানীয় লোকদেরকে জানায়, আমরা ব্যবসায়ী, কায়রো থেকে এসেছি। গল্প-গুজবের মধ্যদিয়ে তারা লোকদের মনোভাব জেনে নেয়। লোকদের চিন্তাধারা ও চেতনা আশাব্যঞ্জক। কিছু লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত পাওয়া যায়। তারা নতুন খলীফা ও আমীরদের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের মধ্যে সমাজের উঁচু স্তরের লোকও আছে। অধিকাংশেরই বিশ্বাস, খৃস্টশক্তি ইসলামী দুনিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং খেলাফত বিলাসী আমীরদের হাতে চলে গেছে। তারা অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা বলে, জঙ্গীর পর এখন একমাত্র সালাহুদ্দীন আইউবীই অবশিষ্ট আছেন, যিনি ইসলামের নাম জীবিত রাখতে সক্ষম হবেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার লোকদেরকে বলে দিয়েছেন, এই নারী ও পুরুষগুলো খৃস্টান এবং তাদের নিকট এক কথাই প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা সবাই ক্রুশের মিশন নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি তাদের কোন সন্দেহ নেই। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, এ রাতটা তোমরা বিশ্রাম কর এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষা কর।

আলী বিন সুফিয়ান রাতে তাওফীক জাওয়াদের ঘরে চলে যান। বেশভূষা বণিকের। মুখমণ্ডলে কৃত্রিম দাড়ি। তিনি দারোয়ানকে বললেন, ভেতরে সংবাদ দাও, কায়রো থেকে আপনার একজ বন্ধু এসেছেন। দারোয়ান ভেতরে সংবাদ পাঠায়। আলী বিন সুফিয়ানকে ভেতরে ডেকে নেয়া হয়। তাওফীক জাওয়াদ আলীকে চিনতে পারলেন না। আলী কথা বললে এবার তিনি চিনে ফেলেন এবং দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই লোকটার প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের আস্থা আছে। তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং বললেন, 'আমি কয়েকজন খৃস্টান গোয়েন্দাকে ফাঁদে আটকিয়েছি। এখন ভাবতে হবে তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগান যায়।'

'তার আগে বলুন এখানকার পরিস্থিতি কী?'– আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন– 'কায়রোতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছেছে।'

সুলতান জঙ্গীর মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে কায়রো যেসব সংবাদ পৌঁছেছে, তাওফীক জাওযাদ তার সবগুলোরই সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি বললেন–

'আলী ভাই! তুমি একে হয়ত গৃহযুদ্ধ বলবে; কিন্তু খৃস্টানদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে হলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করতেই হবে।'

'আচ্ছা, আমরা যদি কায়রো থেকে সেনা অভিযান পরিচালনা করি, তাহলে এখানকার ফৌজ কি আমাদের মোকাবেলা করবে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

'তোমরা হামলার ভাব নিয়ে এস না'– তাওফীক জাওযাদ জবাব দেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী উপরে উপরে প্রকাশ করবেন, তিনি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এবং খলীফার সম্মানার্থে সঙ্গে সৈন্য নিয়ে এসেছেন। এমতাবস্থায় আমীরদের উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তাহলে তারা সুলতানকে স্বাগত জানাবে। অন্যথায় তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা সময়মত দেখা যাবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, এখানকার ফৌজ তোমাদের মোকাবেলা করবে না, বরং সঙ্গ-ই দেবে। তবে এ কথাও মাথায় রাখতে হবে, তোমরা সময় যত নষ্ট করবে, এই ফৌজ তোমাদের থেকে ততই দূরে সরতে থাকবে। এখানকার ফৌজের যে জযবা-চেতনা এখনো বিদ্যমান আছে, তা নষ্ট করার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর এই জযবাই তো ইসলামী ফৌজের আসল শক্তি। তুমি তো জান আলী ভাই! যে শাসক ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়, সে সর্বপ্রথম দুশমনের সঙ্গে সমঝোতা করে। তারপর দেশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে এবং এমন সব সালারদেরকে আপন বানিয়ে নেয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে তার অনুগত হয়। এই কর্মধারা এখানে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন সেনা অফিসার ইতিমধ্যেই জাতীয় চেতনা ও ঈমানী জযবা হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এখনো আমার মত এমন কিছু সালারও আছেন, যারা খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীর জিহাদী চেতনাকে জীবিত রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু খেলাফতের নির্দেশ ছাড়া নিজের থেকে তারা কিই-বা করতে পারবে?'

'তাহলে কি আমি সুলতান আইউবীকে নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারি যে, এখানকার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গ দেবে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

'অবশ্যই বলতে পারেন'– তাওফীক জাওযাদ জবাব দেন– 'তবে খলীফা ও আমীরদের দেহরক্ষীরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাদের সংখ্যাও কম নয় এবং তারা ফৌজের বাছা বাছা সৈনিক। সম্ভবত তাদেরকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আমি যে জাতীয় চেতনা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমি আশান্বিত যে, আমরা যদি এখানে আসি, তাহলে সফল হব।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'দেখ, দেশের জনসাধারণ অত তাড়াতাড়ি বোধ হারায় না'– তাওফীক জাওয়াদ বললেন– 'যে জাতি তাদের সন্তানদেরকে কুরবানী দিয়েছে, তারা

দুশমনকে কখনো ক্ষমা করতে পারে না। আবার যে সেনাবাহিনী দুশমনের মুখোমুখি লড়াই করেছে, তারাও এত দ্রুত দমে যায় না। কিন্তু শাসকদের হাতে এমন সব অস্ত্র থাকে, যা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে লাশে পরিণত করে ফেলে। এখন জনগণ ও ফৌজের মধ্যে নেফাকের বীজ বপন করা হচ্ছে। ফৌজকে জনগণের চোখে হেয় করা হচ্ছে।'

'আমি মোহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তিনি খলিফর মা-ও বটে। সুলতান আইউবীর নিকট তিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যে, আপনি ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করুন। তাকে কি এখানে ডেকে আনা সম্ভব?'

'এই তো কাল-ই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল'– তাওফীক জাওয়াদ জবাব দেন– 'ঠিক আছে, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার নাম শুনলে তিনি ছুটে আসবেন।'

তাওফীক জাওয়াদ তার চাকরানীকে ডেকে বললেন, খলীফার আম্মার কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাবে এবং কানে কানে বলবে, কায়রো থেকে একজন মেহমান এসেছেন।

❁ ❁ ❁

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাওফীক জাওয়াদের গৃহে বসে কথা বলছেন, সে সময় তার তাঁবু এলাকায় চলছিল সরগরম অবস্থা। রাত অনেক হয়েছে। ক্রেতাদের ভীড় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল। আলীর একশ' লোক এসেছে দীর্ঘ সফর করে। বাজার থেকে বকরী ও দুম্বা কিনে এনেছে। এখন তারা রান্না করে সেগুলো আহার করছে। চলছে হাসি-কৌতুক। মেয়েগুলো আলাদা একটি তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে। খৃস্টান পুরুষরা বসে আছে আলীর লোকদের সঙ্গে। আসরের পূর্ণতা লাভের জন্য মদের পাত্র বের করে নিয়েছে তারা। সবাইকে মদপান করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আলীর লোকেরা সকলেই না করে দেয়। খৃস্টানরা অবাক হয়। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে বলেছিলেন, আমার লোকদের মধ্যে মুসলমানও আছে, খৃস্টানও আছে। যারা মুসলমান তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এরা ফেদায়ী। আর ফেদায়ীরা তো নামের মুসলমান। হাসান ইবনে সাব্বাহর দলের মানুষ, যারা মদকে হারাম ভাবে না। অথচ এদের একজনও মদপান করতে রাজি হল না! ব্যাপারটা কি? খৃস্টানদের মনে সন্দেহ জাগে। পরিস্থিতি যাই হোক, এরা তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা আরো এমন দু'চারটি লক্ষণ দেখতে পায়, যার ভিত্তিতে তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। তারা এক এক করে আসর থেকে উঠতে শুরু করে, যেন তাঁবুতে ঘুমাতে যাচ্ছে।

আসর থেকে উঠে গিয়ে তারা মেয়েদেরকে বলে, তোমরা তোমাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, দেখ, আসলে এরা কারা। একটি মেয়ে স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় এবং এই বলে বাইরে চলে যায় যে, এই তাঁবুটি খালি করে দাও। মেয়েটি উঠে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করতে থাকে। অবশেষে আলী বিন সুফিয়ানের এক লোক উঠে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। লোকটি কেন গেল বুঝা গেল না। মেয়েটি তাকে থামিয়ে বলল, তাঁবুতে বসে বসে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই একটু বাইরে বেড়াতে আসলাম। মেয়েটা পুরুষদেরকে আঙ্গুলে করে নাচাতে জানে। তার মোহনীয় কথা ও ভঙ্গিমায় লোকটা ভুলেই যায় যে, সে কোথায় যেতে উঠেছিল। মেয়েটি বলল, 'আমাদের সঙ্গে যে লোকগুলো আছে, ওরা বড় খারাপ মানুষ। আমরা এখানে তোমাদের ন্যায় অন্য এক কাজে এসেছিলাম। কিন্তু লোকগুলো আমাদেরকে বেজায় উত্যক্ত করে ফিরছে। আচ্ছা, তুমি কি আমার তাঁবুতে এসে ঘুমাতে পার? তাহলে আমি ওদের থেকে রক্ষা পাই।' বলে মেয়েটি এমন কিছু আচরণ করে, যার ফলে লোকটি মোমের মত গলে যায় এবং মেয়েটির তাঁবুতে চলে যায়।

তাঁবুর মধ্যে মিটমিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় মেয়েটি লোকটির আপাদমস্তক এক নজর দেখে নিয়ে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল, 'উহ্‌! তুমি তো বড্ড সুশ্রী পুরুষ। তুমিই আমার হেফাজত করতে পারবে।' এই বলে এক পেয়ালা মদ লোকটির প্রতি এগিয়ে দিয়ে বলল– 'নাও, পান কর।'

'না।'

'কেন?'

'আমি মুসলমান।'

'এত পাক্কা মুসলমানই যদি হয়ে থাক, তাহলে ক্রুশের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে আসলে কেন?'

লোকটি চমকে উঠে বলল, 'এর বিনিময় পাই।'

মেয়েটা যতটা না রূপসী, তার চেয়ে বেশী চতুর। এই উভয় অস্ত্র ব্যবহার করে সে আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটির দেল-দেমাগ কব্জা করে ফেলে। মেয়েটি বলল, 'মদপান না কর তো শরবত এনে দেই'। বলেই সে অন্য তাঁবুতে চলে যায় এবং একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে আসে। শরবতের পেয়ালাটা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দেয়। লোকটি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগিয়েই মুচকি একটা হাসি দিয়ে পেয়ালাটা রেখে দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'এর মধ্যে হাশীশ কতটুকু দিয়েছ?'

অকস্মাৎ মেয়েটি নিরুত্তর হয়ে যায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'বেশী নয়; এই যতটুকুতে কিছু সময়ের জন্য তোমাকে আত্মভোলা করে রাখা যায়।'

'কেন?'

'আর কেন? আমি তোমাকে হাত করতে চাই'– ধীর কণ্ঠে মেয়েটি বলল– 'আমার কথাগুলো যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে, তাহলে তোমার খঞ্জরটা আমার বুকে বিদ্ধ করে দাও। আমি তোমাকে হঠাৎ পেয়ে যাইনি। আমি তোমার ওদিকে আসা দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সফরকালে আমি তোমাকে গভীর মনে দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি কোথায় যেন কখনো একত্রে ছিলাম এবং একজন আরেকজনের পরিচিত। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। দেখলে না, আমি তোমাকে মদ পেশ করেছি, কিন্তু নিজে পান করিনি। কারণ, আমি মুসলমান। এরা আমাকে জোর করে মদপান করায়।'

লোকটি চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তা তুমি এই কাফেরদের সঙ্গে কিভাবে আসলে?'

'আমি বারটি বছর ধরে এদের সঙ্গে আছি'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। তখন আমার বয়স ছিল বার বছর। আমার পিতা যখন আমাকে বিক্রি করে দেন, তখন আমি জানতাম না, আমার খরিদ্দার খৃস্টান। তারা আমাকে সেই কাজের প্রশিক্ষণ দেয়, এই আজ যে কাজের জন্য আসলাম। আমি দামেস্ক ও বাগদাদের নাম শুনেছি। নামগুলো আমার কাছে বেশ ভাল লাগে। এই ভূখণ্ডে পা রাখা মাত্র এর আবহাওয়া আমার ভেতরে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে। আমি মুসলমান, মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য আমি কাজ করতে পারব না।'

মেয়েটি অতিশয় আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। বলল– 'আমার হৃদয় কাঁদছে। আমার আত্মা কাঁদছে।' লোটটির হাত দু'টো চেপে ধরে টেনে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বলল, 'তুমিও মুসলমান, চল আমরা পালিয়ে যাই। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। ধু ধু মরু প্রান্তরে নিয়ে যাবে? আমি সহাস্যবদনে সেখানে যাব। তুমিও স্বজাতিকে ধোঁকা দেয়া থেকে ফিরে আস। আমাদের কাছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে; আমি সেগুলো নিয়ে নেব। চল, আমরা পালিয়ে যাই।'

আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটি বুদ্ধিমান ছিল বটে, কিন্তু এখন মেয়েটির রূপ ও কথার ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। তার ডিউটির কথা মনে পড়ে। সে মদপান করেনি, হাশীশও নয়। হাশীশের ঘ্রাণ কেমন তার জানা আছে। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এখানে কেন এনেছ? মেয়েটি

তাদের মিশনের কথা জানায়। লোকটি বলল, আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এখানে তোমরা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না। সত্য সত্যই যদি তুমি এ- কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাক, তাহলে তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি আমাদের হাতে এসে পড়েছ। পালাতে হবে না, তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবে। আমরা কেউ খৃস্টানদের গুপ্তচর নই। আমরা সবাই মিসরের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা।'

মেয়েটি আনন্দের আতিশয্যে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে। লোকটি বলল, 'আমি আমার কমান্ডারকে বলব, তোমাকে যেন অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা রাখা হয় এবং কোন আমীর বা অন্য কারো হাতে সোপর্দ না করেন।'

মেয়েটি অস্থিরচিত্তে লোকটির হাতে চুমো খেতে শুরু করে। মিশন তার সফল। আলী বিন সুফিয়ানের এত সতর্ক একজন গোয়েন্দা একটি খৃস্টান গোয়েন্দা মেয়ের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ল!

'একটু অপেক্ষা করুন'– মেয়েটি বলল– 'আমি দেখে আসি আমার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা।'

মেয়েটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

✿ ✿ ✿

আলী বিন সুফিয়ান সালার তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর অপেক্ষা করছেন। ইসলামের মহান মুজাহিদের স্ত্রী দূত মারফত সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট তার চিন্তা-চেতনা ও আবেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরও আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা জরুরী। তার নিকট থেকে অনেক তথ্য জানতে হবে এবং পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর সম্মানিতা মহিলা এসে উপস্থিত হন। তিনি কালো ওড়নায় আবৃতা। মুখে কৃত্রিম দাড়ি থাকার কারণে আলী বিন সুফিয়ানকে প্রথমে চিনতে পারেননি। পরক্ষণে পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন–

'এমন একটি সময়ও আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল যে, আমরা দু'জন এভাবে লুকিয়ে ও ছদ্মবেশ ধারণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করব। তুমি এখানে মাথা উঁচু করে আসতে। এবার এসেছ এমনভাবে, যেন তোমাকে কেউ চিনতে না পারে। আর আমিও ঘর থেকে এমন সাবধানে বের হয়েছি, যেন কেউ আমার পিছু না নেয় যে, আমি কোথায় যাচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ানও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না তিনি। আবেগে এতই আপ্লুত হয়ে পড়েন যে, দীর্ঘক্ষণ কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুল না। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী বললেন–

'আলী বিন সুফিয়ান! এই পোশাক আমি স্বামীর শোক পালনের জন্য পরিধান করিনি। আমি শোক পালন করছি ইসলামের সেই মর্যাদার জন্য, যা আমার জাতির অলংকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসকরা আমার পুত্রকে ক্রীড়নকে পরিণত করে জাতীয় মর্যাদাকে খৃস্টানদের পায়ে অর্পণ করেছে। তুমি সম্ভবত জান না, যে খৃস্টান সম্রাটকে সুলতান জঙ্গী বন্দী করে রেখেছিলেন, গতকাল খলীফার নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এই সেই সম্রাট রেজনাল্ড, যাকে মাস কয়েক আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী বেশ ক'জন খৃস্টান সৈন্যের সঙ্গে এক লড়াইয়ে গ্রেফতার করেছিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গী তাকে ও অন্যান্য বন্দীদেরকে কার্ক থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

এ ঘটনায় জঙ্গী বেশ আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি খৃস্টানদের সঙ্গে এমন একটি চাল খেলে এই সম্রাটকে মুক্ত করব, যে চাল তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবে। একজন সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারের গ্রেফতারি সাধারণ কোন ব্যাপার ছিল না। আমরা তার পরিবর্তে খৃস্টানদের থেকে আমাদের অনেক দাবি-দাওয়া আদায় করে নিতে পারতাম। কিন্তু গতকাল আমার পুত্র আনন্দের সাথে আমাকে বলল, 'মা! আমি খৃস্টান সম্রাট এবং তার সঙ্গীসহ সব খৃস্টান বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছি।' সংবাদটি আমার মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত হানে। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মভোলার ন্যায় বসে থাকি। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিনিময়ে নিজের বন্দীদের ছাড়িয়ে এনেছ কি?' পুত্র জবাব দেয়, 'ওদেরকে ফিরিয়ে এনে আমরা আর কি করব। আমরা তো আর কারো সঙ্গে যুদ্ধ করব না।' আমি পুত্রকে বললাম, 'তুমি এখন থেকে আর তোমার বাপের কবরের নিকট যাবে না। আর তুমি মারা গেলেও তোমার পিতার কবরস্থানে তোমাকে দাফন করব না। সেই করবস্থানে এমন বহু মুজাহিদও শুয়ে আছেন, যারা খৃস্টানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তোমাকে সেখানে দাফন করে আমি তাদের অবমাননা করতে চাই না। তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর কলংক...।'

'কিন্তু যা-ই বলি, পুত্র তো আমার নাবালক, এখনো সবকিছু বুঝে উঠার বয়স হয়নি। আমার পুত্র যেসব আমীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে, আমি তাদের নিকটও গিয়েছি। তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে বটে, কিন্তু মান্য করতে প্রস্তুত নয়। তারা আমার কথা মানছে না। খৃস্টানরা তাদের সম্রাট ও বন্দী সৈন্যদের মুক্তি দিয়ে ইসলামের মুখে চপেটাঘাত করেছে। আমার নিকট অবাক লাগে যে, সুলতান আইউবী কায়রোতে বসে কী করছেন! তিনি আসছেন না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবী কী ভাবছেন আলী বিন সুফিয়ান? তুমি তাকে বলবে, তোমার এক বোন তোমার আত্মমর্যাদার জন্য মাতম করছে।

তাকে বলবে, আমি এই কালো পোশাক সেইদিন খুলব, যেদিন তোমরা দামেস্কে প্রবেশ করে বিলাসপ্রিয় ও ঈমান বিক্রেতাদের হাত থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে রক্ষা করবে। অন্যথায় আমি এই পোশাকেই মৃত্যুবরণ করব আর অসিয়ত করে যাব, যেন আমাকে এই পোশাকেই দাফন করা হয়। আমি কিয়ামতের দিন আমার স্বামী ও আল্লাহর সম্মুখে সাদা পোশাকে উপস্থিত হতে চাই না।'

'আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি'— আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'আসুন আমরা কাজের কথা বলি। সুলতান আইউবীও আপনারই ন্যায় অস্থির-বেকারার। আবেগ ও উত্তেজনাবশত আমাদের কোন পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না। এখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারি। তার পন্থা একটাই যে, দেশের জনগণ আমাদের পক্ষে থাকবে। আর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে ভাই তাওফীক জাওয়াদ আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, ফৌজ আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। তবে খলীফা ও আমীরদের রক্ষীবাহিনী মোকাবেলা করতে পারে।'

'দেশের জনগণ আপনাদের সঙ্গে আছে'— জঙ্গীর স্ত্রী বললেন— 'আমি মহিলা মানুষ; ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। তবে আমি অন্য অঙ্গনে লড়ে যাচ্ছি। আমি দেশের নারী সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে রেখেছি যে, আপনি যে কোন সময় তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার ব্যবস্থাপনায় এখানকার যুবতী মেয়েরা তরবারী চালনা ও তীরান্দাজীতে দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা তাদের পুত্র, পিতা, স্বামী ও ভাইদেরকে স্ফুলিঙ্গ বানিয়ে রেখেছে। আমি যেসব মহিলাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তারা আমার অনুগত। পরিস্থিতি যদি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে প্রতিটি গৃহকে মহিলারা খলীফার ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে ফেলবে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি ফৌজ নিয়ে আসেন, তাহলে আমার খলীফা পুত্র ও তার চাটুকাররা নিজেদেরক সঙ্গীহীন দেখতে পাবে। তুমি যাও ভাই আলী! ফৌজ নিয়ে আস। এখানকার পরিস্থিতি আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি নিশ্চিত থাক, জনগণের দিক থেকে একটি তীরও তোমাদের গায়ে বিদ্ধ হবে না। যদি আমার পুত্রকে হত্যা করে ফেল্যার প্রয়োজন মনে কর, তাহলে ভুলে যেও সে আমার ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র। আমি আমার পুত্রকে খণ্ডবিখণ্ড করাতে রাজি আছি, সালতানাতে ইসলামিয়াকে টুকরো টুকরো করতে দিতে রাজি নই।

তাওফীক জাওয়াদও আলী বিন সুফিয়ানকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, গৃহযুদ্ধ হবে না। তারপর তিনজন মিলে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যে, সুলতান

আইউবী কিভাবে আসবেন এবং এসে কি করবেন। সিদ্ধান্ত হল, সুলতান আইউবী আসনে নীরবে, খলীফা ও তার চাটুকারদের অজান্তে।

❁ ❁ ❁

আলী বিন সুফিয়ানের লোকটিকে তাঁবুতে বসিয়ে রেখে খৃস্টান মেয়েটি তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলে, শিকার জালে আটকা পড়েছে। এরা সবাই মিসরী ফৌজের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা। বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান তাদের কমান্ডার।

এই তথ্য খৃস্টানদের চমকে দেয়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, এখন কি করা যায়। এখানে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

মেয়েটি পুনরায় মিসরী গোয়েন্দার কাছে ফিরে যায়। এক খৃষ্টান বাইরে বেরিয়ে আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু আলীকে পায় না সে। তিনি তো তখন তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসা। আলী এখানে আছে কি নেই, এটাই লোকটির জানা দরকার। আলীকে অনুপস্থিত দেখে মনে ভয় জাগে যে, তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করছেন। সঙ্গীদের নিকট গিয়ে সে জানায়, বিলম্ব না করে এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে।

এখন মধ্য রাত। এরা এই নগরী সম্পর্কে অজ্ঞ। দিনের বেলা হলে গন্তব্য একটা ঠিক করে নিতে পারত। তাছাড়া এই রাত দুপুরে মেয়েদের নিয়ে চলাও অনুচিত।

একজন পরামর্শ দিল, 'চল আমরা কোন একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠে। বলব, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী; বাইরে খোলা মাঠে ঘুমুতে পারি না, তাই সরাইখানায় রাত কাটাতে চাই।' তার এই মতের উপরই সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু সরাইখানা কোথায়, সেটা তাদের জানা নেই।

একজন লুকিয়ে লুকিয়ে সরাইখানার সন্ধানে বের হয়। লোকটি হাঁটছে। রাস্তাঘাট, হাটবাজারে কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। একজন মানুষও তার নজরে পড়ল না, যাকে জিজ্ঞেস করবে এখানে সরাইখানার কোথায়।

লোকটি এলোপাতাড়ি ঘুরছে। হঠাৎ সামনে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে। অন্ধকারে এতটুকুই বুঝতে পারে, একজন মানুষ আসছে। নিকটে আসলে খৃস্টান লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাই এদিকে সরাইখানা কোথায় বলতে পারেন কি?'

লোকটির মাথা ও মুখের অর্ধেকটা চাদর দিয়ে ঢাকা। তিনি বললেন, 'এখানে ধারে-কাছে কোন সরাইখানা নেই।

'আছে এখান থেকে অনেক দূরে– নগরীর ওই প্রান্তে।' বলে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে আপনি সরাইখানা খুঁজছেন কেন? এখন তো আর আপনার জন্য কেউ সরাইখানার দরজা খুলবে না।'

খৃস্টান বলল, 'এই আজই আমি একটি বণিক কাফেলার সঙ্গে এসেছি। সঙ্গে চারটি মেয়ে আছে; ওদেরকে তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না।'

'হ্যাঁ, এটা তো সমস্যা'– আগন্তুক বলল– 'আপনাকে সন্ধ্যার আগেই এর ব্যবস্থা করে রাখা আবশ্যক ছিল। যা হোক, আসুন, আমি আপনার সাহায্য করব। আপনি বিদেশী মানুষ, এখান থেকে গিয়ে যাতে বলতে না হয় যে, দামেস্কে আমার মেয়েরা খোলা মাঠে রাত কাটিয়েছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। মেয়েদেরকে নিয়ে আসুন, আমি সরাইখানা খুলিয়ে আপনাদের রাত যাপনের ব্যবস্থা করে দেব।'

আগন্তুক খৃস্টান লোকটির সঙ্গে হাঁটা দেয়। দু'জন কাফেলার তাঁবুর নিকট চলে যান। খৃস্টান তাকে একস্থানে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি।' বলেই সে তাঁবুর একদিক থেকে চক্কর কেটে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

খৃস্টানদের তাঁবু এখান থেকে সামান্য দূরে অন্য জায়গায়। তাঁবুতে পৌঁছে সে সঙ্গীদের বলল, একজন লোক আমার সঙ্গে এসেছে, তিনি আমাদেরকে সরাইখানায় জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। সঙ্গীরা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। পাছে এই লোকটিও ধোঁকা দিয়ে বসে কিনা। কিন্তু ভয় পেয়ে লাভ নেই। যে জালে আটকা পড়েছে, সেখান থেকে যে কোন মূল্যে হোক বের তাদের হতেই হবে। মিসরী গোয়েন্দা মেয়েটিকে এতটুকুও বলে দিয়েছে যে, খলীফা ও আমীরগণ খৃস্টানদের পদানত হয়ে পড়েছেন। সে জন্য আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা নিয়ে এখানে এসেছেন। তার মিশন হল, এখানকার পরিস্থিতি যাচাই করা যে, খৃস্টানদের প্রভাব কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী কিনা।

মেয়েটি আলী বিন সুফিয়ানের এই মিশনের কথা তার সঙ্গীদের অবহিত করেছিল। তাদের কাছে এটা এতই মূল্যবান তথ্য যে, রাতারাতি খলীফার কানে দিতে পারলে প্রশংসা লাভ করা যেত। তাছাড়া খৃস্টান শাসকদের নিকটও সংবাদটা পৌঁছানো দরকার, যাতে তারা সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা এমনও সংকল্প করে যে, আলী ও তার এই দলটিকে খলীফাকে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না।

তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তো ঘুমিয়ে আছে; আমরা সবাই একত্রে বেরিয়ে যাব। মালপত্র ও পশুগুলোকে এখানেই রেখে যাব। ভোর পর্যন্ত তো এই মিশরী দলটি খলীফার হাতে ধরা পড়ছেই। পরে আমাদের মালামাল আমরা নিয়ে নেব।

সব ক'জন একত্রে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে আড়ালে

আড়ালে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছে, সেখানে সাহায্যকারী লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটা জায়গায় নেই। সবাই এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ঠিক এমন সময় উটের আড়াল থেকে বেশ ক'জন লোক উঠে দাঁড়ায় এবং খৃস্টান দলটিকে ঘিরে ফেলে। তাদেরকে হাঁকিয়ে একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি প্রদীপ জ্বালান হয়। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'দোস্তরা, কোথায় যাচ্ছ?' তারা মিথ্যা জবাব দেয়। আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, সরাইখানার সন্ধানে দিশেহারার ন্যায় ঘুরছিল যে লোকটি, সে কে?'

একজন বলল, 'আমি।'

'আর যার নিকট সরাইখানার সন্ধান জিজ্ঞাসা করেছিলে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে হলাম আমি।'

এ এক আকস্মিক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান তাওফীক জাওয়াদের ঘর থেকে ফিরছিলেন আর একই পথে খৃস্টান লোকটি সরাইখানার সন্ধানে যাচ্ছিল। লোকটি আলী বিন সুফিয়ানকে সরাইখানার পথ জিজ্ঞেস করে। আলো থাকলে লোকটি আলীকে চিনে ফেলত। কিন্তু একে তো ছিল অন্ধকার, দ্বিতীয়ত আলী বিন সুফিয়ানের মাথা ও মুখমণ্ডল ছিল রুমাল দ্বারা ঢাকা। লোকটির দু'একটি কথা শুনেই তিনি বুঝে ফেললেন, ওরা জেনে ফেলেছে যে, ওরা ফাঁদে আটকা পড়েছে; তাই পালাবার পথ খুঁজছে। আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত ছিলেন, এই খৃস্টানরা গোয়েন্দা। কিন্তু এখানে আমীরদের কেউ না কেউ তাদেরকে আশ্রয় দেবেন। তাই তিনি সাহায্যের ফাঁদ পেতে তাকে আটকে ফেলেছেন এবং তার সঙ্গে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তিনি ভাবছিলেন, এ মুহূর্তে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। খৃস্টান লোকটি তাঁর প্রতি করুণাই করেছে যে, তাকে তাঁবু থেকে অনেক দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁর দু'তিনজন লোককে জাগিয়ে তোলেন এবং নেহায়েত দ্রুততার সাথে তাদেরকে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। দিক-নির্দেশনা দিয়ে তিনি নিজে খৃস্টানদের তাঁবুর নিকটে নিয়ে যান। মেয়েদেরসহ তারা সবাই একটি তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। আলী বিন সুফিয়ান পা টিপে টিপে সন্নিকটে গিয়ে তাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন। তিনি এতটুকু জানতে পারেন যে, খৃস্টান গোয়েন্দারা তার মিশন জেনে ফেলেছে। কিন্তু এই গোপন তথ্য কিভাবে ফাঁস হল, তা জানতে পারলেন না।

ইত্যবসরে আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তার নির্দেশনা মোতাবেক বর্শাসজ্জিত হয়ে উটপালের আড়ালে গিয়ে বসে পড়েছে। খৃস্টানদের এখানেই আসবার কথা। যেইমাত্র তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন

সুফিয়ানও এসে হাজির হন এবং সবাইকে ঘিরে ফেলে বন্দী করে ফেলেন।

'দোস্তরা!' আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমাদের চরবৃত্তি অনেক দুর্বল। এখনো তোমাদের অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। গুপ্তচর কি এভাবে সুনসান– জনমানবশূন্য অলিগলিতে ঘোরাফেরা করে? আর গুপ্তচর কি কোন অজানা লোকের সঙ্গে তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলে? এই বিদ্যা তোমাদের আমার নিকট থেকে শিখতে হবে।'

'এই বিদ্যা আপনি আপনার লোকদেরই শিক্ষা দিন'– এক খৃস্টান বলল– 'আপনি কি আমাদের এই দক্ষতার প্রশংসা করবেন না যে, আমরা আপনারই একজন থেকে আপনাদের আসল পরিচয় জেনে নিয়েছি? এতো ভাগ্যের লীলা। আজ আপনি জিতে গেছেন, আমরা হেরে গেছি। আমাদের কমান্ডার যদি মৃত্যুবরণ না করতেন, তাহলে আজ আমরা এভাবে ধরা খেতাম না।'

'আমার সেই লোকটি কে, যে আমার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

'ঐ যে ঐ তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে।' মেয়েটি একটি তাঁবুর প্রতি ইশারা করে উত্তর দিল– 'ও আমার ফাঁদে এসে পড়েছিল।'

'যাক গে, এসব আলাপ কায়রো গিয়ে হবে।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

ভোর হল। জনতা দেখতে পেল, একটি বণিক কাফেলা এগিয়ে চলছে। অনেকগুলো উটের পিঠে যেখানে ব্যবসার পণ্য বোঝাই করা, সেখানে কয়েকটি তাঁবুও পেঁচিয়ে রাখা আছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তার একশ' লোক ব্যতীত কেউ জানে না, এই তাঁবুগুলোর মধ্যে চারটি মেয়ে ও চারজন পুরুষ শুয়ে আছে। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আলী বিন সুফিয়ান শেষ রজনীর আলো আঁধারীতে এক একজন খৃস্টানকে এক একটি তাঁবুর মধ্যে পেঁচিয়ে উটের পিঠে বোঝাই করে বেঁধে নিয়েছেন। ওরা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে, নাকি জীবিত থাকবে, তার কোন ভাবনা নেই আলী বিন সুফিয়ানের।

কাফেলা দামেস্ক অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। এখন আর পেছনের দিকে তাকালে শহরটা দেখা যায় না। আলী বিন সুফিয়ান বন্দী খৃস্টান গোয়েন্দাদেরকে তাঁবুর মধ্য হতে বের করেন। সকলেই জীবিত। তিনি মেয়েগুলোকে উটের পিঠে আর পুরুষদেরকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নেন। তারা মুক্তির জন্য তাদের সমুদয় মণি-মাণিক্য ও সোনাদানা আলী বিন সুফিয়ানকে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে। এগুলো তারা খলীফা ও আমীদেরকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য এনেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মুখে হাসির রেখো টেনে বললেন, 'এসব দৌলত তো আমার সঙ্গে যাচ্ছেই।'

সে সময়ে রেমান্ড নামক এক খৃস্টান ত্রিপোলীর শাসক ছিলেন। বর্তমানকার লেবাননকে সে যুগে ত্রিপোলী বলা হত। অন্যান্য খৃস্টান শাসকরা অবস্থান করতেন জেরুজালেম ও তার আশপাশের এলাকায়। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে তারা সকলেই আনন্দিত। ইতিমধ্যে তারা একটি বৈঠক করে ফেলেছেন। পরিকল্পনাসমূহকে পুনর্বিবেচনা করে দেখেন, ঠিক আছে কিনা। সে মোতাবেক খৃস্টান কমান্ডার আইরিজ তার বাহিনী নিয়ে হাল্‌ব পৌঁছে যান। হাল্‌বের আমীর হলেন শামসুদ্দীন। আইরিজ শামসুদ্দিনের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন, আপনি হাল্‌বকে আমাদের হাতে তুলে দিন কিংবা চুক্তিনামায় সই করে আমাদেরকে কর প্রদান করুন। শামসুদ্দিন এই ভয়ে খৃস্টানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন যে, দামেস্ক ও মওসেলের আমীরগণ আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত দেখলে আমার রাজ্য কব্জা করে নেবে।

এই একটি মাত্র সাফল্যে খৃস্টানরা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা বুঝে ফেলে যে, এই মুসলমান আমীরগণ পরস্পর সহযোগী হওয়ার স্থলে একে অপরের দুশমন। তাই তারা বিনা যুদ্ধেই মুসলমানদেরকে পদানত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলে। তাদের ভয় ছিল শুধু সালাহুদ্দীন আইউবীকে। আইউবীর নীতি ও চরিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত। তাদের আশংকা ছিল, সুলতান আইউবী যদি দামেস্ক বা অন্য কোন এলাকায় এসে পড়েন, তাহলে তিনি সব আমীরকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। তিনি সকল আমীরকে অতিদ্রুত ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেনও। রেমান্ড খলীফা আল-মালিকুস্ সালিহকে দূত মারফত মূল্যবান উপঢৌকনসহ এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে সামরিক সহেযাগিতাও প্রদান করব।

ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। এ মুহূর্তে ইসলামের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে সুলতান আইউবীর পদক্ষেপের উপর। বিলীয়মান প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী কায়রোতে আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছেন। তাঁকে আলীর রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বাগদাদ, দামেস্ক, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলে সেনা অভিযান প্রেরণের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। তার জন্য সমস্যা হল, মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভাল নয় এবং সৈন্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম। মিসর থেকে তিনি বেশী সৈন্য নিয়ে যেতে পারবেন না। এ মুহূর্তে এটাই তার বড় সমস্যা, যার জন্য তিনি অতিশয় বিচলিত যে, এত সামান্য সৈন্য দিয়ে কি তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন! কিন্তু তবুও সেনা অভিযান ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুলতান আইউবী প্রতিদিন দু'একবার ঘরের ছাদে উঠে একনাগাড়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, যেদিক থেকে আলী বিন সুফিয়ান

আসবেন। দিগন্তে দৃষ্টি মেলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকছেন তিনি।

এভাবে একদিন তিনি দূর দিগন্তে ধূলিবালির কুন্ডলী দেখতে পান। ধূলির কুন্ডলী জমিন থেকে উত্থিত হয়ে যেন উপরদিকে উঠে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ধূলির কুন্ডলী ধীরে ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একসময় ধূলির ভেতর ঘোড়া ও উটের কায়া নজরে আসে। এটা আলী বিন সুফিয়ানেরই কাফেলা। দামেস্ক থেকে রওনা হওয়ার পর পথে তিনি কমই যাত্রাবিরতি দিয়েছেন। মিসরের মিনার চোখে পড়া মাত্র তিনি উট-ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দেন। এ পরিস্থিতিতে একটি মুহূর্তের মূল্য কত, তা তিনি জানেন। তাঁর অপেক্ষায় যে সুলতান আইউবীর রাতে ঘুম আসছে না, সেই অনুভূতিও তাঁর আছে।

আপাদমস্তক ধূলিমলিন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী তাকে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও দিলেন না। রিপোর্ট শোনার জন্য তিনি অস্থির-বেকারার। এখানেই তার খাওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে তাকে দফতরে নিয়ে যান। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনান। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর পয়গাম, তার আবেগ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সালার তাওফীক জাওয়াদের সঙ্গে যে কথপোকথন হয়েছে, তারও বিবরণ দেন। শেষে বললেন, দামেস্ক থেকে আমি একটি উপঢৌকন নিয়ে এসেছি। এই উপঢৌকন হল চারজন খৃস্টান গোয়েন্দা পুরুষ ও চারটি মেয়ে। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, 'আমি সন্ধ্যার আগে আগে তাদের থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করব।'

'তার মানে আমাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে!' সুলতান আইউবী বললেন।

'হ্যাঁ, করতে হবে এবং আমরা অবশ্যই করব'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তবে আমার আশা, গৃহযুদ্ধ হবে না।'

সুলতান আইউবী তাঁর দু'জন উপদেষ্টাকে তলব করেন। এই উপদেষ্টাদ্বয়ের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। সুলতান তাদেরকে বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে যে কথাগুলো বলব, সেগুলো মনে গেঁথে নেবে। তোমরা দু'জন ব্যতীত আলী বিন সুফিয়ানও এই গোপন ভেদ সম্পর্দে অবহিত থাকবে।'

সুলতান আইউবী তাদেরকে দামেস্ক ও অন্যান্য ইসলামী রিয়াসত ও জায়গীরের পরিস্থিতির বিবরণ প্রদান করেন। আলী বিন সুফিয়ানের নিয়ে আসা রিপোর্ট শুনিয়ে বললেন, আল্লাহর সেনারা তাঁরই হুকুম তামিল করে থাকে। আমীর ও খলীফাদের আনুগত্য আমাদের উপর ফরজ। কিন্তু আমীর-খলীফা যদি ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনে পরিণত হয়, তখন ইসলাম ও

মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহর সৈনিকদের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আমার অস্তিত্ব যদি দেশ ও জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া কিংবা পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখা তোমাদের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। আজ এমনি একটি কর্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের খলীফা ইসলাম ও সার্বভৌমত্বের কথা ভুলে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি আজ ইসলামের দুশমনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তাদের গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদান করছেন। তার আশপাশের লোকেরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছে। তারা সালতানাতে ইসলামিয়াকে বিক্রি করে খাচ্ছে। হাল্‌ব-এর গবর্নর শামসুদ্দীন খৃষ্টানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে কর প্রদান করছে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। খৃষ্টজগত চতুর্দিক থেকে আলমে ইসলামকে ঘিরে ফেলছে। এমতাবস্থায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে খলীফাকে গদিচ্যুত করে ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা পরামর্শ দিন।'

'অবশ্যই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উভয় উপদেষ্টা একবাক্যে জবাব দেন।

'আমাদের পদক্ষেপ-পরিকল্পনা এই চারজনের মধ্যেই গোপন থাকবে।' সুলতান আইউবী বললেন এবং তাদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ শুরু করে দেন।

খৃস্টান গোয়েন্দা ও মেয়েদেরকে আলী বিন সুফিয়ান একটি বিশেষ পাতাল কক্ষে নিয়ে যান এবং বললেন, 'তোম'রা এমন একটি জাহান্নামে এসে প্রবেশ করেছ, যেখানে তোমরা জীবিতও থাকবে না, মরবেও না। তোমাদের দেহগুলোকে কংকালে পরিণত করে আমি তোমাদের থেকে যেসব তথ্য উদ্ধার করব, ভালোয় ভাল আগেই সব বলে দাও। তবেই এই জাহান্নাম থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। তোমাদেরকে চিন্তা করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিলাম। আমি একটু পরে আসছি।'

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাদেরকে বেড়ী পরানোর নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তাদের একজন বলল, 'আমরা আপনাকে সব কথা বলে দেব। আমরা বেতনভোগী কর্মচারী। শাস্তি যদি দিতেই হয়, আমাদেরকে না দিয়ে যারা আমাদেরকে খাটায়, তাদেরকে দিন। তাছাড়া আমরা পুরুষরা না হয় শাস্তি বরদাশত করতে পারব; কিন্তু এই মেয়েগুলোকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।'

কেউ তাদের গায়ে হাত দেবে না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমরা যদি আমার কাজ সহজ করে দাও, তাহলে তোমাদের মেয়েরা তোমাদেরই সঙ্গে থাকবে। এই পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে তোমাদেরকে বের করে নেয়া হবে

এবং সসম্মানে নজরবন্দী করে রাখা হবে।'

খৃস্টান গোয়েন্দারা যেসব তথ্য প্রদান করে, তাতে নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

তিন দিন পর।

মিসরের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে– উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ একটি ভূখণ্ড। এলাকাটি পর্বতময়, উঁচু-নীচু টিলায় পরিপূর্ণ। মাঝে-মধ্যে সবুজ গাছগাছালী। আছে পানিও। এলাকাটা কাফেলা ও সেনা চলাচলের সাধারণ রাস্তা থেকে ভিন্ন। তার-ই অভ্যন্তরে এক স্থানে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোর সামান্য দূরে আড়ালে শুয়ে আছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। সেখান থেকে খানিক ব্যবধানে একটি তাঁবু। তাঁবুর ভিতরে শুয়ে আছেন এক ব্যক্তি। তিন চারজন লোক বিভিন্ন টিলার উপর হাঁটাহাঁটি করছে। এলাকার বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে টহল দিয়ে ফিরছে আরো জন চারেক লোক।

তাঁবুর ভিতরে শায়িত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। টিলার উপরে-নীচে যারা ঘোরাফেরা করছে তারা প্রহরী। বেঁধে রাখা অশ্বপালের অদূরে শুয়ে থাকা লোকগুলো সুলতান আইউবীর সৈন্য। তারা সংখ্যায় সাতশত।

সুলতান আইউবী গভীর ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি যথাসম্ভব কম সৈন্য নিয়ে দামেস্ক যাবেন। যদি একজন সুলতানের ন্যায় তাকে স্বাগত জানানো হয়, তবে তো ভাল, মৌখিক আলাপ-আলোচনায়-ই সমস্যার সমাধান হবে। আর যদি সংঘর্ষ বাঁধে, তাহলে এই সল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারাই মোকাবেলা করবেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে, খলীফা ও আমীরদের রক্ষীবাহিনী যদি সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে সালার তাওফীক জাওয়াদ তার বাহিনীকে সুলতানের হাতে তুলে দিবেন। জঙ্গীর স্ত্রীও নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, নগরবাসী সুলতান আইউবীকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ধরে নিয়েছিলেন যে, দামেস্কের প্রত্যেক সৈনিক ও জনতা তাঁর দুশমন। তাই তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী থেকে এমন সাতশত সৈন্য বেছে নেন, যারা অসংখ্য যুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের মধ্যে আছে এমন সব গেরিলা যোদ্ধাও, যারা দুশমনের পিছনে যুদ্ধ লড়ায় অভিজ্ঞ। সামরিক দক্ষতা ছাড়াও এসব সৈন্য জাতীয় ও ঈমানী চেতনায় বলীয়ান। খৃস্টানদের নাম শুনলেই লাল যায় হয়ে তাদের চোখ।

সুলতান আইউবী কায়রো থেকে এই সৈন্যদেরকে রাতের আঁধারে গোপনে বের করে এনেছেন। তারা এক-দু'জন করে কায়রো থেকে বেরিয়ে আসে এবং

কায়রোর অনেক দূরে পূর্ব নির্ধারিত একস্থানে সমবেত হয়। সুলতান আইউবীও কায়রো থেকে বের হন অতি গোপনে। বিষয়টা জানতেন শুধু আলী বিন সুফিয়ান ও সুলতানের দুই খাস উপদেষ্টা। সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনী যথারীতি কায়রোতে তার বাসগৃহ ও হেডকোয়ার্টার পাহারা দিচ্ছে। তারা জানে, সুলতান এখানেই আছেন।

সকল ইউরোপীয় ও মুসলমান ঐতিহাসিক একমত যে, সুলতান আইউবী শত শত অশ্বারোহী বেছে নিয়ে শহর থেকে গোপনে বের হয়ে দামেস্ক রওনা হয়েছিলেন। কায়রো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় খৃস্টান গোয়েন্দারা তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে এমন মিসরী মুসলমানও ছিল, যারা সরকারী কর্মচারী। কিন্তু কেউ টের পায়নি যে, কায়রো থেকে সুলতান আইউবী এবং সাতশ' অশ্বারোহী উধাও হয়ে গেছেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবী দামেস্ক প্রবেশ করা পর্যন্ত তার সকল তৎপরতা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি পথ চলতেন রাতে। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। সাতশ' ঘোড়া ও সাতশ' আরোহীকে লুকিয়ে রাখা কঠিন ছিল না। তিনি এমন পথে অতিক্রম করেন, যে পথে কোন কাফেলা চলাচল করে না। দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবী এই গোপন সফরে সৈন্যদের সঙ্গে একজন সাধারণ সৈনিকেরই ন্যায় মিলেমিশে অবস্থান করেন। সকলের সঙ্গে খোশ-গল্প করতে থাকেন এবং কথা দিয়ে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। পাশাপাশি তাদেরকে বুঝাতে থাকেন যে, পরিস্থিতি কেমন এবং কিরূপ হতে যাচ্ছে। তিনি তার সৈনিকদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হতে দেননি, মিথ্যা আশ্বাস দেননি। তাদেরকে তিনি সমস্যা ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবে প্রত্যেক সৈন্য প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা উড়ে দামেস্কে পৌঁছে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিমত পাওয়া যায় যে, সময়টা ১১৭৪ সালে কোন্ মাস ছিল। কারো মতে জুলাই মাস। কারো মতে নবেম্বর মাস। ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, সুলতান আইউবী সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি মিসরের নির্বাহী ক্ষমতা গোপনে দু'জন উপদেষ্টার হাতে সোপর্দ করে এসেছিলেন। সুদানের দিককার সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করে রেখে এসেছিলেন। উত্তরদিকের নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়, সর্বক্ষণ দিনে-রাতে সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নৌযান টহল দিতে থাকবে এবং নৌসেনাদের নিয়ে নৌজাহাজ সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থাকবে। সুলতান আইউবী তাঁর স্থলাভিষিক্তদের বলে এসেছেন, কোনদিক

থেকে আক্রমণ আসলে আমার অপেক্ষা না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি এই নির্দেশও প্রদান করে যান যে, কোন সীমান্তে দুশমন সামান্য গড়বড় করলেও কঠোর জবাব দেবে। সর্বক্ষণ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকবে। প্রয়োজন হলে সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে মিশরের প্রতিরক্ষা অটুট রাখবে।

সুলতান আইউবী মিসরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে চুপিসারে দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

❁ ❁ ❁

দামেস্কের দুর্গের প্রধান ফটকে সান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। হঠাৎ তারা দূর-দিগন্তে ধূলিবালির মেঘ দেখতে পায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেঘগুলো দামেস্কের দিকে ধেয়ে আসছে। সান্ত্রীরা কিছু সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের কাফেলা হবে বোধ হয়। কিন্তু তাতে তো এত ধূলি উড়তে পারে না। সম্ভবত এগুলো ঘোড়া। মেঘমালা অনেক নিকটে চলে আসে। এবার মেঘের ভেতরে আবছা আবছা ঘোড়া দেখা যায়। তারপর ঊর্ধ্বে উচিয়েধরা বর্শার ফলা নজরে আসতে শুরু করে। প্রতি বর্শার মাথায় পতাকা বাঁধা। নিঃসন্দেহে এরা সৈন্য হবে। কিন্তু খলীফার ফৌজ হতে পারে না। এক সান্ত্রী নাকারা বাজিয়ে দেয়। দুর্গের অন্যান্য ফটক থেকেও নাকারা বেজে উঠে। দুর্গে যেসব সৈন্য ছিল, তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। তীরান্দাজরা ধনুকে তীর সংযোজন করে পাঁচিলের উপর উঠে যায়। দুর্গের কমান্ডারও উপরে উঠে আসে। ধূলি উড়াতে উড়াতে আরোহীরা দুর্গের নিকটে চলে আসে এবং আক্রমণের বিন্যাসে এসে থেমে যায়। দুর্গের কমান্ডার অশ্বারোহীদের কমান্ডারের ঝাণ্ডা দেখে চমকে উঠেন। এত সালাহুদ্দীন আইউবীর ঝাণ্ডা! দুর্গের কমান্ডারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বলে দেয়া হয়েছিল, সুলতান আইউবী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি যদি এদিকে আসেন, তাহলে যেন তিনি শহরে ঢুকতে না পারেন।

'আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?' দুর্গের কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে– 'খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সৈন্যদের পেছনে দূরে কোথাও নিয়ে রেখে আসুন এবং আপনি একা সম্মুখে অগ্রসর হোন।'

'খলীফাকে এখানে ডেকে নিয়ে আস'– সুলতান আইউবী উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আর তুমি শুনে নাও, আমার সৈন্যরা পেছনে হটবে না– শহরে প্রবেশ করবে। খলীফাকে সংবাদ পাঠাও, সে যদি বাইরে না আসে, তাহলে অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরবে এবং তার দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।'

'নাজমুদ্দীন আইউবের পুত্র সালাহুদ্দীন!'– দুর্গের কমান্ডার বলল– 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমার একজন সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। আমি খলীফার হুকুমের পাবন্দ। তোমার জন্য নগরীর দ্বার খোলা হবে না।'

দুর্গের বাইরে প্রহরারত সৈন্যরা সংবাদ দেয়ার জন্য এক সিপাইকে খলীফার নিকট প্রেরণ করে। সুলতান আইউবীও তার সৈন্যদেরকে কি যেন নির্দেশ প্রদান করেন। সৈন্যরা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত নড়েচড়ে ওঠে। তারা আরো বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ধনুক বের করে হাতে নেয়। তাতে তীর সংযোজন করে।

ওদিকে দামেস্কের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শহরের পাঁচিলে তীরান্দাজ সৈন্যরা প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দুর্গের কমান্ডার সম্ভবত খলীফার নির্দেশ কিংবা ভেতর থেকে বাহিনী আসার অপেক্ষা করছে। কোন পদক্ষেপ নেয়নি সে। কিন্তু মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

খলীফা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। বাচ্চা মানুষ। একবার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। পরক্ষণেই আবার ঘাবড়ে যান। তার উপদেষ্টাগণ তাকে সাহস দেয় এবং তার থেকে এই নির্দেশ আদায় করে নেয় যে, ফৌজ বাইরে গিয়ে সুলতান আইউবীকে ঘিরে ফেলবে এবং অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করিয়ে তাকে গ্রেফতার করবে।

ইতিমধ্যে নগরবাসীও জেনে যায় যে, সুলতান আইউবী ফৌজ নিয়ে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তার প্রশিক্ষিত মহিলারাও তৎপর হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে যায় যে, সুলতান আইউবী এসেছেন। মহিলারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং স্লোগান তুলে, সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাজ, সালাহুদ্দীন আইউবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম। অনেকে আইউবীকে উপহার দেয়ার জন্য ফুল সংগ্রহ করে। পুরুষরাও রাস্তায় নেমে আসে, তাকবীর ধ্বনিতে দামেস্কের আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

খলীফার চাটুকারদের এ দৃশ্য পছন্দ হল না। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে নগরীর প্রধান ফটকের উপর। বানের মত ছুটে আসছে মানুষ। অনেকে পাঁচিলের উপর উঠে যায় আর স্লোগান দেয়, 'খোশ আমদেদ সালাহুদ্দীন আইউবী।'

দামেস্কের ফৌজ সুলতান আইউবীর মোকাবেলা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সংবাদ চলে আসে খলীফার কানে। খলীফা ও আমীরগণ ভাবনায় পড়ে যান। আমীরদের অনুগত কমান্ডাররা নিজ নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়। খলীফার বিরোধী কমান্ডাররা তাদেরকে সাবধান করে দেয় যে, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে পরিণতি ভাল হবে না। ঘোড়ার পেছনে বেঁধে তোমাদেরকে শহরময় টেনে-হেঁচড়ে খুন করা হবে। তিন-চারজন কমান্ডার পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময়ে জঙ্গীর স্ত্রী এসে উপস্থিত হন। মহিলা পাগলের ন্যায় দৌড়ে আসেন। আসেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়াটাও হাঁফাচ্ছে তার। তিনি দেখতে এসেছেন, ফৌজ কী

করছে। পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করছে না তো? তিনি দেখতে পান যে, তিন-চারজন কমান্ডার তরবারী উঁচিয়ে একে অপরকে শাসাচ্ছে। তাওফীক জাওয়াদও আছেন তাদের মধ্যে। জঙ্গীর স্ত্রীকে দেখেই তিনি তার দিকে এগিয়ে যান এবং বললেন, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'এখানে কী হচ্ছে?'– জঙ্গীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন– 'ফৌজ সালাহুদ্দীন আইউবীকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছে, নাকি মোকাবেলা করতে?'

'ফৌজ যাচ্ছে না'– তাওফীক জাওয়াদ জবাব দেন– 'আমরা খলীফার নির্দেশ অমান্য করেছি। আর এরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতে চাচ্ছে:। এদের মধ্যে দু'জন আছে খলীফার অনুগত।'

জঙ্গীর স্ত্রী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে যান এবং বিবদমান কমান্ডারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে যান। তিনি নিজের মাথাটি উলঙ্গ করে চিৎকার দিয়ে বললেন, ওহে আত্মমর্যাদাহীন লোক সকল! তোমরা আগে এই মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কর, আপন মায়ের মস্তক মাটিতে ছুঁড়ে মার। তারপর কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ কর। তোমরা ঐসব কন্যাদের কথা ভুলে গেছ, যাদেরকে কাফেররা তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা ভুলে গেছ ঐসব শিশু কন্যাদের কথা, যারা কাফেরদের নির্মমতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বল, তোমরা কার সমর্থনে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করেছ? আমার পুত্রের অনুগতরা কাফের। তোমরা আস, আগের আমার গর্দানটা উড়িয়ে দাও, তারপর আইউবীর মোকাবেলায় গমন কর।'

জঙ্গীর স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে। কমান্ডারগণ তরবারী কোষবদ্ধ করে মাথানত করে কেটে পড়ে।

'ফৌজ কি নির্দেশ অমান্য করল?' খলীফার এক উপদেষ্টার ভীতিপ্রদ কণ্ঠস্বর। এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে খলীফার দরবারে।

'রক্ষীদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে যাও'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এক আমীর বলল– 'দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা কর।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্ষী বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। এতক্ষণে নগরবাসীদের ভীড় আরো বেড়ে গেছে। মহিলারা চিৎকার করে বলছে, 'ফটক খুলে দাও। আমাদের ইজ্জতের মোহাফেজ এসেছেন।' পুরুষরা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছে। রক্ষী বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ পাচ্ছে না।

খেলাফতের কাজী (প্রধান বিচারপতি) কামালুদ্দীন তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি খলীফার দরবারে ছুটে যান। তিনি খলীফাকে বললেন, আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় ফৌজ প্রেরণ করেন, তাহলে দেশের

সাধারণ মানুষ তাদের মোকাবেলা করবে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। তার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই হবে যে, আশপাশে অবস্থানরত খৃস্টান ফৌজ বিনা যুদ্ধে ভেতরে ঢুকে পড়বে, খৃস্টানরা দেশটা দখল করে নেবে। তারপর না থাকবে আপনার খেলাফত, না থাকবেন আপনি নিজে। দেশটা তছনছ হয়ে যাবে। শরীয়তের নির্দেশ হল, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করা যায় না। আপনি একটুখানি বাইরে এসে মানুষের উৎকণ্ঠা দেখুন। আপনি এই স্রোত কিভাবে প্রতিহত করবেন? ভাল হবে, নগরীর চাবি আমার হাতে দিয়ে দিন; আমি একটা সুন্দর সমাধান করে ফেলি।'

চাবি কাজী কামালুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হল। তিনি নিজ হাতে নগরীর ফটক খুললেন। চাবিটা সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। সুলতান আইউবী অবনত মস্তকে তার হাতে চুম্বন করেন এবং তারই সঙ্গে শহরে প্রবেশ করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। সুলতান আইউবী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী আবেগের অতিশয্যে সুলতান আইউবীকে জড়িয়ে ধরেন এবং শিশুর ন্যায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। মহিলারা সুলতান আইউবী ও তার সৈন্যদের উপর ফুল ছিটিয়ে দেয় এবং স্লোগান দিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়।

দুর্গের চাবিও সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেয়া হয়। তিনি সর্বপ্রথম নিজে বাড়িতে যান। আইউবী দামেস্কেরই সন্তান। একসময় তিনি এ বাড়িতে বাস করতেন। বড় আবেগের সাথে তিনি পুরাতন ঘরটিতে প্রবেশ করেন, যেখানে তার জন্ম হয়েছিল।

❁ ❁ ❁

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর সুলতান আইউবী ছোট-বড় কমান্ডারদেরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। তাদের সঙ্গে কথা বলে আন্দাজ করে নেন,তাদের উপর কতটুকু নির্ভর করা যায়। ফৌজের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন এবং নির্দেশ জারি করেন।

এ সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, খলীফা তার অনুগত আমীর ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। ফৌজের উচ্চপদস্থ দু'তিনজন কর্মকর্তাও তাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে যান এবং পালিয়ে যাওয়া লোকদের ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযান প্রেরণ করেন। এ গৃহগুলো মূলত বালাখানা। পলাতকরা শুধু আপন আপন জীবন নিয়েই পালিয়েছে– বিত্তবৈভব সবই পড়ে আছে। হেরেমের নারী, নর্তকী ও বিলাস সামগ্রী সবই পেছনে রয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী সমস্ত মাল-দৌলত কব্জা করে নেন। তার একাংশ বাইতুলমালে জমা দেন, অবশিষ্টগুলো গরীব ও পঙ্গুদের মাঝে বন্টন করে

দেন। সুলতান আইউবী খলীফা ও ফেরার আমীর প্রমুখদের ধাওয়া করা প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি মিসর ও সিরিয়ার একীভূত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেন এবং আপন ভাই তকিউদ্দীনকে দামেস্কের গবর্নর নিযুক্ত করেন। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও নতুন গবর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে সালতানাতের সুরক্ষা ও ভিত শক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তার ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টসমূহ তাকে জানান দিয়ে যাচ্ছে যে, তার আমীরগণ– যারা আল-মালকুস্ সালিহের অফাদার– তাকে শান্তিকে বসতে দেবে না। ইউরোপীয় রাজ্যসমূহ থেকে আসা তথ্যাদি থেকে জানা গেল, খৃস্টানরা সুবিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছে, যাদের নিয়ে ইসলামী বিশ্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবে। সুলতান আইউবীর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হল, তার আমীরগণ তাকে পরাস্ত করার জন্য খৃস্টানদের পথপানে চেয়ে আছে। তাই তার জন্য আবশ্যক হল, প্রথমে এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা। কাজটা অত সহজ নয়। দামেস্কের ফৌজের যোগ্যতা কেমন, তাও তিনি জানেন না। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি এই ফৌজের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন। যে অঞ্চলে তাকে লড়তে হবে, জায়গাটা পর্বতময়। শীতের মওসুমে ঐসব পাহাড়ে বরফ জমে যায়। আর এখন শীতকাল।

সুলতান আইউবী কায়রো ও দামেস্কের মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করেন। কায়রোতে খৃস্টান ও সুদানী গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের একাধিক গোপন আখড়া আছে। সেসব এলাকার মানুষের উপর সুলতান আইউবীর পূর্ণ আস্থা নেই। পক্ষান্তরে দামেস্কেও খৃস্টান দুর্বৃত্ত আছে বটে; কিন্তু এখানকার সাধারণ নাগরিক, এমনকি অবুঝ শিশুরা পর্যন্ত তার সহযোগী বরং তারা তার আঙ্গুলের ইশারায় আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। তাই এখানকার সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে এই আশংকা কম যে, তারা দুশমনের গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। দামেস্ক ও সিরিয়ার মানুষ নুরুদ্দীন জঙ্গীর আমলে মর্যাদাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই ব্যক্তি মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন শাসকরা তাদেরকে প্রজায় পরিণত করেছে। আমীর-উজীরগণ ভোগ-বিলাসিতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ জনগণের জন্য আপদে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনের শাসন ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বেশ্যালয় ও শরাবখানা চালু হয়ে গেছে। মাত্র চার-পাঁচ মাসেই মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এবং মানুষ অভাব ও দুর্ভিক্ষ অনুভব করতে শুরু করেছে।

এখানকার জনসাধারণ অভাব-অনটন বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত বটে,

কিন্তু জাতীয় মর্যাদা বিলুপ্ত হতে দিতে প্রস্তুত নয়। তারা খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষপাতি নয়। তারা অনুভব করতে শুরু করে যে, তাদের শাসকরা তাদেরকে দুশমনের হাতে তুলে দিচ্ছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনামলে ঝুপড়ি ও ছেঁড়া তাঁবুতে বসবাসকারী লোকেরাও সরকার কখন কী করছে জানতে পারত। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু জঙ্গীর ওফাতের পর দেশের জনগণ এখন অস্পৃশ্য ঘোষিত হয়েছে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক, নিজের চরকায় তেল দাও। দু'টি মসজিদের ইমামকে শুধু এই জন্য চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে যে, তারা মুসল্লীদেরকে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার ওয়াজ শোনাতেন। খলীফার মহল ও অন্যান্য সরকারী ভবনের নিকটে আসাও জনগণের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা এক সময় নুরুদ্দীন জঙ্গীকেও পথরোধ করে দাঁড় করিয়ে কথা বলত এবং রণাঙ্গনের খবরাখবর নিত, এখন তারা সরকারের একজন সাধারণ কর্মকর্তাকে দেখলেও পেছনে সরে যায়।

মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জিহাদের স্লোগান হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু স্লোগান হারিয়ে যেতে পারে, মানুষের জযবা এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হওয়ার নয়। মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে মতবিনিময় করতে শুরু করে যে, এমন অবস্থায় আমরা কী করতে পারি।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মহিলাদের একটি দল গঠন করেছিলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তারা জানতে পারে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন এবং তিনি ফৌজ নিয়ে এসেছেন। তারা সুলতানকে স্বাগত জানানোর জন্য বেরিয়ে আসে। যখন তারা জানতে পারে যে, খলীফা সুলতান আইউবীকে সামরিক শক্তি প্রযোগ করে প্রতিহত করতে চাচ্ছেন, তখন তারা খলীফার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়। খলীফার রক্ষীবাহিনী তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করে। আর এই কারণেই খলীফা আল-মালিকুস্ সালিহ ও তার সহযোগিরা চোরের ন্যায় দলবলসহ পালাতে বাধ্য হয়েছিল। এখন মানুষ সুলতান আইউবীর নির্দেশে জীবন দিতে প্রস্তুত। জনগণের এই আবেগ-উচ্ছ্বাস সুলতান আইউবীর মিশনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

✿ ✿ ✿

দামেস্কের মুসলিম নারীদের মধ্যে ঈমানী জযবা ও জাতীয় চেতনা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এখন সেই জযবা জ্বলন্ত অঙ্গারের রূপ লাভ করেছে। যুবতী মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দল সুলতান আইউবীর নিকট এসে নিবেদন জানায়, মহামান্য সুলতান! আপনি আমাদেরকে ফৌজের সঙ্গে রণাঙ্গনে প্রেরণ করুন

এবং আমরদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিন। আমরা আহত মুজাহিদদের সেবা-চিকিৎসা ছাড়া লড়াইও করতে চাই। সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন, যেদিন প্রয়োজন হবে, তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনব। আপাতত তোমাদের ময়দান হল ঘর। আমি তোমাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চাই না। তোমরা যদি মা হয়ে থাক, তাহলে স্বামী-সন্তানদেরকে মুজাহিদরূপে গড়ে তোল। যদি বোন হও, ভাইদেরকে ইসলামের মোহাফেজ বানাও। ওয়াদা দিচ্ছি, আমি তোমাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমরা একথা ভুল না যেন, তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর সামলাতে হবে।'

এরূপ আরো কিছু কথা বলতে বলতে সুলতান আইউবীর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায়। তিনি বললেন, আরো একটি ময়দান আছে, যেখানে তোমরা কাজ করতে পার। তোমরা হয়ত শুনেছ, খলীফার মহল এব আমীর-উজীর ও শাসকদের বাসভবন থেকে অনেকগুলো মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। তাদের সংখ্যা দু- তিনশ'। আমি তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারা এই শহরেই কিংবা শহরের আশপাশে কোথাও অবস্থান নিয়ে থাকবে। তারা কে কোথাকার বাসিন্দা আমার জানা নেই। এখনইবা কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরছে, নিজেদের জীবন বরবাদ করছে, তাও আমি বলতে পারব না। এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার সম্মুখে বিশাল বিশাল কাজের পাহাড় পড়ে আছে। এই কাজটা আমি তোমাদের উপর সোপর্দ করছি যে, তোমরা তাদেরকে খুঁজে বের কর। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও থাকবে, যাদেরকে ক্রয় কিংবা অপহরণ করে আনা হয়েছিল। এখন তাদের ভবিষ্যৎ এই যে, তারা বেশ্যালয়ে ঢুকে পড়বে, সরাইখানায় মুসাফিরদের সেবা করবে এবং এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে জীবনের অবসান ঘটাবে। তাদেরকে কেউ বিয়ে করবে না। তোমরা তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর।

মেয়েরা কালবিলম্ব না করে অভিযান শুরু করে দেয়। তারা নিজ নিজ ঘরের পুরুষদের থেকে সহযোগিতা নেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বেশক'টি মেয়েকে খুঁজে বের করে নিজেদের ঘরে রেখে তাদের চরিত্র শোধরানোর প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়।

হতভাগা মেয়েগুলোর মধ্যে একটি মেয়ের নাম সাহার। সাহারকে জোরপূর্বক নর্তকী বানানো হয়েছিল। তাকে এক আমীরের ঘর থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে মেয়েটি এক দরিদ্র পরিবারে আশ্রয় নেয়। উদ্ধারকারী মেয়েরা খোঁজ পেয়ে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে।

সাহার যখন দেখল, দামেস্কের মেয়েরা নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ন্যায় কাজ করছে, তখন তার ঘুমন্ত মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। জাগ্রত হয়ে উঠে তার

প্রতিশোধস্পৃহাও। সে মেয়েদেরকে জানায়, আমার সঙ্গের এক নর্তকী সরাইখানার মালিকের নিকট থাকে। সাহার সরাইখানার মালিককে চেনে। সে জানায়, এই লোকটি খৃস্টানদের গুপ্তচর। লোকটি একটি পাতাল কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। সেখানে ফেদায়ী ও খৃস্টান গোয়েন্দারা রাত কাটায়। সেখানে নাচ হয়, মদের আসর বসে। আমাকেও এক রাত সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি সেই গোয়েন্দাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আমি সরাইখানার মালিককে তাদের সঙ্গে নিজ হাতে হত্যা করতে চাই। একাকী করা সম্ভব নয়। তোমরা আমার সঙ্গ দাও।

মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা একটি পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে। সে মোতাবেক সাহার একদিন পর্দাবৃত হয়ে সরাইখানার মালিকের নিকট চলে যায়। সরাইখানার মালিক সাহারকে দেখে বেজায় আনন্দিত। সাহার বলে, 'আমি তখনই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতাম। কিন্তু শহরে ধরপাকড় চলছিল। আমি আশংকা করি, যদি আমি তোমাদের নিকট চলে আসি, তাহলে তোমরাও ধরা পড়ে যাবে। আমি এতিম মেয়ের পরিচয় দিয়ে একটি দরিদ্র পরিবারে লুকিয়ে থাকি। এখন পরিস্থিতি ভাল। তোমাদের প্রতি কারো কোন সন্দেহ নেই। তাই এবার তোমাদের নিকট চলে এলাম।'

সরাইখানার মালিক সাহারকে তার নর্তকীর নিকট নিয়ে যায়। নর্তকীও অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এখানে সে কয়েক রাত অতিবাহিত করে। সাহার দেখতে পায় যে, খলীফা ও বিলাসী আমীরদের পতন এবং সুলতান আইউবীর ক্ষমতা দখল সত্ত্বেও সরাইখানার পাতাল কক্ষের জৌলুস আগেরই মতই অক্ষুণ্ণ আছে। এতো উত্থান-পতনের পরও তাতে কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি। মুসাফিররা নিজ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ার পর এই পাতাল কক্ষের জগত সক্রিয় হয়ে উঠে। এখানে এখনো খৃস্টান গুপ্তচর ও দুর্বৃত্তরা আছে। সাহার তাদের মনোরঞ্জন করতে থাকে। রাতে নাচে ও তাদেরকে মদপান করায়। এরা মুসাফিরের বেশে সরাইখানায় আসা-যাওয়া করে।

সাহার আরো দেখে নেয় যে, রাতে সরাইখানার বাইরে পাহারার ব্যবস্থা থাকে, যাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে সংবাদ যথাসময়ে পাতাল কক্ষে পৌঁছে যায়। সাহার একাকী বাইরে যেতে পারে না। মনের বিরুদ্ধে হলেও সে নাচতে-গাইতে থাকে। একরকম বন্দীই করে রাখা হয়েছে তাকে। মেয়েটি এই ভেবে নিরাশ হয়ে যায় যে, আসলাম প্রতিশোধ নিতে এখন কিনা হয়ে গেলাম বন্দী। কিন্তু এই নৈরাশ্য সে কাউকে বুঝতে দেয়নি। তাকে সবাই তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। অনেক গোপনীয় কথাও তার উপস্থিতিতে আলোচনা হচ্ছে এখন।

এক রাতে পাতাল কক্ষের আসরে এক খৃস্টান গোয়েন্দা সরাইখানার মালিককে

বলল, শুধু এই দু'টি মেয়েতে আমাদের একঘেঁয়েমী এসে গেছে। নতুন মেয়ে আন।

গোয়েন্দা যখন কথাটা বলে, তখন মেয়ে দু'টো সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাতে অন্য নর্তকী ব্যথিত হলেও সাহারের চোখে আশার আলো জ্বলে ওঠে। সরাইখানার মালিক বলল,সালাহুদ্দীন আইউবী এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছেন যে, এখন দামেস্কে আর কোন নর্তকী বা নতুন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে না।

'কেন পাওয়া যাবে না?' সাহার বলল– 'আমীর-উজীরদের ঘর থেকে যেসব নর্তকীদের উদ্ধার করে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তারা এখনো এই শহরেই আছে। আমার মত তারাও লুকিয়ে আছে। আপনারা যদি আমাকে দু'-তিন দিনের জন্য বাইরে যেতে দেন, তাহলে পর্দানশীল নারীর বেশে আমি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে পারব।'

সাহার অনুমতি পেয়ে যায়। সরাইখানার মালিক তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয়। সকাল হলে সাহার পর্দাবৃত হয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

চার-পাঁচ দিন পর সরাইখানার চোরা দরজা দিয়ে আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা আটটি মেয়ে প্রবেশ করে এবং সোজা সরাইখানার মালিকের কক্ষে চলে যায়। মেয়েগুলোর মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা। মালিকের কক্ষে প্রবেশ করে সবাই মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলে। মালিক চোখ মেলে তাদের প্রতি তাকায়। সব ক'টি মেয়ে যুবতী এবং একটির চেয়ে অপরটি রূপসী। সাহার তাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এরা কোন্ কোন্ আমীরের নিকট ছিল, সাহার তা মালিককে অবহিত করে। আরো জানায় যে, এদের নাচ দেখে, গান শুনে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আরো বলল, আজ রাত আপনার সব বন্ধু-বান্ধবকে এখানে দাওয়াত করুন।

সরাইখানার মালিক পাগলের মত উঠে দৌঁড় দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিতে ছুটে যায়। সাহার মেয়েগুলোকে পুরাতন নর্তকীর কাছে নিয়ে যায়। নর্তকী তাদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়, এদের একজনকেও সে চেনে না। নর্তকী একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিশেষ পরিভাষায় কথা বললে মেয়েটি খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ে। সাহার বলল, 'নতুন জায়গা কিনা, মেয়েটি ভয় পেয়েছে। তাছাড়া আমি এদেরকে এক বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। রাতে এদের নৈপুণ্য দেখলে তখন তুমি বুঝতে এরা কারা, কোথা থেকে এসেছে।'

সাহারের কথায় নর্তকী আশ্বস্ত হল না। সন্দেহ হোক বা না হোক এই অনুশোচনা তার অবশ্যই আছে যে, এই মেয়েদের সামনে তার মূল্য শেষ হয়ে গেছে। সে সাহারকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে বলল, 'বোধ হয় তোমার

মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! এই মেয়েগুলো টাটকা যুবতী। তাছাড়া অতিশয় রূপসী। এদের সামনে আমাদের আর মূল্য কি? এ-কী করলে তুমি? এদেরকে কোত্থেকে এনেছ? কেনইবা এনেছ? বড় ভুল করলে সাহার!'

'আসলে আমি আমাদের পরিশ্রম কমাতে চাচ্ছি'– সাহার বলল– 'ওদের আগমনের পর এখন আমাদের কাজ কমে যাবে।'

নর্তকী তার এই যুক্তি মানতে পারল না। সাহারের নিকট আর কোন যুক্তি নেই, যা দ্বারা সে নর্তকীকে আশ্বস্ত করবে। দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। নর্তকী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'আমি সরাইখানার মালিককে বলব, এই মেয়েগুলো নর্তকী নয়– বেশ্যা। এদেরকে এই স্পর্শকাতর স্থানে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। এই পাতাল কক্ষের গোপন তথ্য বাইরে গেলে বিপদ অনিবার্য। এদেরকে কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করব?'

এই নর্তকী অতিশয় অভিজ্ঞ ও চতুর। সে সাহারের মুখ বন্ধ করে দেয়। আবার সাহারও তার বক্তব্য মানতে প্রস্তুত নয়। অবশেষে নর্তকী হুমকি দিল, 'তুমি যদি এখনই ওদেরকে এখান থেকে না তাড়িয়েছ, তাহলে আমি মেহমানদেরকে এই বলে ফিরিয়ে দেব যে, তুমি এদের দ্বারা তাদেরকে গ্রেফতার করাবার ষড়যন্ত্র করছ।'

সাহার অস্থির হয়ে যায়। নর্তকী ক্ষোভের সাথে বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে হাঁটা দেয়। অমনি সাহার তার কামিজের নীচে হাত ঢুকিয়ে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে নর্তকীর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দেয়। আহত হয়ে মেয়েটি ঘুরে যায়। সাহার খঞ্জরের আরেকটি আঘাত করে নর্তকীর হৃদপিন্ডে। তারপর দাঁত কড়মড় করে বলে উঠে, 'তুমি আমাকে খুন করাতে চাচ্ছিলে। কিন্তু তোর মরণই যে হল আমার হাতে।'

সাহার নর্তকীর পরিধানের কাপড় দ্বারাই খঞ্জর পরিষ্কার করে। লাশটা তার খাটের উপর তুলে কম্বল দ্বারা ঢেকে রাখে। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের কক্ষে চলে যায়। পরনের রক্তাক্ত পোশাক পরিবর্তন করে এবং খঞ্জরটা আবার কটিবন্ধে সেঁটে কামিজের নিচে লুকিয়ে রাখে।

❁ ❁ ❁

রাতে সরাইখানার মালিক ছাড়াও আরো সাতজন লোক এই পাতাল কক্ষে আসে। মালিক সাহারকে পুরাতন নর্তকীর কথা জিজ্ঞেস করে, ও কোথায়? সাহার নাক ছিটকে, ভ্রু কুচকে বলল, ও এই নতুন মেয়েদের দেখে জ্বলে-পুড়ে মরছে। নিজেকে সে এদের চেয়েও বেশী রূপসী মনে করে। আজ রাত সে এখানে না আসলেই ভাল হবে। আসর রং ধরবে।'

'লানত পড় ক ওর উপর'– মালিক বলল– 'ওকে ওর কক্ষেই পড়ে থাকতে দাও।'

সাহার ছয় মেহমানকে উদ্দেশ করে বলল, এই মেয়েদের সঙ্গে ভাল পোশাক নেই; আপনারাই এদের উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই রাতটা এখন ওরা যে পোশাকে আছে, সে পোশাকেই আপনাদের সামনে আসবে।

তারা যখন মেয়েদের দেখল, তখন ভুলেই গেল, ওরা কোন্ পোশাকে আছে। মেয়েগুলোকে পেশাদার নর্তকীর মত মনে হয় না। চেহারার রং তাদের একদম টাটকা এবং নিষ্পাপ বলে মনে হয়। তাদের মাথার চুলগুলোও পরিপাটি করা হয়নি। তাদের আচরণ প্রমাণ করে যে, তারা পেশাদার নর্তকী নয়। ভাবসাব তাদের সহজ-সরল। সাহার তাদেরকে উদ্দেশ করে বলল, এবার মেহমানদের মদ পরিবেশন কর। তারা সোরাহী থেকে পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করে। এক মেহমান একটি মেয়েকে খানিকটা উত্যক্ত করে। মেয়েটি লাফ মেরে পেছনে সরে যায়। তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে।

'সাহার!'– লোকটি বলল– 'এদেরকে কোথা থেকে এনেছ? এরা কার কাছে ছিল?'

সাহার অট্টহাসি হেসে বলল, 'বিদ্যা ভুলে গেছে। ঐ সালাহুদ্দীন আইউবীর ভয়। অল্প পরেই ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরুন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী!'– তাচ্ছিল্যের সাথে একজন বলল– 'এবার বেটা আমাদের জালে এসেছে। আমরা তাকে তারই আমীর-সালারদের হাতে খুন করাব।' লোকটি তার এক সঙ্গীর কাঁদে চাপড় মেরে বলল, 'এর খঞ্জর সালাহুদ্দীন আইউবীর খুনের পিয়াসী। চিন তো একে? এ হাসান বিন সাব্বাহর দলের লোক- ফেদায়ী।' লোকটি এক মেয়ের গালে আলতো আঘাত করে বলল, 'আইউবীর ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেল। ও তো দিন কয়েকের মেহমান মাত্র।'

কিছুক্ষণ পর। মদপান শুরু হল। নাচের ফরমায়েশ হল। মেয়েরা সোরাহী ও পেয়ালাগুলো এদিক-ওদিক সরিয়ে রাখার ভান করে ছয়জন লোকের পেছনে চলে যায়। অকস্মাৎ সবাই যার যার কামিজের তলে হাত ঢুকায়। প্রত্যেকে একটা করে খঞ্জর বের করে। একটি খঞ্জর বের করে নেয় সাহারও। প্রথমে সাহার সরাইখানার মালিকের উপর আঘাত হানে। অন্যরা ছয় পুরুষের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকে। সবাই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। একজনও নিজেকে সামলানোর সুযোগ পেল না। সাহার এক এক করে প্রত্যেকের গায়ে আঘাত করতে থাকে, যেন মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। মেয়েটা প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।

এই মেয়েগুলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেইসব মেয়ে, যারা সুলতান আইউবীর নিকট নিবেদন পেশ করেছিল যে, আমাদেরকে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দিন। তারাই সাহারকে একটি জীর্ণ গৃহ থেকে উদ্ধার করে এনেছিল। সাহার যখন মেয়েগুলোকে সমর বিষয়ক কাজ করতে দেখল, তখন তার সরাইখানার মালিকের কথা মনে পড়ে যায়। তাদেরকে অবহিত করে যে,

সরাইখানার পাতাল কক্ষটি খৃস্টান গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের আখড়া; তোমরা সহযোগিতা করলে আমি তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি। এই পরিকল্পনা দিয়ে সে ওখানে গেল। কিন্তু সরাইখানার মালিক তাকে আটকে ফেলল। এক পর্যায়ে গোয়েন্দারা ফরমায়েশ করল নতুন মেয়ে নিয়ে আস। সাহার সুযোগ পেয়ে যায়। সে নতুন মেয়ে নিয়ে আসার জন্য বের হওয়ার অনুমতি লাভ করে।

বেরিয়ে এসে সে মেয়েদেরকে বিষয়টা অবহিত করে এবং বলে, তোমরা নর্তকী সেজে চল এবং লোকগুলোকে হত্যা কর। মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিকল্পনা ঠিক করে সাহারের সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু তারা এই চিন্তা করল না যে, লোকগুলোকে ফাঁদে ফেলে গ্রেফতার করাতে পারলে অনেক লাভ হবে– তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা যাবে। মেয়েরা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। তারা এতটুকুই জানত যে, দুশমনকে খুন করাই বড় কাজ। তারা তাদের জিহাদী চেতনাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিল। সাহারের বক্ষও প্রতিশোধ– স্পৃহায় ফেটে যাচ্ছিল। ওদেরকে সে নিজ হাতে হত্যা করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

সাহার পুরাতন নর্তকীকে এ জন্য খুন করে ফেলে, তার দ্বারা মেয়েদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। বস্তুত তাদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। এ জাতীয় নোংরামীপূর্ণ আসরের রীতি-নীতি ও মদপান করানোর পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল না। ভাগ্য ভাল যে, তারা যথাসময়ে খঞ্জর বের করে ফেলে এবং উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

কাজ সমাধা করে তারা সবাই চোরাপথে পাতাল কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুক্ষণ পর সৈন্যরা সরাইখানায় হামলা দেয় এবং পাতাল কক্ষে চলে যায়। ওখানে পড়ে আছে সাতটি লাশ। কক্ষে কক্ষে তল্লাশি চালানো হয়। একটি কক্ষে সাহার-এর সঙ্গী নর্তকীর লাশ পাওয়া যায়। সরাইখানার মালিকের কক্ষে এমন কিছু দলিল পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হল, এরা গুপ্তচর এবং দুর্বৃত্তই ছিল।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যত সুলতান আইউবী ও সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসছে। সুলতান আইউবী দিন-রাত যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সেনা প্রশিক্ষণে মহা-ব্যস্ত।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত
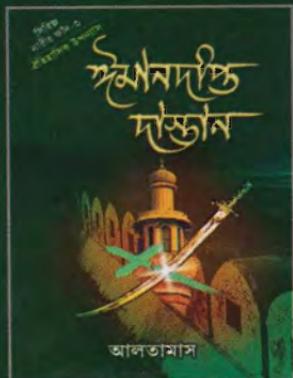
দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স